সৃজনশীল চিন্তা

ইসলামি পরিপ্রেক্ষিত

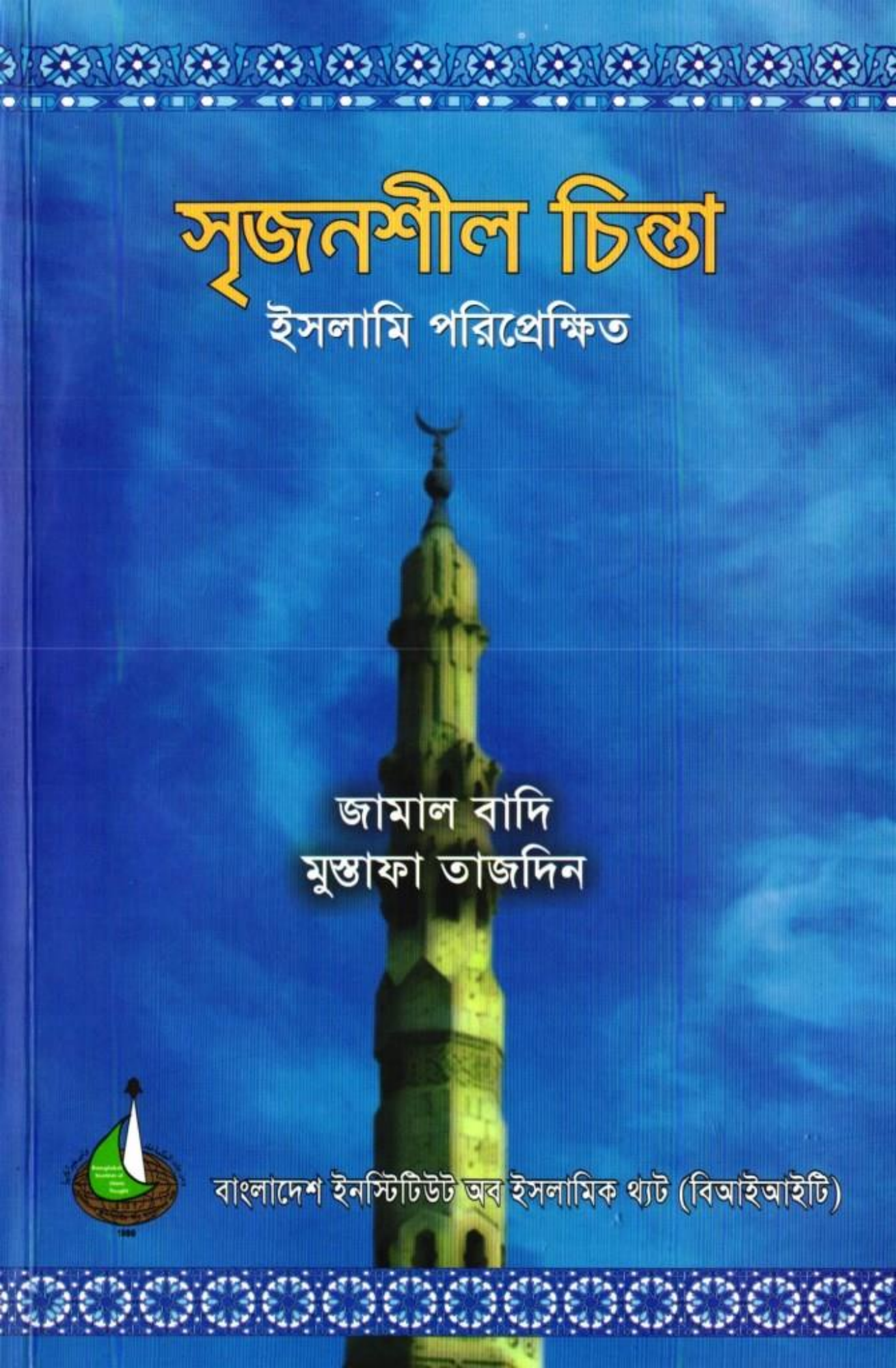

জামাল বাদি
মুস্তাফা তাজদিন

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

সৃজনশীল চিন্তা

ইসলামি পরিপ্রেক্ষিত

জামাল বাদি
মুস্তাফা তাজদিন

অনুবাদ

প্রফেসর মুহাম্মদ হাসানুজ্জামান

Since 1989

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

www.pathagar.com

সৃজনশীল চিন্তা : ইসলামি পরিপ্রেক্ষিত

লেখক : জামাল বাদি
মুস্তাফা তাজদিন

অনুবাদ : প্রফেসর মুহাম্মদ হাসানুজ্জামান

ISBN : 978-984-8471-32-6

প্রকাশক

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)
বাড়ি # ০৪, রোড # ০২, সেক্টর # ০৯, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা - ১২৩০
ফোন : ০২-৮৯১৭৫০, ০২-৮৯২৪২৫৬
E-mail : biit_org@yahoo.com, publicationbiit@gmail.com
Website : www.iiitbd.org

© বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

প্রথম প্রকাশ

সেপ্টেম্বর : ২০১৪
ভাদ্র : ১৪২১
জিলকদ : ১৪৩৫

মূল্য : ২৩০.০০ টাকা মাত্র US $ 10

Srijansil Chinta : Islami Poriprekkhith (Creative Thinking : An Islamic Perspective) originally written by Jamal Ahmed Badi & Mustapha Tajdin. Translated by Prof. Muhammad Hasanuzzaman. Published by Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT), House # 04, Road # 02, Sector # 09, Uttara Model Town, Dhaka - 1230. Phone : 02-8917509, 02-8924256. E-mail: *biit_org@yahoo.com, publicationbiit@gmail.com*, Website : *www.iiitbd.org*. Price : BDT 230.00. US $ 10.

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

Creative Thinking : An Islamic Perspective শীর্ষক ইংরেজি গ্রন্থটির বাংলা ভাষান্তর করা হয়েছে 'সৃজনশীল চিন্তা : ইসলামি পরিপ্রেক্ষিত' নামে। ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া (IIUM)'র অধ্যাপক জামাল বাদি ও মুস্তাফা তাজদিন লিখিত এটি একটি অনন্য সাধারণ গ্রন্থ।

ইসলাম কেবল একটি ধর্ম বিশ্বাসই নয়। বরং এর পরিধি মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে, যুগ ও কালের গন্ডি পেরিয়ে অসীমতায় সমৃদ্ধ। কিন্তু বিশ্ব ব্যবস্থার সতত পরিবর্তনশীলতার সাথে ইসলামকে নতুন করে খাপ খাইয়ে নিতে হবে, নাকি ইসলাম এর সূচনালগ্ন হতেই সকল পরিবর্তন ও বিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যশীলতা ধারণ করেই যাত্রা শুরু করেছে - তা জানতে, বুঝতে ও বাস্তবায়ন করতে চিন্তার ক্ষেত্রে সৃজনশীলতার কোনো বিকল্প নেই। যে বিশ্ব ব্যবস্থায় নেতৃত্বের ও পরিচালকের আসনে মুসলিম উম্মাহ নিজ যোগ্যতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল, অর্জিত অযোগ্যতায় তাদেরকে সেখান থেকে বহিস্কৃত হতে হয়েছে।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে যে পরিবর্তনের দামামা বেজে উঠেছে তাতে চালকের আসনে বসতে হলে সৃজনশীলতাকে স্বযত্নে লালন করা এবং আগামী মুসলিম প্রজন্মের মন মগজে তা প্রোথিত করার কোনো বিকল্প নেই। এ বাস্তব পটভূমিতে 'সৃজনশীল চিন্তা : ইসলামি পরিপ্রেক্ষিত' গ্রন্থটি মুসলিম মানসে এক নবজাগৃতির সূচনা করতে পারবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

সমগ্র মুসলিম বিশ্বে IIUM সৃজনশীল চিন্তাধারার পথিকৃৎ হিসেবে কাজ করে চলেছে একান্ত সযত্ন প্রয়াসে। তাদের অনেকগুলি মহৎ কর্মের মধ্যে এ গ্রন্থটি অন্যতম। গ্রন্থটিকে বাংলাভাষী পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরার মহৎ উদ্দেশ্যে আমরা এর ভাষান্তরের দায়িত্ব বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহাম্মদ হাসানুজ্জামান-এর উপর অর্পণ করি। তিনি তার দাপ্তরিক কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও অনুবাদের পাশাপাশি বইটির সম্পাদনার ক্ষেত্রেও আমাদের সহায়তা করেছেন। বিআইআইটি এ প্রয়াসের জন্য তার কাছে ঋণী।

পুস্তকটি পাঠকমহলে গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত হলেই কেবল আমাদের প্রচেষ্টা সাফল্যমন্ডিত হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলের প্রয়াস কবুল করুন। আমিন॥

প্রফেসর ড. আবু খলদুন আল-মাহমুদ
ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রকাশনা
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)

www.pathagar.com

সূচি

ভূমিকা	xi
প্রথম অধ্যায়	০১-৩৬
ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে তাফাককুর (চিন্তা)	০১
তাফাক্কুরের সংজ্ঞা	০১
কুরআনে 'তাফাক্কুর' ধারণার ব্যবহার	০৩
সমার্থবোধক কুরআনী শব্দাবলী	০৪
পুরাপুরি বুঝা, উপলব্ধি করা, আয়ত্ত করা, বোঝতে পারা (তাফাক্কুহ্)	০৫
মনে রাখা বা মুখস্থ করা (তাযাককুর)	০৫
শিক্ষা করা, আহরণ করা বা অন্যান্য জাতির ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা হতে শিক্ষা নেওয়া এবং তাদের ভুলভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি না করা (ই'তিবার)	০৫
ব্যক্তির মনকে সঠিক পথে ব্যবহার করা (তাওয়াক্কুল)	০৬
পর্যবেক্ষণমূলক বিবেচনা বা প্রতিফলন ঘটান (তাওয়াস্সুম)	০৭
ইসলামে *তাফাক্কুর* এর মর্যাদা (অবস্থান)	০৮
ইসলামে তাফাক্কুরের উদ্দেশ্য	১১
তাফাককুরের বিঘ্ন সৃষ্টিকারী অন্তরায়সমূহ	১৩
ইসলামে চিন্তাকে উৎসাহিতকরণ	২০
তাফাক্কুর : ইজতিহাদের প্রধান উপাদান	৩৩
উপসংহার	৩৬
দ্বিতীয় অধ্যায়	৩৭-৮০
আল-কুরআনে চিন্তার স্টাইল	৩৭
কৌতূহলী চিন্তাশৈলী (Inquisitive Thinking Style)	৩৮
উদ্দেশ্যমূলক চিন্তাশৈলী (Objective Thinking Style)	৪২
ইতিবাচক চিন্তাশৈলী (Positive Thinking Style)	৪৭
প্রকল্পিত চিন্তা (Hypothetical Thinking)	৫০

www.pathagar.com

যৌক্তিক চিন্তা (Rational Thinking) ৫২
প্রতিক্ষেপনকারী/ধ্যানাভিমুখী চিন্তা (Reflective/ Contemplative Thinking) ৫৫
মানসগোচর চিন্তা (Visual Thinking) ৫৮
রূপকাশ্রিত চিন্তা (Metaphorical Thinking) ৫৯
সাদৃশ্যমূলক চিন্তা (Analogical Thinking) ৬৩
আবেগপূর্ণ চিন্তা (Emotional Thinking) ৬৫
প্রত্যক্ষ চিন্তা (Perceptual Thinking) ৬৭
ধারণাগত চিন্তা (Conceptual Thinking) ৭১
ইন্দ্রিয় চিন্তা (Intuitive Thinking) ৭৩
বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা (Scientific Thinking) ৭৪
লিঙ্গ সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য কী? ৭৭
আকাঙ্ক্ষা/অভিলাষপূর্ণ চিন্তা (Wishful Thinking) ৭৮
উপসংহার ৮০

তৃতীয় অধ্যায় ৮১-১২৮
আল-ইজতিহাদ এবং সৃজনশীলতার উদ্যোগ গ্রহণে এর ভূমিকা ৮১
সূচনা ৮১
আল-ইজতিহাদ এর আক্ষরিক অর্থ ৮২
আল-ইজতিহাদের প্রায়োগিক অর্থ ৮৪
আল-কাযী আবদ আল-জাব্বার (মৃত্যু-৪১৫ হিজরি) এবং আবু আল-হুসাইন আল-বাসরী (মৃত্যু : ৪৩৬ হিজরি) ৮৫
আবু ইয়া'লা-আল-'উকবুরী আল-হাম্বলী (মৃত্যু : ৪২৮ হিজরি) ৮৬
আল-মাওয়ার্দী (মৃত্যু : ৪৫০ হিজরি) ৮৬
ইব্ন হাযম আল-যাহিরী (মৃত্যু : ৪৫৬ হিজরি) ৮৭
আল-গাজ্জালী (মৃত্যু : ৫০৫ হিজরি) ৮৮
ফখরুদ্দিন আল-রাযী (মৃত্যু ৬০৬ হিজরি) ৯১
আবু ইসহাক আল-শা'তিবী (মৃত্যু ৭৯০ হিজরি) ৯১
ইজতিহাদ সম্পর্কিত ইবাদতের মাত্রা ৯২

www.pathagar.com

আল-ইজতিহাদ ও মতামত (আল-রা'ঈ)-এর মধ্যে পার্থক্য ৯৪
নবি সা. এবং তাঁর পূর্ববর্তী নবি ও রসুল আ. গণের ইজতিহাদসমূহ ৯৫
প্রথমত সুরা আম্বিয়ায় আল্লাহ তায়ালা যখন বলেন ৯৬
দ্বিতীয়ত মুসা ও হারুনের কাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াত ৯৯
ইসরাঈলদের সম্পর্কে আয়াত যারা হালালকে হারাম করেছিল ১০৫
সাধারণ পর্যবেক্ষণ ১০৬
নবি মুহাম্মাদ সা.-এর ইজতিহাদ ১০৮
মন্তব্য ১১০
সাহাবা আজমাঈন-এর যুগে ইজতিহাদ ১১১
মুজতাহিদ এবং সৃজনশীলতায় তার ভূমিকা ১১৮
ইসলামে সৃজনশীল ইজতিহাদের সাধারণ বিধিমালা ১১৮
ইজতিহাদ পুনর্জীবিতকরণ ১২০
এক মুজতাহিদ অন্য মুজতাহিদকে অনুকরণ ১২৩
আল-ইজতিহাদ এবং মানবিয় কাজের ফলাফল ১২৪

চতুর্থ অধ্যায় ১২৯-১৭৪
মানবিয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলিম অবদান ১২৯
মানবচিন্তায় মুসলিম চিন্তাবিদগণের অবদান ১৩০
ইসলামে বৈজ্ঞানিক প্রয়াসের স্থান ১৩৫
যুক্তিবিদ্যায় মুসলিম অবদান ১৩৬
গ্রিক অবরোহ এবং ইসলামি আরোহ ১৩৮
যুক্তিবিদ্যায় ইবনে তাইমিইয়ার অবদান ১৪১
সর্বজনীন বিষয়ে ইবনে তাইমিয়াহ ১৪২
ইসলামি আরোহ (Islamic Induction) ১৪৬
গণিত ১৪৮
গণিতের ইসলামিকরণ : বিশুদ্ধতাপন্থীদের সংখ্যাতত্ত্ব ১৪৯
আল-খাওয়ারিযমী (মৃত্যু ৮৫০ হিজরি) ১৫১
আবু বকর আল-কারখী বা আল-কারাজী (৪২০ হিজরি/ ১০২৯ খ্রি.) ১৫২

www.pathagar.com

আল-বিরূনী (৯৭৩-১০৫০ খ্রি.) ১৫৩
জ্যোতির্বিদ্যা ১৫৫
পদার্থবিদ্যা ১৫৬
মাধ্যাকর্ষণজনিত প্রপঞ্চসমূহ ১৫৬
আলোকবিদ্যা (ইলম আল-মানাযির) ১৫৭
ইবনে আল-হাইসামের পদ্ধতি ১৫৯
চিকিৎসাবিদ্যা ১৬১
আবু বকর মুহাম্মদ ইব্ন যাকারিয়্যা আল-রাযী (ল্যাটিন ভাষায় রাযেস) ১৬৪
রসায়ন ১৬৪
সমাজবিদ্যা এবং ইতিহাসের দর্শন বিষয়ে ইসলামি অবদান ১৬৬
ভাষাবিদ্যা ১৬৮
আবু আল-আসওয়াদ আল-দুওয়ালী ১৭০
আল-খলীল ইবনে আহমাদ আল-ফারাহীদী ১৭২

পঞ্চম অধ্যায় ১৭৫-২০৮
পাশ্চাত্য পরিপ্রেক্ষিতে সৃজনশীলতা ১৭৫
ঐতিহাসিক পরিক্রমা ১৭৫
সৃজনশীলতার সংজ্ঞা ১৭৯
সৃজনশীলতার উপাদান ১৮১
সৃজনশীলতা অধ্যয়নে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি ১৮৫
সৃজনশীলতার ওপর গবেষণা কর্মের মূল্যায়ন ১৮৮
পার্শ্বগত চিন্তনের উদ্ভব ১৯৫
সাধারণ পর্যবেক্ষণাদি ২০৪

ষষ্ঠ অধ্যায় ২০৯-২৩০
ভাষা, উপলব্ধি ও চিন্তন ২০৯
ভাষা কী? ২১০
ভাষা ও চিন্তা : একটি ইসলামি পরিপ্রেক্ষিত ২১৩
ফরাসি ভাষা ২১৪

www.pathagar.com

আমি কথা বলি, অতএব, আমি চিন্তা করি ২১৭
ভাষা ও বাস্তবতা ২২০
স্বাভাবিক ভাষা ও কৃত্রিম ভাষা ২২২
ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষণ (Perception) ২২২
দর্শনগত প্রত্যক্ষণ সূত্রাদি ২২৮

সপ্তম অধ্যায় ২৩১-২৫১
যুক্তিপ্রদর্শন (Argumentation) ২৩১
বক্তব্যের প্রকার ২৩১
যৌক্তিক বিবেচনা কী (What is Reasoning) ২৩১
যুক্তিসমূহ (Arguments) ২৩২
যৌক্তিকতা (Reason) ২৩৩
উপসংহার ২৩৪
যুক্তির কাঠামো (Structure of an Argument) ২৩৫
যুক্তির পূর্ণতা ও বৈধতা (Soundness and Validity of Arguments) ২৩৭
শর্তযুক্ত যুক্তিবিচার (Conditional Reasoning) ২৩৮
অবরোহমূলক যুক্তি (Deductive Argument) ২৪০
গণিতে অবরোহ পদ্ধতির দৃষ্টান্ত ২৪২
অবরোহমূলক যুক্তির সীমাবদ্ধতা ২৪২
আরোহমূলক যুক্তি (Inductive Argument) ২৪৩
আরোহের পদ্ধতিসমূহ ২৪৬
সাদৃশ্য হতে যুক্তি (Argument from Analogy) ২৪৮
ইসলামি ব্যবহারশাস্ত্রে সাদৃশ্যতা ২৫০
উদাহরণ ২৫১

অষ্টম অধ্যায় ২৫৩-২৭১
বিভ্রান্তি সমূহ (Fallacies) ২৫৩
বিভ্রান্তির সংজ্ঞা ২৫৩
অ্যাড হোমিনেম এর বর্ণনা (Description of Ad Hominem) ২৫৪
অ্যাড হোমিনেম-এর উদাহরণ ২৫৫

www.pathagar.com

অ্যাড হোমিনেম টিউ কোক (Ad Hominemtu Quoque)	২৫৫
অ্যাড হোমিনেম টিউ কোক-এর উদাহরণ	২৫৬
বিশারদ ব্যক্তির কাছে আবেদন	২৫৭
জনগণের নিকট আবেদন	২৫৮
শক্তির প্রতি আবেদন	২৫৯
দয়ার প্রতি আবেদন	২৬০
অজ্ঞতার নিকট আবেদন	২৬০
মিথ্যা কারণ	২৬২
পিচ্ছিল ঢালু স্থান	২৬২
দ্ব্যর্থপূর্ণকরণ (Equivocation)	২৬৩
তড়িঘড়ি বিবৃতি বা সাধারণীকরণ	২৬৫
উপসংহার	২৬৮
সহায়ক গ্রন্থাবলী	২৭২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

গত দু'দশক ধরে শিক্ষা ও ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সৃজনশীল চিন্তা ক্রমবর্ধমান আগ্রহ অর্জনের সুযোগ পেয়ে আসছে। নতুন প্রযুক্তির আশির্বাদে আমাদের জীবনে অনুকূল পরিবর্তনের ফলে মানবসম্পদে বিনিয়োগ একটা নির্ভরযোগ্য উদ্যোগে পরিণত হয়েছে।

নতুন ধ্যানধারণা ও দক্ষতা অর্জনে তথ্য প্রযুক্তির যুগ আমাদের প্রচেষ্টায় নবতর অধ্যায়ের সূচনা করেছে যা ছাড়া কোনো উন্নয়ন সম্ভব বলে ভাবা যায় না। তাই, অগ্রগতি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে মানুষ হয়ে উঠেছে যে কোনো আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দু। এভাবে সৃষ্টিশীলতা অর্জনের প্রশ্নটি অধিক হতে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাধারণত মনে করা হয় যে, সৃজনশীল হতে হলে ব্যক্তিকে বুদ্ধিমান হতে হবে। আমাদের বিশ্বাস এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুৎপাদনশীল বলে প্রমাণিত হয়েছে, কারণ বুদ্ধিমত্তার ধারণাটি বিমূর্ত, অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক। এটি ফলপ্রসূ জবাব দানের পরিবর্তে বিষয়কেই দুর্বোধ্য করে ফেলে। এ অবস্থায়, আমাদের জন্য সৃজনশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার সম্পর্কের ব্যাপারটি মনোবিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের বিবেচনার্থে ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয়।

আমাদের প্রেক্ষিত বরঞ্চ একটা বাস্তব পটভূমিতে দাঁড়িয়ে। অর্থাৎ, আমরা বিশ্বাস করি যে, সৃজনশীলতা অভ্যন্তরীণ গুণাবলী নয় বরং দক্ষতা সংশ্লিষ্ট। এই অভিজ্ঞতা এ বাস্তবতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে যে, অন্য যেকোনো দক্ষতার মতোই সৃজনশীলতাও শিক্ষা দেওয়া যায়, শিক্ষা করা যায় এবং তা শিক্ষণ ও শিখনের মধ্য দিয়ে মানুষকে অভ্যস্ত করে তোলে।

এই ধারণার প্রেক্ষাপটে সৃজনশীল হতে হলে কারো বুদ্ধিমান হওয়ার প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে, নিজের বুদ্ধিকে উন্নত করতে চাই সৃজনধর্মী চিন্তা কিভাবে করতে হয় তা শিক্ষা করা।

কথা হচ্ছে আমরা যা দেখতে পাই তা হচ্ছে, একটি শিখন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সর্বপ্রকার দক্ষতা অর্জন ও উন্নতি করা। এটা যদি ভাষা, সঙ্গীত, খেলাধুলা, গণিত

www.pathagar.com

ও অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োগযোগ্য হয় তাহলে সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে কেন প্রয়োগ করা যাবে না?

এই পরিচিতিমূলক গ্রন্থটির লক্ষ্য হলো ইসলামি পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে সৃজনশীলতার ইস্যুকে প্রাসঙ্গিক করে তোলা। আমরা বিশ্বাস করি যে, মুসলিম বিশ্বে সৃজনশীলতার দুর্ভাগ্যজনক অধোগতি সম্বন্ধে অনেক লেখাতেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তবে, এদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই এই শোচনীয় অবস্থার বিকল্প উপস্থাপনের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। যেখানে সৃজনশীলতাকে গভীরভাবে উদ্দিষ্ট করা হয়েছে, সেখানেই আইনি ইস্যুগুলোকে একমাত্র বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। যা উপেক্ষা করা হয়েছে তা হলো সৃজনশীলতা হচ্ছে মনের একটি অবস্থা যা শৃঙ্খলার সীমানা অতিক্রম করেই থাকে। অন্য কথায়, সৃজনশীলতা হচ্ছে একটি অবিভাজ্য সত্তা যা মানুষের মনকে সুনির্দিষ্ট উদ্ভাবন ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু-বহির্ভূত উদ্ভাবনে সমর্থ করে থাকে। কোনো জিনিসকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষণের নতুন প্যাটার্ন অবলম্বনে প্রশিক্ষণ ও চিন্তন পদ্ধতির মধ্য দিয়েই আমরা কেবল ভিন্নভাবে সৃজনশীলতা বিকাশে সমর্থ হতে পারি।

এটা সত্য যে, মুসলিম মানস অ-সৃষ্টিশীল হয়ে পড়েছে এবং আমরা মুসলিম প্রযুক্তি ও জীবনরীতির ব্যাপারে মূলত অন্যদের ওপর নির্ভর করি। অন্যরা যা উৎপাদনে কঠোর পরিশ্রম করে আমরা এখন তারই ভোক্তা, আমরা আমাদের নিজস্ব নকশা, যন্ত্রপাতি ও প্রতিষ্ঠান সৃষ্টিতে সমর্থ নই, এর চেয়েও খারাপ অবস্থা হলো আমাদের ঔষধাদিও ধার করা।

যদিও মুসলিম দেশসমূহে অনেক সামগ্রীই উৎপাদিত হচ্ছে, এর ব্যবহারিক জ্ঞানের বিরাট অংশ এসেছে বাইরে থেকে। প্রশ্ন হলো, এই অবস্থার পরিবর্তন কিভাবে সম্ভব? উত্তরগুলোর একটি হচ্ছে : সৃষ্টিশীলতাকে লালন করা এবং অনাগত মুসলিম প্রজন্মের মনে তা জন্মিয়ে দেওয়া।

এই পুস্তকের প্রণেতাদ্বয়, ড. জামাল আহমেদ বাদি ও ড. মুস্তাফা তাজদিন ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়েশিয়ার সাধারণ শিক্ষা বিভাগে *সৃজনশীল চিন্তা ও সমস্যা* সমাধান বিষয়ে শিক্ষাদান করে আসছেন। ১৯৬৬ সালের ২ ডিসেম্বর এই বিভাগ চালু হওয়ার পর থেকে প্রত্যেক সেমিস্টারে *সৃজনশীল চিন্তা ও সমস্যা সমাধান* পড়ানো হতো। প্রাথমিকভাবে ইসলামের ওহিলব্ধ জ্ঞান ও মানবিক বিজ্ঞান শ্রেণিতে এবং স্থাপত্য ও পরিবেশগত নকশা শ্রেণির ছাত্রদের জন্য এটিকে নৈর্বাচনিক বিষয়

www.pathagar.com

হিসেবে রাখা হয়। ২০০১ সালে প্রথম প্রারম্ভিক সেমিস্টারে সিনেট সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক এই কোর্সের অবস্থান পরিবর্তনের প্রস্তাব অনুমোদন করে ইসলামি ওহিলব্ধ জ্ঞান (KIRK-Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge) এবং মানবিক বিজ্ঞান (HS)-এর শিক্ষার্থীদের জন্য বাধ্যতামূলক কোর্স হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ভবিষ্যত পরিকল্পনা হচ্ছে এটাকে আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়েশিয়ার (IIUM) জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্যপূরণীয় শর্ত হিসেবে গ্রহণ করা।

বছরের পর বছর ধরে এই কোর্সের পাঠক্রমে উন্নয়নের চলমান প্রক্রিয়া শিক্ষাদান এবং শিক্ষার্থীদের ফলাবর্তনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চালু রাখা হয়েছে।

এভাবেই এই বিষয়টির জন্য টেক্সট বইয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তবে, ইসলামি ও পাশ্চাত্য প্রেক্ষাপটকে সমন্বয়ের মাধ্যমে টেক্সট বইয়ের পাঠ্যক্রম নির্ধারণ পরিণত হয়েছে একটা বড় চ্যালেঞ্জে।

এই বিষয়ের শিক্ষাদানে প্রভূত উপকৃত হওয়ায় সৃজনশীলতার উপর পাশ্চাত্য অবদানের স্বীকৃতি ও প্রশংসা জ্ঞাপন করলেও আমরা এতে ইসলামি উপকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি, যা সৃজনশীলতা সম্পর্কে রচিত অসংখ্য পুস্তকেই অনুপস্থিত। এটাই এই টেক্সট বইয়ের অগ্রাধিকার প্রাপ্তির কারণ।

এই বইটি সৃজনশীল চিন্তা বিষয়ে ভূমিকাস্বরূপ হলেও এর বিষয়সূচির একটি বড় অংশ সমালোচনামূলক চিন্তার বিষয়াদি নিয়ে গড়ে উঠেছে। এটা এজন্যই যে, রচয়িতাগণ এমত পোষণ করেন যে, চিন্তার সৃষ্টিধর্মী ও সমালোচনাধর্মী প্রক্রিয়া অবিচ্ছিন্ন ধারণা এবং এর একটি অন্যটির পরিপূরক। এটা এজন্যই বলা যে, সমালোচনামূলক ও সৃজনী চিন্তা-উভয়েই একটি সংহত পদ্ধতিতে উপস্থাপিত হওয়া উচিত।

প্রথম অধ্যায়টি চিন্তা বিষয়ক ইসলামি প্রেক্ষিতের ভূমিকা হিসেবে রচিত। এটি একটি মতার্দশগত কাঠামো যা আল-কুরআনের চিন্তা ও এর গুরুত্বকে উপস্থাপনের চেষ্টা করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে কুরআনে বর্ণিত চিন্তার বিভিন্ন ধারা নিয়ে আবর্তিত, এতে চিন্তার পদ্ধতি সংক্রান্ত সমকালীন পনেরটি চিন্তাশৈলী আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আগত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ইজতিহাদকে চিন্তার একটি সৃজনশীল হাতিয়ার হিসেবে আলোচনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায় মানবিয় জ্ঞানের বিষয়ে কয়েকজন মুসলিমের অবদান সম্বন্ধে প্রণীত। এই অধ্যায়ের লক্ষ্য হচ্ছে পাঠকের মনে এ উপলব্ধি সঞ্চারিত করা যে, সৃজনশীলতা অর্জন করা কোনো বিশেষ সংস্কৃতি বা সংস্কৃতিগোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকার নয়।

পঞ্চম অধ্যায় একজন মুসলিম পাঠকের নিকট পাশ্চাত্য প্রেক্ষাপট তুলে ধরবে। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পশ্চিমা জগতে সৃষ্টিশীলতা সংক্রান্ত প্রধান বক্তব্যসমূহকে উপস্থাপন করা।

ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে সমালোচনাধর্মী চিন্তাধারার অন্তবর্তী ইস্যু গুলোকে বিস্তৃত করা হয়েছে। ভাষা ও উপলব্ধিকে চিন্তার শৈল্পিকতার মধ্য দিয়ে এবং বিভিন্ন যুক্তিতর্ক কিভাবে পরিমাপ করতে হয় সে পদ্ধতির সাথে পাঠককে পরিচিত করার উদ্যোগ রয়েছে।

আমরা এই সুযোগে আমাদের বিশেষ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই প্রফেসর ড. মোহাম্মদ কামাল হাসান, রেক্টর, আর্ন্তজাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, মালয়েশিয়া-কে তাঁর অশেষ সমর্থন ও উৎসাহ প্রদানের জন্য।

এই টেক্সট বইয়ের প্রকল্প অনুমোদন ও সমর্থনের জন্য আমরা IIUM'এর গবেষণা কেন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞ।

আমরা আরো ধন্যবাদ জানাতে চাই সহযোগী অধ্যাপক ড. শুকরি আহমদকে, প্রধান, সাধারণ শিক্ষা বিভাগ (IIUM), তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও নির্দেশনার জন্য।

এই স্বপ্ন বাস্তবায়নে যারা বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ। আল্লাহ তায়ালা আপনাদের মহান প্রচেষ্টার বিনিময়ে পুরস্কার প্রদান করুন।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে তাফাককুর (চিন্তা)*

ভূমিকা

মানুষের কুরআনি দৃষ্টিভঙ্গির অবিচ্ছেদ্য অংশ *তাফাক্কুর* (চিন্তা) সংক্রান্ত ধারণা বিষয়ে ব্যাপক কুরআনী বক্তব্য উপস্থাপন করাই এই অধ্যায়ের লক্ষ্য। অবশ্য, প্রতিনিধি হিসেবে এই পৃথিবীতে মানুষের একটা মহান কর্তব্য ও বিশাল উদ্দেশ্য রয়েছে। কুরআনের কিছু আয়াতে যেমন- স্পষ্ট বলা হয়েছে, মানুষের সাধনার মূল হচ্ছে সেসব বিভাগে কর্ম সম্পাদন করা যা তার সর্বশক্তিমান স্রষ্টা তার অধীনে ন্যস্ত করেছেন। এই প্রেক্ষাপটে তাফাক্কুর হচ্ছে অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহের অন্যতম যা মানুষকে কেবল অন্যান্য প্রাণি হতে পৃথকই করে না, বরং তার যোগ্যতার স্বীকৃতি দেয় সভ্যতার নির্মাতা ও বাণীবাহক হিসেবে তার অপরিহার্য ভূমিকা বাস্তবায়নে। বর্তমান নিবন্ধে তাফাক্কুরের ধারণাকে সামাজিক-ভাষাগত দৃষ্টিকোণ হতে উপস্থাপন করা হয়েছে। তা হচ্ছে তাফাক্কুরের কুরআন প্রদত্ত অর্থের পাশাপাশি এসব ব্যঞ্জনার সামাজিক সংশ্লিষ্টতা বিশ্লেষণ।

অন্যদিকে বর্তমান নিবন্ধে তাফাক্কুরের কুরআন প্রদত্ত দৃষ্টিভঙ্গির গভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজনে এর অস্তিত্বের কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে, কেবল মনুষ্য প্রবণতার জন্যই নয়, অধিকন্তু মানবিয় সৃজনশীল চিন্তা এবং মানবিয় গতিশীল উন্নয়নের জন্যও। এই অধ্যায়ে তাফাক্কুরের ধারণার কিছু দিক বর্ণনার প্রয়াস রয়েছে।

১. তাফাক্কুরের সংজ্ঞা

চিন্তার আরবি পরিভাষা হচ্ছে তাফাক্কুর। প্রাথমিক যুগের মুসলিম ভাষাবিদদের অন্যতম আল-ফাইরূযাবাদীর মতে, *আল ফিক্‌র* (চিন্তা) হচ্ছে কোনো কিছুর ওপর প্রতিফলন এবং *আফকার* হচ্ছে এর বহুবচন। তার মতে, *ফিক্‌র* ও *তাফাক্কুর* হচ্ছে সমার্থক এবং এরা অভিন্ন অর্থ বহন করে[১]।

---

* এই অধ্যায়টি তাফাক্কুর জার্নাল, সুদানে প্রকাশিত নিবন্ধের সংশোধিত ভাষ্য; ২০০১, খণ্ড ৩, ইস্যু ১

১ আল-ফাইরুযাবাদী, আল-কামূস আল-মুহীত (বৈরুত, মুয়াস্‌সাসাত আল-রিসালা, ১৯৯৬) (মূল শব্দ ফাকারা)

www.pathagar.com

আরেকজন বিখ্যাত ভাষাবিদ ইবনে মানযুর একই সংজ্ঞা ব্যবহার করে বলেন যে, *তাফাক্কুর* হচ্ছে *তাফকির* এর বিশেষ্য। এবং তিনি আল যুহরীকে উদ্ধৃত করেছেন, যিনি তাফাক্কুরের সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে ভেবে দেখা ও বিশিষ্টভাবে অবলোকন করা বুঝিয়েছেন[২]। তাফকির চিন্তাধারা হচ্ছে একটি বিমূর্ত ভাবধারা, যেখানে *তাফকির* বা *তাফাক্কুর* চিন্তা হচ্ছে প্রতিফলিত অভিব্যক্তির একটি পরিকল্পিত ব্যবস্থিত পদ্ধতি। এ কারণে আল-কুরআন এটিকে একক কোনো শব্দে প্রকাশ না করে বিভিন্ন শব্দে প্রকাশ করেছে। যা আমরা পরবর্তীতে দেখব।

সমকালীন মুসলিম মনোবিজ্ঞানী প্রফেসর মালিক বদরি *তাফকির* ও *তাফাক্কুর*-এর মধ্যে একটা স্পষ্ট পার্থক্য দেখিয়েছেন। *তাফাক্কুর তাফকির*-এর চেয়ে গভীরতর ও ব্যাপক। *তাফাক্কুর* ইহকালীন ও পরকালীন জীবন এবং সৃষ্টি হতে এর স্রষ্টা, সর্বশক্তিমানের মধ্যকার উপলব্ধি ও ধারণার মধ্যে সংযোগ সাধন করে। এই সংযোগ সাধন *ই'তিবার* নামে পরিচিত। এভাবে, *তাফকির* আমাদের বর্তমান জীবনের সমস্যা সমাধানের সাথে সীমাবদ্ধ হতে পারে। যেখানে ভাবাবেগের কোনো সংশ্লিষ্টতা নেই। তবে, তাফাক্কুর এই জীবনের বাইরে একটা ব্যাপকতর এলাকা আখিরাতে, এবং বস্তুবাদের উর্দ্ধসীমার বাইরে আত্মার গভীরতর দিগন্তে প্রবেশ করে, এবং এর দ্বারা *তাফাক্কুর* মুমিনের অর্থাৎ বিশ্বাসীর সকল বাহ্যিক ও অন্তঃস্থ কাজে প্রেষণা দান করে[৩]।

প্রফেসর বদরি এই মত পোষণ করেন যে, তাফাক্কুর তিনটি পরপর সংযুক্ত স্তরের মধ্য দিয়ে চলে। সেগুলো নিম্নরূপ :

১. ইন্দ্রিয়, কল্পনা অথবা বিমূর্ত বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আগত ধারণাভিত্তিক তথ্য।

২. এসব তথ্য সম্বন্ধে নিকটতর ও অধিকতর আদ্যপান্ত মনোযোগ দিয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ও পরিপূর্ণ সৃষ্টিকে স্বীকৃতি প্রদান করে। এটাই পরিণামে বিস্ময় ও প্রশংসার দিকে চালিত করে।

৩. মহান স্রষ্টা সম্বন্ধে চিন্তা করার কাজে অগ্রসর হওয়া। এ অবস্থা সবলতর ইমান ও তাঁর (স্রষ্টার) গুণাবলী সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানের পথে চালিত করে[৪]।

---

২ ইবনে মানযূর, লিসান-আল-আরব (বৈরুত : দার আল-ফিক্‌র, ১৯৯০), (মূল ফাকারা)।

৩ আল-তাফাক্কুর মিন আল-মুশাহাদা ইলা আল-শুহুদ, IIIT পাবলিকেশন্স, হার্নডন, ভা. ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৪

৪ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪২-৪৩।

www.pathagar.com

মানুষের মধ্যে তাদের ইমানের অর্থাৎ বিশ্বাসের গভীরতার ভিত্তিতে তাফাক্কুর-এর স্তরে পার্থক্য দেখা যায়, এটা হচ্ছে দৃষ্টি দেওয়া ও কেন্দ্রীভূত করা, আবেগময় ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থা, পরিবেশগত উপাদান, জ্ঞানের পরিমাণ এবং তারা যে বিষয়ে ভাবে তার পরিচয় এবং এর মৌলিকত্ব[৫]।

২. কুরআনে 'তাফাক্কুর' ধারণার ব্যবহার

মূল শব্দ *তাফাককুর* (تفكر) এর ক্রিয়াপদ *তাফাক্কার* (تَفَكَّر) এর প্রত্যয়সমূহকে আল-কুরআনে আঠারো বার ব্যবহৃত হতে দেখা যায় : (সুরা বাকারা ২ : ২১৯, ২৬৬, সুরা আলে ইমরান ৩ : ১৯১, সুরা আন'আম ৬ : ৫০, সুরা আ'রাফ ৭ : ১৭৬ ও ১৮৪, সুরা ইউনুস ১০ : ২৪, সুরা আর রা'দ ১৩ : ৩, সুরা নাহল ১৬ : ১১, ৪৪ ও ৬৯, সুরা রূম ৩০ : ৮ ও ২১, সুরা সাবা ৩৪ : ৪৬, সুরা যুমার ৩৯ : ৪২ সুরা জাছিয়া ৪৫ : ১৩, সুরা হাশর ৫৯ : ২১ এবং সুরা মুদ্দাস্সির ৭৪ : ১৮)। এসব আয়াত পাঠ করলে নিম্নলিখিত দিকগুলো চোখে পড়ে :[৬]

১. এই শব্দটি ১৮ বার ব্যবহৃত যা উপরে বর্ণনা করা হয়েছে।

২. এই শব্দটি বিশেষ্য রূপে নয় ক্রিয়া রূপে সকল আয়াতেই ব্যবহৃত হয়েছে, তার মানে এটি একটি পদ্ধতি, কোনো বিমূর্ত ধারণা নয়।

৩. একটি আয়াতে ক্রিয়াপদটি অতীত কাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে : সুরা মুদ্দাস্সির ৭৪ : ১৮, অন্যদিকে অবশিষ্ট ১৭টি স্থানে এর বর্তমান কাল ব্যবহৃত হয়েছে যা এই পদ্ধতির চলমানতার ওপর জোর দেয়।

৪. ক্রিয়াপদটির ১৭টি বর্তমান রূপ বহুবচন হিসেবে ব্যবহৃত। যা ইসলামে যৌথ চিন্তার গুরুত্ব বহন করে কিংবা যাকে আমরা চিন্তার শূরাভিত্তিক প্রক্রিয়া বলে অভিহিত করতে পারি।

৫. মুফাস্সিরগণের অধিকাংশই তাফাক্কুরকে প্রতিফলন ও গভীর চিন্তা বা ধ্যান বলে ব্যাখ্যা করেছেন, যা একটি পদ্ধতি, ফলাফল নয়।

---

৫ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮৭-৯৮।

৬ খালিদ, মা'আদ আহমদ, আল-তাজদিদ জার্নাল, আই আই ইউ এম - সংখ্যা : ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ১৮১।

www.pathagar.com

৩. সমার্থবোধক কুরআনী শব্দাবলী

আল-কুরআন তাফাক্কুর-এর নিম্নবর্ণিত অন্যান্য সমার্থবোধক শব্দ ব্যবহার করেছে:

১. *লক্ষ্য করা (নজর)* : বলো, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার প্রতি লক্ষ্য করো (সুরা ইউনুস ১০ : ১০১)!

> তারা কি লক্ষ্য করে না আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌম কর্তৃত্ব সম্পর্কে এবং আল্লাহ তায়ালা যা কিছু সৃষ্টি করেছেন তা-সম্পর্কে এবং এ সম্পর্কেও যে সম্ভবত তাদের নির্ধারিত কাল নিকটবর্তী (সুরা আ'রাফ ৭ : ১৮৫)?

২. *নিশ্চিত জ্ঞান (তাবাস্‌সুর)* : যেমন- রয়েছে সুরা ইউসুফে :

> বলো, এটাই আমার পথ : আল্লাহ তায়ালার প্রতি মানুষকে আমি আহ্বান করি নিশ্চিত জ্ঞানে-আমি এবং আমার অনুসারীগণও ...[৭] (সুরা ইউসুফ ১২ : ১০৮)।

৩. *অনুধাবন করা (তাদাববুর)* : কুরআনের এই শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, যার অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তি যে শব্দ তিলাওয়াত করে তার পিছনের অর্থ তাকে গভীর এবং পুরাপুরিভাবে বোঝতে হবে। এবং বিশ্লেষণ ও প্রধান ভাব নির্ধারণ করে এর গূঢ় অর্থ উন্মোচন করতে হবে। এর পাশাপাশি এসব আয়াত উপস্থাপনে বিস্তারিত ও বিশদ বিবরণ খুঁজতে হবে;

> এক কল্যাণময় কিতাব, এটি আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ (সুরা সাদ ৩৮ : ২৯)।

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> তবে কি ওরা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করে না? নাকি ওদের অন্তর তালাবদ্ধ (সুরা মুহাম্মদ ৪৭ : ২৪)?

---

[৭] বাসীরা বিশেষ্য পদটি (ক্রিয়াও বটে)-এর বিমূর্ত ব্যঞ্জনা রয়েছে। তা হলো, মন ছাড়াই দেখা এবং এর তাৎপর্য হলো, উপলব্ধি করার সামর্থ্য যা সচেতন অন্তর্দৃষ্টিভিত্তিক যেমন বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রবেশযোগ্য সাক্ষ্য অথবা বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা যাচাইযোগ্য। মোহাম্মদ আসাদ : The Message of the Qur'an, নোট # ১০৪, পৃষ্ঠা-২৫৪।

www.pathagar.com

৪. পুরাপুরি বুঝা, উপলব্ধি করা, আয়ত্ত করা, বোঝতে পারা (তাফাক্কুহ্)

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

> দেখো, কিরূপ বিভিন্ন প্রকারে আয়াত বিবৃত করি যাতে তারা সত্য উপলব্ধি করে (সুরা আল্লাহ তায়ালা বলেন, আন'আম ৬ : ৩৫)।

একই সুরার অন্য আয়াতে :

> তিনিই তোমাদেরকে একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য দীর্ঘ ও স্বল্পকালীন অবস্থানস্থল রয়েছে; আয়ত্তকারী (জ্ঞানী) সম্প্রদায়ের জন্য আমি আয়াত বিশদভাবে বিবৃত করেছি (সুরা আন'আম ৬ : ৯৮)।

৫. মনে রাখা বা মুখস্থ করা (তাযাককুর)

এই শব্দটি কুরআনে বারংবার ব্যবহৃত হয়েছে। এটার অনুবাদ এভাবে করা হয়েছে: মনে রাখা, মুখস্থ করা, স্মরণ করা এবং উপদেশ গ্রহণ করা। এই শব্দটির অর্থ হচ্ছে, প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত পঠিত আয়াত সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং নিজেকে প্রশ্ন করা উচিত যে এর অর্থ তার জন্য কী। এগুলো তার কাছে কী দাবি করে? কিভাবে এগুলোকে তারা তাদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়োগ করতে পারে?

> তিনি মানুষের জন্য স্বীয় বিধান সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন যাতে তারা তা মনে রাখতে পারে (সুরা বাকারা ২ : ২২১)।
>
> যারা স্মরণে রাখে তাদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি (সুরা নিসা ৪ : ১২৬)।
>
> তোমার প্রতিপালক হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা যে ব্যক্তি সত্য বলে জানে, সে আর যে অন্ধ সে কি সমান? মনে রেখ, তারাই যারা বোধশক্তিসম্পন্ন (সুরা আর রা'দ ১৩ : ১৯)।

৬. শিক্ষা করা, আহরণ করা বা অন্যান্য জাতির ইতিহাস ও অভিজ্ঞতা হতে শিক্ষা নেওয়া এবং তাদের ভুলভ্রান্তির পুনরাবৃত্তি না করা (ই'তিবার)

> নিশ্চয়ই এতে শিক্ষণীয় রয়েছে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য (সুরা আলে ইমরান ৩ : ১৩)।
>
> আল্লাহ তায়ালা দিবস ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান, এতে শিক্ষা রয়েছে চক্ষুষ্মানদের জন্য (সুরা নূর ২৪ : ৪৪)।

www.pathagar.com

অতএব হে চক্ষুষ্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো (সুরা হাশর ৫৯ : ২)।

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে পূর্ববর্তী নবি-রসুলদের (আলাইহিমুস্ সালাম) কাহিনী বর্ণনা করেছেন, তাঁরা তাঁদের কওমের লোকদের সাথে কেমন ব্যবহার করতেন, কিভাবে তাঁদের প্রতি প্রেরিত বাণী তাঁরা প্রচার করতেন ও পৌছাতেন, কেমন সাড়া পেতেন এবং পরিশেষে এসবের কী ফলাফল হতো। উদ্দেশ্য, যার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হতো, তা হচ্ছে শ্রোতারা যেন এসব কাহিনী সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং তা হতে শিক্ষা গ্রহণ করে আল্লাহ তায়ালার দিকে প্রত্যাবর্তন করত : তাঁর সন্তুষ্টির জীবন-যাপন করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন : ওদের বৃত্তান্তে বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য রয়েছে শিক্ষা (সুরা ইউসুফ ১২ : ১১১)।

৭. ব্যক্তির মনকে সঠিক পথে ব্যবহার করা (তাওয়াক্কুল)[৮]

তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় এবং শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারত (সুরা হাজ্জ ২২ : ৪৬)।

আল-কুরআন আক্‌ল বা বোধশক্তিকে দু'শ্রেণিতে বিভক্ত করেছে[৮] :

১. আক্‌ল রুশ্‌দ বা নিয়ন্ত্রিত মন, এবং

২. আক্‌ল ইদ্‌রাক বা ধারণকারী মন, যেখানে মন ধারণ করে কিন্তু নৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে পরিচালিত হতে নির্দেশ করে না।

আমি তো নিশ্চয়ই বহু জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য; তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা সত্যকে উপলব্ধি করে না, তাদের চোখ আছে কিন্তু তা দিয়ে দেখে না এবং তাদের কান থাকলেও তা দিয়ে তারা শ্রবণ করে না। এরা পশুর ন্যায় বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত; তারাই গাফিল (সুরা আ'রাফ ৭ : ১৭৯)।

---

৮ আকল বা বুদ্ধিবৃত্তি'কে কুরআনে বিশেষ্যরূপে ব্যবহার করা হয়নি। কিন্তু বিভিন্ন কাল ও রূপে ক্রিয়াপদ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে ৪৯ বার। তাছাড়া বিভিন্ন সময় আক্‌ল-এর সমার্থক ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন : লুব্‌ব হাম হিজর নুহা ক্বালব এবং ফুয়াদ। বিস্তারিত চাইলে দেখুন : ইসমাঈল, ফাতিমা/আল-কুরআন ওয়া আল-নায়ার আল আকলি/ IIIT, হার্নডন, ভা. ১৯৯৩ পৃষ্ঠা-৬৩-৬৪।

www.pathagar.com

আল-কুরআন অনুযায়ী বিচারবোধ হচ্ছে যুক্তিবাদিতার প্রাথমিক কাজ, সুতরাং যখন যুক্তিবাদিতা এর কাজে ব্যর্থ হয় তখন এর কোনো মূল্যই থাকে না।

> নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার নিকট নিকৃষ্টতম জীব সেই বধির ও বোবা যারা কিছুই বোঝে না (সুরা আন'ফাল ৮ : ২২)।

আল-আক্কাদ এটাকে অন্যভাবে ব্যবহার করতে চান। এই যুক্তিতে যে আকল নামক বুদ্ধিবৃত্তি যা ওহিতে পাওয়া যায়, তা হচ্ছে তাই যা সত্যকে ধারণ করতে পারে, স্ববিরোধিতার পার্থক্য করতে পারে, অন্তর্দৃষ্টি অন্বেষণ করে, প্রতিফলন ঘটায় এবং চিন্তাভাবনা করে। আক্‌ল বা বুদ্ধিবৃত্তি হচ্ছে তাই যা রক্ষণশীলতা, ঔদ্ধত্য ও বিপথগামিতার বিপরীত।

এটা সেই জিনিস নয় যা যুনূন বা উন্মাদনার বিপরীত, কারণ উন্মাদনা (পাগলামি) তাকলিফকে বাতিল করে দেয় এবং উন্মাদ ব্যক্তি ক্ষমার যোগ্য। তিনি জোর দিয়ে বলেন, বুদ্ধিবৃত্তি আক্‌ল ইসলামি দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী তাই যা সত্যকে অনুসন্ধান করে এবং সর্বদা এর সন্ধানেই ব্যাপৃত থাকে[৯]।

৮. পর্যবেক্ষণমূলক বিবেচনা বা প্রতিফলন ঘটান (তাওয়াস্‌সুম)[১০]

> অবশ্যই এতে নিদর্শন রয়েছে পর্যবেক্ষণশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য (সুরা হিজর ১৫ : ৭৫)।

এভাবে দেখা যাবে যে, আল-কুরআন *তাফাক্‌কুর* শব্দের জন্য বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছে। বলা হয়ে থাকে যে, কোনো সংস্কৃতি সমার্থক হিসেবে যখন বহু শব্দ ব্যবহার করে, তখন ঐ শব্দটি যে ধারণা বা বস্তুর প্রতিনিধিত্ব করে তা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়।

আমরা স্পষ্টরূপে অবলোকন করতে পারি যে, কুরআনের এসকল শব্দ মানুষের বিবেকের কার্যাবলী বা আকল এর বর্ণনা করে[১১]। এটাও খুব সুস্পষ্ট যে, আল-

---

[৯] আল-আ'কাদ, আব্বাস : আল-তাফকির ফারিদা ইসলামিইয়াহ আল-মাকতাবাহ আল-আসিরিইয়্যাহ, বৈরুত, পৃষ্ঠা ১৭ ও ৩৬।

[১০] পুরা তাৎপর্য অনুযায়ী মুতাওয়াসসিম শব্দটি সেই ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি তার মনকে কোনোকিছুর বাহ্যিক রূপ দেখে এর বাস্তব প্রকৃতি ও অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে প্রয়োগ করেন, মুহাম্মদ আসাদ, নোট # ৫৪, পৃষ্ঠা ৩৯০।

[১১] ইসমা'ঈল ফাতিমাহ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৬।

www.pathagar.com

কুরআন চিন্তা ও এর প্রতিফলনকে উৎসাহিত করে কারণ তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা বিশ্বাসের পথে চালিত করে।

আল-রাযী (৬০৪ ঈসায়ী) একজন মুফাসসির হিসেবে চিন্তার সাথে সম্পৃক্ত শব্দসমূহকে আলোচনা ও বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। যখন তিনি জ্ঞান (ইলম) অর্জন করেছেন। তিনি এই শব্দটির ত্রিশটি সমার্থক শব্দের সন্ধান পেয়েছেন। এসব শব্দের মধ্যে রয়েছে : ধারণ, অনুধাবন, অনুভবকরণ, মুখস্থকরণ, স্মরণ, পুনরুদ্ধারকরণ, পরিচিতিকরণ, বোঝা, উপলব্ধিকরণ, যৌক্তিকীকরণ, আয়ত্তকরণ, জ্ঞানী হওয়া, নিশ্চিত হওয়া, বুদ্ধিবৃত্তিক হওয়া, চিন্তন, স্বত :লব্ধ জ্ঞান অর্জন, বুদ্ধিমান হওয়া, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া, বিভ্রান্তি, বিবেচনা, কল্পনাপ্রবণ হওয়া, সুচতুর, সুচিন্তন, মেধাবী হওয়া, অভিজ্ঞতা, ভাব, মতামত, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং সংকোচন[১২]।

ইসলামে *তাফাক্কুর* এর মর্যাদা (অবস্থান)

তাফাক্কুরকে ইবাদত গণ্য করা হয়। অথবা আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের এটি একটি পদ্ধতি, যার প্রতিদানে রয়েছে পুরস্কার, তবে তা আন্তরিকতা ইখলাস এবং ভালো নিয়তে ভালো উদ্দেশ্যে হতে হবে।

সমকালীন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ আব্বাস আল-আকাদ তাফকির বা চিন্তাকে একটি ইসলামি কর্তব্য বলে মনে করেন[১৩]।

ড. বাক্কার[১৪]-এর মতে, আল-কুরআনের যেসব আয়াত চিন্তাকে উৎসাহিত করেছে সেগুলোকে পাঁচটি গুচ্ছে ভাগ করা যায়, যেমন-

১. তাওহিদের ক্ষেত্রে এবং মানুষের মনোযোগকে মহাবিশ্বের স্রষ্টার প্রতি নিবদ্ধ করতে নির্দেশনার ক্ষেত্রে। উদাহরণস্বরূপ আল্লাহ তায়ালা বলেন :

> নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির আবর্তনে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শায়িত অবস্থায় আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে এবং গভীরভাবে চিন্তা করে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সর্ম্পকে; এবং (বলে) : হে আমাদের প্রতিপালক!

---

১২ আল-তাফসীর আল-কাবীর, বৈরুত, দার আল-ফিকর, ১৯৮৫, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ২২২-২২৬।

১৩ আল-তাফকির ফারিদা ইসলামিয়্যাহ।

১৪ বাক্কার, আবদ্ আল-করিম : আল-তাফকীর আল-মাতদূ'ই।

www.pathagar.com

তুমি এসব নিরর্থক সৃষ্টি করোনি, তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে রক্ষা করো আগুনের শাস্তি হতে (সুরা আলে ইমরান ৩ : ১৯০-১৯১)।

২. আল-কুরআনের আয়াতের ওপর চিন্তার জন্য।

এ এক কল্যাণময় কিতাব (আল-কুরআন)। যা আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে। এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ (সুরা সাদ ৩৮ : ২৯)।

৩. আল্লাহ তায়ালা কুরআনে অনেকগুলো কাহিনীর উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন যা বিভিন্ন সুরায় বর্ণিত হয়েছে শুধুই প্রেষণা দানের জন্য, যাতে মানুষ চিন্তা করে, কার্যে পরিণত করে। এবং শিক্ষা গ্রহণ করে ও অনুসন্ধান করে জ্ঞানের।

তুমি বৃত্তান্ত বিবৃত করো যাতে তারা চিন্তা করে (সুরা আ'রাফ ৭ : ১৭৬)।

৪. আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সবকিছুর শুরুতে প্রতিফলন ঘটাবার এবং এসবের অনুসন্ধানেরও আদেশ দিয়েছেন। যাতে কেউ সমালোচনাধর্মী অন্তর্দৃষ্টি ব্যতীত (প্রশ্নসাপেক্ষ) উপসংহারে লাফ দিতে না পারে। 'বলো (হে মুহাম্মদ)! জমীনে পরিভ্রমণ করো এবং দেখো কিভাবে তিনি (আল্লাহ তায়ালা) সৃষ্টির সূচনা করেছেন' (সুরা আনকাবূত ২৯ : ২০)।

৫. আল্লাহ তায়ালা মানবজাতিকে একথা বলে চিন্তার পদ্ধতিসমূহের একটিতে মনোযোগ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন :

তাদের বলো (হে মুহাম্মদ)! : আমি তোমাদেরকে একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি, তোমরা আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশে দুই দুইজন অথবা এক একজন করে দাঁড়াও, অতঃপর চিন্তা করে দেখো ... (সুরা সাবা ৩৪ : ৪৬)।

ড. বাক্কার চিন্তা করাকে কুরআনের আয়াতের ভিত্তিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা বলে মনে করেন :

যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন যাতে পরীক্ষা করতে পারেন তোমাদের মধ্যে কর্মে কে উত্তম (সুরা মুলক ৬৭ : ২)।

তার মতে, জীবন হচ্ছে প্রকৃত পরীক্ষা এবং জীবন ভরে রয়েছে চ্যালেঞ্জ ও সমস্যা সমাধানকারী সুযোগ। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে, সমস্যার সমাধান করতে

www.pathagar.com

এবং অতঃপর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চিন্তা করার বিরাট প্রয়োজন রয়েছে। কারণ এখানে রয়েছে সুন্নাত বা ওহিগত নীতিমালা। যা মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, যা কেবল চিন্তার মাধ্যমেই উদ্ভাবন ও আবিষ্কার করা যায়।

আল্লাহ তায়ালার নীতিমালা মহাবিশ্বকেও নিয়ন্ত্রণ করে। আল্লাহ তায়ালা মহাবিশ্বের মধ্যে তাঁর বহু নিয়ম-নীতি পরিব্যাপ্ত করে রেখেছেন যা ভারসাম্যপূর্ণ, সঙ্গতিপূর্ণ, সর্বব্যাপক এবং স্থির। এসব নিয়মনীতি সোফায় বসে আবিষ্কার করা যায় না, তবে অনুসন্ধান, অধ্যয়ন ও পরীক্ষার মাধ্যমে করা যায়। এবং এগুলোকে আবিষ্কার করার পরই আসে তাদের ব্যবহার এবং এসব হতে উপকারিতা লাভ করার প্রশ্ন।

বাক্কার বলেন, ইসলামি মূল্যবোধকে বাস্তবায়িত করতে হলে চিন্তার প্রয়োজন রয়েছে। আন্তরিকতা, আনুগত্য এবং আগ্রহ আমাদের সমস্যা সমাধান ও তা হতে মুক্তি পেতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তবে ত্যাগ ও উৎসর্গ দীর্ঘস্থায়ী হবে না। যতক্ষণ উম্মাহ তার মূল্যবোধকে প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপের অন্তর্ভুক্ত না করে। এসব সম্ভব হতে পারে ইজতিহাদের চলমান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে, যার লক্ষ্য হবে প্রত্যেক মূল্যবোধের জন্য বিশেষ ধরনের কাজ সৃষ্টি করা এবং এসব কাজকে স্থায়ী করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণ চালিয়ে যাওয়া।

তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে তিনটি উদাহরণ পেশ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে :

ক. শূ'রা বা পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা

জীবন যেহেতু অধিকতর জটিল ও খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছে, এখন তাই শূ'রার বাস্তবায়ন পদ্ধতিকে উন্নত ও উন্নীতকরণ এবং এই বিরাট মূল্যবোধকে সমকালীন বিষয়ে প্রাসঙ্গিক করে তোলার জন্য শূ'রাকে নতুনভাবে সংগঠিত রূপে সুসজ্জিতকরণের বিশাল প্রয়োজন দেখা দিয়েছে।

খ. মুসলিম উম্মাহর ঐক্য

এটি আরেকটি মহান ইসলামি মূল্যবোধ যা মুসলিমরা সব সময়ই বলে থাকে। অনেক বই লেখা হয়েছে এবং এর বিরাটত্ব বা গুরুত্ব মূল্যায়ন করতে অনেক সভা-সমিতি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতদ্সত্ত্বেও এটা যথেষ্ট নয়। আমরা যার প্রয়োজন মনে করি তা হচ্ছে বিরাজমান মুসলিম অনৈক্য এবং এটাকে দূর করার উদ্দেশে অবিরাম চিন্তা ও আলোচনা করা।

www.pathagar.com

এই সাথে ঐক্যের উপযোগী কাঠামো নিয়েও আমাদের চিন্তা করা উচিত। যা বর্তমানে আমাদের সামনে বিরাজমান জটিল অবস্থা নিরসনে সহায়ক হবে।

এছাড়াও স্বাধীনতা ও ঐক্যের মধ্যকার সম্পর্ক এবং এই দুটি মূল্যবোধ পরিপূর্ণ করার উপায়ের বিষয়টিও আমাদের পরীক্ষা করা উচিত।

গ. অভাবীকে সহায়তা করা

পুনরায় বললে এটা ইসলামের মহান মূল্যবোধসমূহের অন্যতম। আল-কুরআন ও সুন্নাহয় এটাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন দুনিয়ার সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল (সুরা মায়েদা ৫ : ৩২)।

এই পুরস্কার পাওয়ার আকাঙ্ক্ষার কারণে এই মূল্যবোধটি মুসলিম সমাজে অনুশীলন করা হয়ে আসছে। তা সত্ত্বেও সমকালীন চ্যালেঞ্জ যেমন- (যুদ্ধ, বন্যা, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, দারিদ্র ... ইত্যাদি) দাবি করে আরো কার্যকর ও সংগঠিত প্রচেষ্টা। যাতে এসব দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে আবারো চিন্তাই মূল শব্দ।

ইসলামে তাফাক্কুরের উদ্দেশ্য

চিন্তার দিকে নিবিষ্ট হওয়ার অসংখ্য উদ্দেশ্য রয়েছে, যেমন-

১. মহাবিশ্বের সৃষ্টির প্রতি এবং এই মহাবিশ্বে আল্লাহ তায়ালা যেসব নিদর্শন রেখেছেন তার প্রতি তাফাক্কুরকে পরিচালিত করা যায়। এই চিন্তন ইমান (বিশ্বাস) এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি ইমানের দিকে চালিত করবে। যারা ইতিমধ্যে ইমান আনতে সমর্থ হয়েছে তাদের ইমানকে চিন্তা (তাফাক্কুর) আরো মজবুত করবে। আল-কুরআন নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবী

> যিনি সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে সপ্ত আকাশ; দয়াময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোনো খুঁত দেখতে পাবে না (সুরা মুলক ৬৭ : ৩)।

তারকারাজি, সূর্য ও চন্দ্র

www.pathagar.com

কত মহান তিনি যিনি আকাশে স্থাপন করেছেন বিরাট তারকাসমূহ এবং তন্মধ্যে স্থাপন করেছেন বিশাল প্রদীপ (সূর্য) ও জ্যোতির্ময় চাঁদ (সুরা ফুরকান ২৫ : ৬১)!

সমুদ্র

তিনি প্রবাহিত করেন দুই দরিয়া (লোনা পানির ও মিষ্টি পানির) যারা পরস্পর মিলিত হয়। কিন্তু এদের মধ্যে রয়েছে এক অন্তরাল যা ওরা অতিক্রম করতে পারে না। সুতরাং তোমরা উভয়ে (জিন্ ও মানুষ) তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (সুরা আর রহমান ৫৫ : ১৯-২১)

বৃষ্টি, বিভিন্ন প্রকার পর্বতমালা, মানুষ এবং পশু

তুমি কি দেখ না আল্লাহ তায়ালা আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন এবং আমরা তা দিয়ে বিচিত্র বর্ণের ফলমূল উদ্গত করি? পাহাড়ের মধ্যে রয়েছে বিচিত্র বর্ণের আঁকাবাঁকা পথ–সাদা, লাল ও নিকষ কালো। এভাবে রং বেরং-এর মানুষ, জন্তু ও আন'আম রয়েছে। আল্লাহ তায়ালার বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে; আল্লাহ তায়ালা পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল? (সুরা ফাতির ৩৫ : ২৭-২৮)

মানব সৃষ্টি

নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে পৃথিবীতে। এবং তোমাদের মধ্যেও। তোমরা কি অনুধাবন করবে না? (সুরা যারিয়াত ৫১:২০-২১)

২. আরেকটি ক্ষেত্র যেখানে তাফাক্কুর-এর নির্দেশনা রয়েছে আর তা হলো ওহিলব্ধ-আইনকানুন। যা আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন এই পৃথিবী এবং জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। এই আইন দু'প্রকার। এক প্রকার হচ্ছে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত সেই আইন যা মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করে। মহাবিশ্বের প্রতিটি সৃষ্টিকে মানুষের অধীন করা হয়েছে। বস্তুনিচয়কে নির্দিষ্ট গুণাবলী দিয়ে এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে জীবনকে সুখময় করতে সেগুলো ব্যবহার করা যায়। এই সকল আইনকানুনের পরীক্ষা ও আবিষ্কার মানুষকে অগ্রগতি ও সভ্যতার দিকে চালিত করে। তবে, এসব আইন আবিষ্কার কর্ম প্রচেষ্টার অধীন এবং তা নির্দিষ্ট কোনো ধর্ম বা বিশ্বাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এসব আবিষ্কার

www.pathagar.com

ভালো বা খারাপ উদ্দেশ্যে হতে পারে। এগুলো অপব্যবহার হতে পারে। যেমন- বস্তুর বৈশিষ্ট্যকে ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করে ক্ষতি সাধন করা যায়। এসব ক্ষেত্রে ইসলামের অবস্থান স্পষ্ট ও উজ্জ্বল- ক্ষতি নয়, ক্ষতি সাধন নয়-যা নিয়ন্ত্রণকারী এবং সুপরিচিত নিয়ম। দ্বিতীয় প্রকার আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত আইন হচ্ছে তাই যা সামাজিক জীবনের বিভিন্ন দিকের সাথে জড়িত। উপলব্ধি কিভাবে কাজ করে, কিভাবে মানুষের মনোভাব পরিবর্তন বা প্রতিস্থাপন করতে হয় তা হচ্ছে উত্তম উদাহরণ। পুনরায়, এসব আইনকে ইতিবাচক উপায়ে ব্যবহার করা যায় অথবা অপব্যবহার করা যায়, উদ্দেশ্য চরিতার্থ ও অন্যের ক্ষতি করে নিজ কাজে লাগানোর জন্য। আইনের ইতিবাচক ব্যবহার করে অধিকতর উপকারী কাঙ্ক্ষিত পথে মানুষের ব্যবহারকে পরিবর্তন করা যায়; যেখানে আইনের নেতিবাচক ব্যবহার রয়েছে যেমন- মন-বিগড়ানো, মগজ ধোলাই এবং খারাপ কাজ উৎসাহিতকরণ।

৩. স্বয়ং আল-কুরআন-এর বাণী বোঝা ও উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে তাফাক্কুরের সাহায্য নেওয়া যায়। এর অর্থ বোঝলে ইবাদত করতে [সালাত, প্রার্থনা (দুআ), আল্লাহ তায়ালার স্মরণ (যিকর) ইত্যাদি] সহায়তা হয়, কিংবা এর গূঢ় অর্থ জীবনের সর্বক্ষেত্রে বোঝা যায়।

৪. আত্ম-উপলব্ধি ও আত্ম-জবাবদিহিতার পথেও তাফাক্কুরের প্রভাব রয়েছে যা ইবাদতের একটি প্রার্থিত পদ্ধতি।

> হে ইমানদারগণ! আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করো। প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রিম পাঠিয়েছে (সুরা হাশর ৫৯ : ১৮)।

৫. অনুমিত এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তাফাক্কুর ভবিষ্যত সমস্যা সমাধানের পথে চালিত করতে পারে। রাজার স্বপ্ন ব্যাখ্যায় ইউসুফ আ.-এর কাহিনী দেখুন (সুরা ইউসুফ ১২ : ৪৬-৪৯)।

তাফাককুরের বিঘ্ন সৃষ্টিকারী অন্তরায়সমূহ

আল-কুরআনে কিছু সুনির্দিষ্ট উপাদানের উল্লেখ রয়েছে যা নেতিবাচকভাবে তাফাক্কুরকে প্রভাবিত করে প্রতারণা, মিথ্যা, মূর্খতা, অবিশ্বাস ও বিভ্রান্তির পথে চালিত করে। উদাহরণস্বরূপ :

www.pathagar.com

১. মূর্খতা এবং সত্য সম্বন্ধে সচেতন না হওয়া (জাহল)

আমরা তাদের নিকট ফিরিশ্‌তা প্রেরণ করলেও এবং মৃতেরা তাদের সাথে কথা বললেও এবং সকল বস্তুকে তাদের সামনে হাজির করলেও যদি না আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করেন তারা বিশ্বাস করবে না; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খ (সুরা আন'আম ৬ : ১১১)।

এবং বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করিয়ে দিই; অতঃপর তারা প্রতিমা পূজক এক জাতির নিকট উপস্থিত হয়। তারা বলল, হে মুসা! তাদের দেবতার ন্যায় আমাদের জন্যও এক দেবতা বানিয়ে দাও; সে বলল, তোমরা তো এক মূর্খ সম্প্রদায় (সুরা আ'রাফ ৭ : ১৩৮)।

২. সত্য হতে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া (আল-ই'আরাদ)

তারা যেমন- প্রথমবারে ওতে বিশ্বাস করেনি তেমনি আমিও তাদের অন্তরে ও চোখে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করব (যতদিন ইচ্ছা আমরা অন্তর ও চোখকে সত্য হতে ফিরিয়ে রাখব)[১৫] এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদভ্রান্তের ন্যায় এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে দেবো (সুরা আন'আম ৬ : ১১০)।

অতঃপর তারা যখন সত্য পথ হতে সরে গেল তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের হৃদয়কে সত্য হতে দূরে রাখলেন[১৬] (সুরা আস সফ ৬১ : ৫)।

এইসব আয়াত আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রচলিত প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি ইঙ্গিত করে, যেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো ব্যক্তি মিথ্যা বিশ্বাসে অবিচল থাকলে এবং সত্যের ধ্বনি প্রত্যাখ্যান করলে ক্রমশ সত্যকে উপলব্ধি করার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে[১৭]।

৩. গতানুগতিকতা ও অন্ধ অনুসরণ (তাকলীদ ও তা'আসসুব)

যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা যা নাযিল করেছেন তা তোমরা অনুসরণ করো, তারা বলে, না, না, বরং আমরা আমাদের

---

১৫ যতদিন তারা সত্য হতে অন্ধ থাকে এটা গ্রহণে তাদের অনিচ্ছার ফলস্বরূপ এবং এটা ঘটে আল্লাহ কর্তৃক তাঁর সৃষ্টির ওপর বলবৎকৃত কার্যকারণের বিধানের প্রভাবেই। আসাদ, নোট # ৯৫ পৃষ্ঠা-১৮৯।

১৬ এভাবে, ভুল কাজে অটল থাকলে তা তেমনি ভাবেই মানুষের বিশ্বাসের ওপর প্রতিক্রিয়া করবে। আসাদ, নোট # ৪ পৃষ্ঠা-৮৬০।

১৭ আসাদ, নোট # ৭ পৃষ্ঠা-৪।

www.pathagar.com

পিতৃপুরুষদেরকে যাতে পেয়েছি তার অনুসরণ করব।' এমনকি তাদের পিতৃপুরুষগণ যদিও কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎপথেও পরিচালিত ছিল না, তথাপিও? (সুরা বাকারা ২ : ১৭০)

৪. লালসা ও খাহেশ (হাওয়া)

তবে, দেখো, অনেকে অজ্ঞতাবশত (প্রকৃত জ্ঞান ব্যতীতই) নিজেদের খেয়ালখুশি (খাহেশ) দ্বারা অবশ্যই অন্যকে বিপথগামী করে (সুরা আন'আম ৬ : ১১৯)।

তুমি দেখো না তাকে যে তার খাহেশকে (কামনাবাসনা) ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে[১৮] (সুরা ফুরকান ২৫ : ৪৩)?

অতঃপর তারা যদি তোমার মোকাবেলায় সাড়া না দেয়, তাহলে জেনে রাখো যে তারা কেবল নিজেদের পছন্দ-অপছন্দের অনুসরণ করে। আল্লাহ তায়ালার পথনির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজ পছন্দ-অপছন্দের অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে? (সুরা কাসাস ২৮ : ৫০)

৫. অহংকার বা দম্ভ (তাকাব্বুর)

কুরআনে প্রায় ষাট স্থানে অহংকার (তাকাব্বুর) সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। সবখানেই এর প্রতি ধিক্কার দেওয়া হয়েছে, যেহেতু ধ্বংসের পথে যাওয়া ও আল্লাহ তায়ালার বাণীকে অস্বীকার করার এটা অন্যতম কারণ।

পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে দম্ভ করে বেড়ায় তাদের দৃষ্টি আমার নিদর্শন হতে ফিরিয়ে দেবো, তারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও তাতে বিশ্বাস করবে না, তারা সৎপথ দেখলেও তা পথ বলে গ্রহণ করবে না, কিন্তু তারা ভ্রান্ত পথ দেখলে তা পথ হিসেবে গ্রহণ করবে, এটা এজন্য যে, তারা আমার নিদর্শনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে এবং সে সম্বন্ধে তারা ছিলো গাফিল[১৯] (সুরা আ'রাফ ৭ : ১৪৬)।

---

১৮ আরো দেখুন : আল-জাসিয়া-২৩।

১৯ যেমনটা আল্লাহ তায়ালা কুরআনে প্রায়শই পাপীদের কৃত পাপের কারণ বলতে গিয়ে তাদের নিজেদের আচরণ ও অবাধ পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আসাদ, নোট # ১১০ পৃষ্ঠা- ২২৪।

www.pathagar.com

এইভাবে আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করে দেন[২০] (সুরা মুমিন ৪০ : ৩৫)।

৬. মুনাফিকী বা কপটতা (নিফাক)

যেহেতু নিফাক অর্থ অসততা এবং মন্দ অন্তঃকরণ যা সন্দেহ ও আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার প্রতি আনুগত্যে অনিচ্ছায় পরিপূর্ণ, এ অবস্থা বোঝার বা উপলব্ধির সামর্থ্যকে কেড়ে নেয়। কিন্তু মুনাফিকগণ তা বোঝে না (সুরা মুনাফিকুন ৬৩ : ৭)।

৭. আন্দাজ-অনুমানের ওপর নির্ভরতা

আন্দাজ অনুমান নিশ্চিত প্রমাণ বহির্ভূত, এবং এসবের সার্বজনিন আবেদন নিশ্চিতভাবেই মিথ্যার দিকে চালিত করবে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন : যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথামতো চলো তবে তারা তোমাকে আল্লাহ তায়ালার পথ হতে বিচ্যুত করবে; তারা তো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে; আর তারা শুধু আন্দাজে কথা বলে[২১] (সুরা আন'আম ৬ : ১১৬)।

আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, অনুমান কখনো সত্যের বিকল্প হতে পারে না[২২]।

৮. সন্দেহ নিরসনের পর সচেতন অস্বীকৃতি বা সত্য প্রত্যাখ্যান করা (জুহুদ)[২৩]

অতঃপর যখন ওদের নিকট আমাদের আলোকোজ্জ্বল নিদর্শন এলো, ওরা বলল, এতো স্পষ্ট যাদু! ওরা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলো প্রত্যাখ্যান করল যদিও ওদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল (সুরা নামল ২৭ : ১৩, ১৪)।

---

২০ এটা তাদের সম্বন্ধে বলা হয় যারা কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ ছাড়াই আল্লাহর বাণী সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করে।

২১ আরো দেখুন : আল-আন'আম-১৪৮, ইউনুস- ৬৬, আন-নাজম-২৩ ও ২৮, আল-জাসিয়া-২৪।

২২ এমনই রয়েছে ইউনুস-৩৬ ও আন-নাজম-২৮ আয়াতে।

২৩ জাহাদা : কোনো ব্যক্তির কোনো কিছুকে প্রত্যাখ্যান বা বাতিল করা বোঝায়, যা সে সত্য বলেই জানে। আসাদ, নোট # ৪৫ পৃষ্ঠা-৬১৩।

www.pathagar.com

এভাবেই বিপথগামী হয় তারা যারা জেনেশুনে আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে (সুরা মুমিন ৪০ : ৬৩)।

এবং কেউ জেনেশুনে আমাদের নিদর্শন অস্বীকার করে না যদি না তা চরম সত্যের অস্বীকৃতির জন্য করা হয়[২৪] (সুরা আনকাবূত ২৯ : ৪৭)।

৯. আল্লাহ তায়ালার বাণীর প্রতি মিথ্যারোপ করা (তাকযীব)

তাদের অভ্যাস ফির'আউনী সম্প্রদায় ও তাদের পূর্ববর্তীদের অভ্যাসের ন্যায়; ওরা আমাদের আয়াতকে অস্বীকার করেছিল, ফলে আল্লাহ তায়ালা তাদের পাপের জন্য তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিলেন। আল্লাহ তায়ালা শাস্তিদানে অত্যন্ত কঠোর (সুরা আলে ইমরান ৩ : ১১)।

যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে? (সুরা আন'আম ৬ : ২১)

যারা আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাৎকে মিথ্যা গণ্য করে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এমনকি অকস্মাৎ তাদের নিকট যখন কিয়ামত উপস্থিত হবে তখন তারা আফসোস করে বলবে, হায়, আক্ষেপ আমাদের জন্য, আমরা এর প্রতি অবহেলা করেছি (সুরা আন'আম ৬ : ৩১)।

এবং যারা আমার বাণীকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। (সুরা আ'রাফ ৭ : ৩৬)।

পরন্তু ওরা যে বিষয়ের জ্ঞান আয়ত্ত করেনি তা অস্বীকার করে এবং এখনও এর পরিণাম ওদের নিকট উপস্থিত হয়নি। এভাবে ওদের পূর্ববর্তীগণও মিথ্যা আরোপ করেছিল; সুতরাং দেখো, যালিমদের পরিণাম কী হয়েছে (সুর ইউনুস ১০: ৩৯)।

---

[২৪] আরো দেখুন : আল-আন'আম-৩৩ সুরা আ'রাফ ৭ : ৫১ ফুসসিলাত-১৫ এবং আল-আহকাফ-২৬ আয়াত।

www.pathagar.com

আমাদের প্রতি ওহি প্রেরণ করা হয়েছে যে, পরকালে শাস্তি তার জন্য, যে মিথ্যা আরোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয় (সুরা ত্বহা ২০ : ৪৮)!

প্রকৃতপক্ষে, ওপরে উদ্ধৃত সকল বাধা (অন্তরায়) সত্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে আমাদেরকে ভুলপথে চালিত করার কাজে বিশাল ভূমিকা রাখে।

এটা আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনার জ্ঞানের সন্ধান দেয় দিনে অন্তত সতেরবার সুরা আল-ফাতিহা তিলাওয়াতের মাধ্যমে :

আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করো, সেই লোকদের পথ যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছ, তাদের পথ নয় যারা তোমার ক্রোধ-নিপতিত, তাদের পথ নয় যারা পথভ্রষ্ট।

কতিপয় মুফাসসির মনে করেন যে, গজবপ্রাপ্ত (ক্রোধ- নিপতিত) বলতে এখানে তাদেরকেই বোঝানো হয়েছে যারা সত্যকে জানে, কিন্তু তা অনুসরণে ব্যর্থ হয়েছে।

এছাড়াও নবির স. দুআর মধ্যেও বিশাল জ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায়, হে আল্লাহ তায়ালা! আমাকে সেই সত্য উপলব্ধি করতে সাহায্য করো যে সত্য আমাকে তা অনুসরণের সামর্থ্য জোগায়, এবং যা মিথ্যা তাকে মিথ্যা বলেই বোঝতে দেয় এবং তা হতে আমাকে বিরত রাখে।

১০. মানুষের উপলব্ধিকে প্রভাবিত করতে শয়তানের ভূমিকা

আল-কুরআন একথা দিয়ে শুরু যে, শয়তান মানবজাতির প্রকাশ্য শত্রু। (সুরা বাকারা ২ : ১৬৮), (সুরা আ'রাফ ৭ : ২২), (সুরা ইউসুফ ১২ : ৫), (সুরা আয যুখরুফ ৪৩ : ৫৩), (সুরা ফাতির ৩৫ : ৬), (সুরা আয যুখরুফ ৪৩ : ৬২)।

আল-কুরআন আমাদের জানায় যে, শয়তান আল্লাহ তায়ালার নিকট এই ওয়াদা করেছিল যে, সে মানুষকে বিভ্রান্ত করবে, এবং তাদের অন্তরের মধ্যে মিথ্যা আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করবে (সুরা নিসা ৪ : ১১৯)।

এইসব সত্যের ভিত্তিতে আল্-কুরআন শয়তানের পদাংক অনুসরণ না করার জন্য এবং তার নিকট হতে দূরে থাকার জন্য সতর্ক করে। (সুরা আন'আম ৬ : ১৪২), (সুরা আ'রাফ ৬ : ২৭), (সুরা নূর ২৪ : ২১), (সুরা ইয়াসীন ৩৬ : ৬০)।

www.pathagar.com

আরেকটি সতর্ক সংকেত হচ্ছে এই যে, শয়তান অসুন্দর ও ভুল ব্যতীত নির্দেশ করবে না (সুরা নূর ২৪ : ২১)। এবং আরো এই যে, সে লোকদেরকে পাপ ও লজ্জাজনক কাজের নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ তায়ালা সম্বন্ধে সেইসব কথা বলে যে সম্পর্কে লোকদের কোনো জ্ঞান নেই (সুরা বাকারা ২ : ১৬৯)।

আল-কুরআনে ব্যবহৃত শব্দগুলো হচ্ছে : কুমন্ত্রণা দান, আহ্বান, প্রতিশ্রুতি প্রদান এবং শয়তানের ধারণা ও চিন্তাধারার সাথে যোগাযোগ করার জন্য ইঙ্গিত দেওয়া।

শয়তান যেসব লক্ষ্য অর্জন করতে চায় তার অন্যতম হচ্ছে শত্রুতা সৃষ্টি করা, মতবিরোধ, সন্দেহ পোষণ এবং দ্বীনী বিষয়ে ভুল ধারণা দেওয়া; মন্দ কাজে উৎসাহ দান এবং ভালো কাজে নিরুৎসাহিত করা যার ন্যূনতম হচ্ছে প্রতিশ্রুতি পূরণ ও কর্তব্য পালন।

তার কৌশলের মধ্যে পাপ কাজকে মানুষের সামনে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করা (সুরা আন'আম ৬ : ৪৮) এবং তাদের কৃতকর্মকে আনন্দদায়ক ও দৃষ্টিশোভন করা (সুরা নামল ২৭ : ২৪)।

শয়তান কিভাবে আমাদের উপলব্ধিকে প্রভাবিত করে সে সম্বন্ধেও আল-কুরআন আমাদেরকে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করেছে। এর একটি উদাহরণ হচ্ছে মানুষকে ভালো কাজ করতে উৎসাহিত না করার বিষয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় (সুরা বাকারা ২ : ২৬৮)।

যে মুহূর্তে কোনো মানুষ কিছু দানের দ্বারা সদকা স্বরূপ কোনো অভাবীকে সাহায্য করতে ইচ্ছা করে, তা অল্প বা বেশি যাই হোক না কেন, শয়তান ঐ ব্যক্তির (দাতা) মনের মধ্যে নেতিবাচক নির্দেশনা দেবে তাকে ঐরূপ করা হতে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে। শয়তান তাকে তার অন্যান্য প্রতিশ্রুতি ও দায়শোধের কথা মনে করাবে এমনভাবে, যাতে তার মনে দারিদ্রের আশংকা জাগে, যেমনটা এ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা ব্যাখ্যা করে কেন ইসলাম বিশ্বাসীদেরকে দান ও সদকা করতে উৎসাহিত করে এবং বিরাট পুরস্কারের পাশাপাশি যা সে দিচ্ছে তার প্রতিদান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

www.pathagar.com

> তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান দেবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ রিয্‌কদাতা (সুরা সাবা ৩৪ : ৩৯)।

দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টি সম্বন্ধে আরেকটি উদাহরণ। আল-কুরআন বলে,

> আমার বান্দাদেরকে যা উত্তম তা বলতে বলো। কারণ শয়তান ওদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে উস্কানি দেয় (সুরা বনী ইসরাঈল ১৭ : ৫৩)।

যখন কোনো ব্যক্তি ক্রোধ, চাপ ও হতাশার মধ্যে থাকে, তখন তার আবেগের ওপর তার নিয়ন্ত্রণ স্বল্পই থাকে এবং এর ফলে, কথার ওপরও। সে কর্কশ শব্দ পছন্দ করে এবং চয়ন করে এমন শব্দ যা সম্বন্ধে প্রতিপক্ষ অপব্যাখ্যা করতে পারে। অন্যপক্ষ তখন ক্রোধান্বিত হবে এবং ঐ ব্যক্তিকে প্রতি-আক্রমণ করতে যেমন ইচ্ছা নেতিবাচক অর্থবাহী শব্দ ব্যবহার করবে। ফলাফল : একটি বিরোধ, ঝগড়া বা মতপার্থক্য এবং কঠিনতর অনুভূতি সৃষ্টি হবে যা দুই পক্ষের সম্পর্ককে (স্বামী-স্ত্রী, বন্ধু-বান্ধব, সহকর্মী ইত্যাদি) কঠিন বিপদজনক অবস্থায় নিয়ে যাবে। সুন্নাহ বিশ্বাসীদেরকে এমন উপায় বাতলে দেয় (যেমন- ওজু, দু'আ) যা এ চাপ ও ক্রোধ প্রশমিত করে, ব্যক্তির অবস্থানের এমন পরিবর্তন ঘটায় যাতে সে তার আবেগ ও রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ হয়। এ থেকে এটাও বোঝা যায় কেন রসুল সা. বিচারকদেরকে রাগান্বিত অবস্থায় কোনো কিছু পরিমাপ বা মূল্যায়ন করতে কিংবা কোনো রায় দিতে নিষেধ করেছেন।

এভাবে, পূর্বাহ্নেই আমাদের উপলব্ধির ওপর শয়তানের প্ররোচনা সম্বন্ধে অবগতি থাকলে এটাকে এড়িয়ে চলা বা অবস্থাকে লঘু করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফল পাওয়া যায়।

ইসলামে চিন্তাকে উৎসাহিতকরণ

ইসলাম বিভিন্ন পর্যায়ে এবং বিভিন্ন উপায় ও পদ্ধতিতে সৃজনশীলতা ও সৃজনশীল চিন্তাকে উৎসাহিত করে।

- ইসলামি গভীর চিন্তা, প্রতিফলন, হিসাবকরণ এবং উত্তম বোঝাপড়ার আহ্বান জানায়;
- এতে এমন প্রকাশভঙ্গির ব্যবহার রয়েছে যা মনকে উদ্দীপ্ত করে এবং একে চিন্তা করতে এগিয়ে দেয়;

www.pathagar.com

- এতে বাধ্যবাধকতা এবং পক্ষপাত, কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতাকে করা হয়েছে নিরুৎসাহিত;
- এই দ্বীন উন্মুক্ত-মনন, উদার-আত্মা এবং নমনীয়তাকে বর্ধিত করে এবং বিশ্লেষণাত্মক ও মূল্যায়নধর্মী চিন্তাকে কাজে লাগায়।

সমকালীন অতি পরিচিত মুসলিম চিন্তাবিদদের অন্যতম মালিক বিন নাবী প্রাচ্যবিদদের ভুল ধারণার প্রতিবাদে কিভাবে ইসলাম চিন্তাকে উৎসাহিত করে তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি এক্ষেত্রে এসব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন : আমাদের এটা অনুসন্ধান করা উচিত যে, মুসলিম সমাজে আল-কুরআন বৈজ্ঞানিক উদ্দীপনার উপযোগী পরিবেশ গঠন করতে এবং সেই সাথে জ্ঞান অর্জন ও বিস্তারণে প্রয়োজনীয় মানসিক প্রেরণা ছড়াতে পেরেছিল কিনা[২৫]? বিন নাবী'র মতে, ঐ প্রশ্নের উত্তর হলো : অবশ্যই আল-কুরআন বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে অগ্রগতির উপযোগী নতুন বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমণ্ডল সৃষ্টিতে সমর্থ ছিল[২৬]।

তাফাককুর সম্বন্ধে মালিক বিন নাবীর আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রয়েছে। তা হলো, সভ্যতার পূর্বশর্ত হিসেবে সমাজে ধ্যানধারণা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা। আদর্শের দারিদ্র সংকটের দিকে চালিত করে এবং অগ্রগতিকে শ্লথ করে দেয়। তিনি বলেন, আমাদের এই সত্য বিবেচনা অবশ্যই করতে হবে। ইতিহাসের সংকটময় ক্রান্তিলগ্নে একটি সমাজে যা ঘটে, তা এর বস্তুগত সামগ্রীর অভাব নয়, বরং এর আদর্শের অভাব[২৭]।

মালিক যেন পূর্বেই বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ বোঝতে পেরেছিলেন। যা এখন মুসলিম সমাজকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে, এমতাবস্থায় তিনি উল্লেখ করেন যে, একটি সমাজ অগ্রগতি অর্জন করতে পারে না আমদানীকৃত বা চাপিয়ে দেওয়া আদর্শ দ্বারা। তিনি বলেন, যে সমাজ তার নিজস্ব মৌলিক আদর্শ সৃষ্টি করে না, তার পক্ষে না নিজের চাহিদা মোতাবেক ভোগ্য দ্রব্যাদি উৎপাদন সম্ভব, না এর শিল্পের জন্য উৎপাদন সম্ভব।

---

২৫ মালিক বিন-নাবী, 'ইনতাজু আল-মুশরিকীন, (কায়রো : মাক্তাবাত 'আমর, ১৯৭০, পৃষ্ঠা- ৩৪)।

২৬ প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা- ৩৭।

২৭ প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা- ২৭।

www.pathagar.com

একটি সমাজ কখনও আমদানীকৃত ভাবাদর্শ বা বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া আদর্শ দ্বারা নিজেকে নির্মাণ করতে পারে না[২৮]।

অতি সুপরিচিত সমকালীন পণ্ডিত প্রফেসর ড. অর্জুন কুরআনের নির্দেশনার পঞ্চম মৌলিক নীতিটিকে বস্তুবাদী প্রভুত্ব ও বাতিক সম্পর্কে মানবমনকে উত্তেজিত ও স্বাধীন করার জন্য বিবেচনা করেছেন, যাতে আক্লকে-এর প্রকৃত অবস্থায় খাপ খাওয়ান যায়। তিনি এই মতও পোষণ করেন যে, কুরআনের সংলাপের মধ্যে ব্যবহৃত যৌক্তিক চিন্তা ও বিচারবুদ্ধি, যার মাধ্যমে অবিশ্বাসীদের ভুল-বোঝা দূরীভূত হয় এবং তাদের ভুল ধারণা খণ্ডন করা যায়, এসবই হচ্ছে আল-কুরআনের ই'আজায বা অতুলনীয়তার বৌদ্ধিক উপাদান[২৯]।

এই ব্যাপারে ওহির প্রথম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে জীবনে যা আমরা করি তার সবকিছুতেই ইহসান[৩০]-এর জন্য আহ্বান। আল্লাহ তায়ালা বলেন : যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য (এবং এটা দেখানোর জন্য)-কে কর্মে উত্তম[৩১]।

ইসলামে মানুষ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এটাকে অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য গণ্য করা যায়। এই আহ্বান হচ্ছে সচেতন ও সতর্ক করা সেইসব বিষয়ে যা একজন মুসলিম করে থাকে।

আত্ম-জবাবদিহিতা শুধু সৎ ও আন্তরিক থাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় যা অনেক মুসলিম মনে করে। এই সংকীর্ণ ধারণার জন্যই আমরা মুসলিমদের প্রাত্যহিক জীবনের কার্যকলাপে অসংগতি লক্ষ্য করি।

আমরা সঠিকভাবে, পরিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় এবং সুন্দরভাবে কর্ম সম্পাদনের জন্যও দায়ী।

অত্যুত্তম (Best) পরিভাষাটি কুরআনের আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে এটা বোঝাতে যে, আমরা মুসলিমরা যা কিছু করি তাতে যেন প্রতিযোগিতাপূর্ণ হই।

---

২৮ প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা- ৬২।

২৯ আল-কুরআন আল-আযীম হিদায়াতুহু-ওয়া-'ইআজাযুহু, দারু-আল-কালাম, দামেশ্ক ১৯৮৯ পৃষ্ঠা- ৪৮।

৩০ একটি শব্দ যার অর্থ হচ্ছে কাজ সম্পাদন করা পূর্ণভাবে, সঠিকভাবে ও সুন্দর পদ্ধতিতে।

৩১ সুরা আল-মূলক ৬৭ : ২।

www.pathagar.com

কুরআনের দাওয়াতের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পাঠের জন্য নির্দেশ : ইকরা, যা জ্ঞান ('ইল্‌ম) কে বোঝায়।

এ বিষয়ক কিছু কুরআনের আয়াত উল্লেখ করা যায় :

> তোমাদের মধ্যে যারা ইমান এনেছে এবং উপরন্তু যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে মর্যাদায় উন্নীত করবেন (সুরা মুজাদালা ৫৮ : ১১)।
>
> মানুষের জন্য আমি এই সকল দৃষ্টান্ত দিই; কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিরা ব্যতীত কেউই এর অন্তর্নিহিত অর্থ আয়ত্ত করতে পারে না (সুরা আনকাবূত ২৯ : ৪৩)।
>
> রসুল সা. এবং সকল মুসলিমকে আল্লাহ তায়ালার কাছে অধিক হতে অধিকতর জ্ঞানের জন্য তাদের দু'আয় এই প্রার্থনার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে : হে প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করো (সুরা ত্বহা ২০ : ১১৪)।

জাবির বিন আবদুল্লাহ (রাযি আল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন যে, রসুল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো ভালো কাজের প্রবর্তন ঘটায়, এতে তার জন্য পুরস্কার রয়েছে এবং যারা এই কাজ করবে তাদের সকলের পুণ্যও তার জন্য। অথচ তাদের পুরস্কারে কোনো কমতি করা হবে না। এবং যে কেউ ইসলামে কোনো মন্দ কাজের প্রচলন করে, সে এর পাপ বহন করবে এবং যারা এই কাজ করবে তাদের পাপও তার ওপর বর্তাবে এবং তাদের এই বোঝা কোনোভাবেই হাল্‌কা করা হবে না[৩২]।

ওপরে উদ্ধৃত হাদিসটি ভালো কাজের প্রচলনের আকাঙ্ক্ষার নীতির পরিচায়ক এবং যে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে তা অভাবগ্রস্তকে সাহায্যের ক্ষেত্রে দান সম্পর্কিত।

ভালো কাজ করতে উৎসাহ প্রদান ছাড়াও, এ হাদিসটিতে অন্যের জন্য সমকক্ষ হওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে ভালো কাজের উদ্যোগের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এসব ভালো কাজ কেবল ধর্মীয় বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং পার্থিব বিষয়েও সংশ্লিষ্ট, যেহেতু নবি সা. বলেছেন, যে কেউ ইসলামে কোনো ভালো কাজের প্রচলন করবে তার জন্য এর পুরস্কার রয়েছে এবং সে ছাড়া যারা এই কাজ করবে তাদের পুরস্কারেও সে অংশীদার হবে অথচ তাদের পুরস্কারে কোনো কম হবে না।

---

৩২ হাদিসটি ইমাম মুসলিম (রহ) সংকলন করেছেন।

www.pathagar.com

হাদিসের বিবরণমতে, যে কাজে সম্প্রদায়ের কল্যাণ হয় তেমন কাজ চালু করার পুরস্কার অনেক বড়। কারণ এতে মুযার গোত্রের লোকদের দুঃখ দুর্দশা বিমোচনে জনগণকে দান-খয়রাত করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত অধিকাংশ মুসলিম প্রায়ই ভালো কাজের উদ্যোগ গ্রহণের কথা ভুলে থাকে।

আমাদের সমকালীন জীবনে ভালো কাজের উদ্যোগ নেওয়ার অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে। প্রায় কুড়ি বছর পূর্বে, কিছুসংখ্যক ডাক্তার স্বল্প-সুযোগপ্রাপ্ত দেশসমূহে বিভিন্ন সম্প্রদায়, বিশেষ করে মুসলিমদের সেবা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তারা বোঝতে পারেন যে, এসব দেশে যথেষ্ট সংখ্যক ডাক্তার নেই। তারা এমন কর্মসূচি গ্রহণ করেন যাতে ডাক্তাররা মাসব্যাপী অবকাশ সময়ে এসব স্বল্প-সুযোগপ্রাপ্ত দেশের একটিতে তাদের সময় কাটান, বিনামূল্যে অসুস্থ লোকদের চিকিৎসা করেন। এই অবকাশ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার পথে এক ধরনের জিহাদ। এর উদ্যোক্তারা এরকম একটি মহৎ আদর্শের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করাতে পুরস্কৃত হবেন এবং যারা এক্ষেত্রে সমকক্ষতা অর্জন করতে চান তারাও পুরস্কৃত হবেন।

আরেকটা দৃষ্টান্ত হিসেবে জারিকৃত ফতোয়া রয়েছে, যাতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, হজ্ব মৌসুমে কুরবাণীকৃত পশুর গোশত অন্য সেসব দেশে পাঠানো যাবে যেখানে অভাবী মানুষ রয়েছে। এটাকে নবি সা.-এর সুন্নাহর বিপরীত মনে হতে পারে, কারণ ইসলামের শুরু হতে প্রায় দশ বছর আগে পর্যন্তও কুরবাণীর পশুর গোশ্ত কেবল মক্কার অভাবী লোকদের মধ্যে বিতরণ করা হতো। মক্কায় হকদার লোকদের সংখ্যা কমে যাওয়ায় এবং কুরবাণীর গোশতের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় অধিকাংশ গোশতই নষ্ট হয়ে যেত। হিমায়িত করে রাখা ও অন্য দেশে প্রেরণের এই ফতোয়ার ফলে পৃথিবীর অন্যান্য অংশের মুসলিমরাও কুরবাণীর গোশতের উপকার পাচ্ছে। ফতোয়ার ফলে কার্যকর এই প্রক্রিয়া পৃথিবী জুড়ে বঞ্চিত মুসলিমদের কল্যাণ করছে।

তহবিল সংগ্রহের নামে ক্যালেন্ডার এবং পুস্তিকা বিক্রিও ভালো ও কল্যাণকর কাজের নতুন পদ্ধতি হিসেবে স্পষ্ট দৃষ্টান্ত। এ ধরনের চিন্তার উদ্যোক্তারা একটি নতুন উপকারী পদ্ধতি চালু করায় পুরস্কৃত হবেন এবং যারা এদের দেখাদেখি তা চালু করে তাদের পুণ্যেরও অংশীদার হবেন।

ইসলামে অনেক উদার ধারণা রয়েছে যেগুলো অপরিবর্তনীয় নয়। এসব উদার ধারণা বাস্তবায়নে নতুন পথ চালু করাকেও ইসলামে উত্তম কাজের প্রচলন বলে বিবেচনা করা যায়। যা উদ্ধৃত হাদিসের স্পষ্ট বর্ণনায় অনুমোদন করা হয়েছে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, আমরা উদার ইসলামি ধারণা বাস্তবায়নে নতুন

www.pathagar.com

কাজের প্রচলন সম্পর্কে আলোচনা করছি এবং ইবাদতের সাথে সম্পর্কিত নির্ধারিত বিষয়ে নতুন কাজ উদ্ভাবন করছি না। ইবাদত সংক্রান্ত বিষয়ে নতুন কাজের উদ্ভাবন বিদআত (দ্বীন বিরোধিতা)-এর দিকে চালিত করে যার পরিণাম পুরস্কারের পরিবর্তে শাস্তি।

উদাহরণস্বরূপ, ইসলাম অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করার অনুমতি দিয়েছে। এটা ইসলামে একটা সাধারণ ও উদার নীতি। ইসলাম অভাবীকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো পদ্ধতি বেঁধে দেয়নি। ইসলামে অভাবীকে সাহায্য করার জন্য নতুন পথ ও পদ্ধতির প্রচলনকে উৎসাহিত করা হয়েছে। রসুল সা. একজন পুরুষ লোকের কাহিনী উল্লেখ করেছেন, অন্য বর্ণনায় একজন স্ত্রীলোকের, যারা ছিল সফরে। তারা খুব পিপাসার্ত হয়ে পড়ে এবং একটা কূপ দেখতে পায়। তারা কুয়ায় নামে এবং পিপাসা নিবারণে পানি পান করে। তারা যখন কূপ হতে উঠে আসে তখন দেখে একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে। তারা তাদের জুতায় পানি ভরে কুকুরটাকে পান করায়। এই উত্তম কাজের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাদের পাপ ক্ষমা করেন[৩৩]। এমনকি ইসলামে পরিত্যাজ্য পশুকে সাহায্য করাকেও উত্তম কাজ গণ্য করা হয়েছে। এক্ষেত্রে স্বগোত্রীয় মনুষ্যজনকে সাহায্য করার পুরস্কার মহত্তর।

মাসিক আয়ের একটি বিশেষ পরিমাণ দিয়ে এতিমকে লালনপালনের ধারণা এতিম প্রতিপালনের একটি নতুন পদ্ধতি। এই ধারণাটি রসুল সা.-এর যুগে প্রচলিত ছিল না। তবে, এতিমকে সাহায্য করার ধারণা সে সময় প্রচলিত ছিল এবং এতে উৎসাহ দেওয়া হতো। এতিমকে সাহায্য করার এই নতুন পদ্ধতিকে ইসলামে উত্তম কাজের প্রবর্তন বলে বিবেচনা করা হয় এবং এর উদ্যোক্তারাই শুধু এর প্রতিদান পাবে না বরং যারা এ দৃষ্টান্ত অনুসরণে এমন পদ্ধতিতে কাজ করবে তারা তাদের প্রতিদানের অংশও পাবে।

ওয়াক্‌ফ্ (বৃত্তি বা খোরপোষ)-এর নীতিও ইসলামের উদার ধারণাসমূহের অন্যতম যা বাস্তবায়নে নতুন পদ্ধতির প্রচলনে বাধা নেই। ওয়াক্‌ফ্ হচ্ছে চিরস্থায়ী ও চলমান ক্রিয়াকর্ম যা ব্যক্তির মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে। ওয়াক্‌ফ্-এর অনেক রূপ ও পদ্ধতি রয়েছে। ব্যক্তি কোনো দালানকে ওয়াক্‌ফ্ করতে পারে, যেটা গৃহহীনদের বসবাসের জন্য উৎসর্গিত। এ ধরনের ওয়াক্‌ফ্ নতুন কিছু নয় এবং এর বাস্তবায়ন অনেকভাবেই হতে পারে। ওয়াক্‌ফ্-এর নীতি বাস্তবায়নে কেউ যদি নতুন পদ্ধতির

---

[৩৩] ইমাম আল-বুখারি (রহ) ও ইমাম মুসলিম (রহ) কর্তৃক সংকলিত।

www.pathagar.com

সূচনা করে বা উদ্যোগ নেয় তবে এ কাজের জন্য সে নিজের এবং যারা তার পদাংক অনুসরণ করে তাদের প্রতিদান বা পুরস্কার লাভ করবে।

শূরা (পরামর্শ) ইসলামের কর্তব্যসমূহের অন্যতম উন্মুক্ত ধারণা। শূ'রার বহু দিক রয়েছে, তা একাডেমিক বা ইল্‌মসংক্রান্ত হতে পারে, ইজতিমাইয়া (সামাজিক) সিয়াসিইয়্যাহ (রাজনৈতিক) ইত্যাদি হতে পারে। শূরার এই ধারণা উদার বা উন্মুক্ত এবং কার্যকরকরণ পদ্ধতি উদ্ভাবনযোগ্য।

এইসব উদার ধারণা বাস্তবায়নে নতুন পথ আমাদের সমকালীন জীবনের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য নিঃসন্দেহে একটি উত্তম কাজ চালুর প্রকরণ যা ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হাদিস অনুযায়ী ইসলামে দারুণভাবে সমর্থিত।

এ হাদিসের দ্বিতীয় অংশ, যা সর্ম্পকে বলতে অধিকাংশ শিক্ষাবিদই ভুলে যান, তা হলো মন্দ কাজের প্রচলন। নবি সা. বলেন, এবং যে ব্যক্তি ইসলামে কোনো খারাপ কাজের প্রচলন করে, সে এর পাপ বহন করবে এবং যারা তদনুযায়ী কাজ করবে তাদের পাপও বহন করবে এবং এতে তাদের (পাপের) বোঝা কোনোরূপ হাল্‌কা করা হবে না।

অন্য একটি হাদিসে এর উদাহরণ পাওয়া যায়। যাতে বলা হয়েছে যে, আদম আ.-এর পুত্র যে হত্যা চালু করেছিল তা শুধু তার পাপের বোঝা এবং তার জন্যই ক্ষতিকর কাজ হবে না, বরং যারা হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে তার অনুসরণ করবে তাদের পাপের বোঝাও সে বহন করবে।

যারা পাপ ও ক্ষতিকর কাজের প্রচলন করে, শুধু তারাই পাপী নয়, যারা তার উৎকর্ষ সাধন করে তারাও পাপী।

গণবিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র (WMD)-এর প্রচলন হচ্ছে এর সর্বসাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত। যারা এসব অস্ত্রের উদ্ভাবন ও প্রচলন করেছে তারা এখন এই দুষ্কর্ম সাধনের জন্য আফসোস করে। গণবিধ্বংসী অস্ত্রের উদ্ভাবক ও স্রষ্টারা অপরাধী এবং তারা তাদের পাপের বোঝাও বহন করবে যারা এসব অস্ত্র নিরীহ জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে। গণবিধ্বংসী অস্ত্র ব্যতীত জীবাণু অস্ত্রেরও একই ফলাফল এবং এসব অস্ত্রের প্রচলনকারীরা তাদের অনুসরণকারীদের পাপের বোঝাও বহন করবে।

যারা সমাজ মানস ও নৈতিকতায় পর্ণোগ্রাফি বা এ জাতীয় প্রযুক্তির অপব্যবহারের মাধ্যমে দুর্নীতির বিস্তার ঘটায় তারাও পাপী। তারা শুধু তাদের নিজেদের পাপের

www.pathagar.com

বোঝাই বহন করবে না বরং যারা তাদের প্রচলিত প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিজেদের কামনা বাসনা পরিতৃপ্ত করতে চায়, তাদের পাপও বহন করবে।

পাশ্চাত্য মাধ্যম, বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে যার স্থানান্তর ও প্রচলন করা হচ্ছে তা এর নতুন প্রবণতা ও নির্দেশনায় বিনোদনের নামে বিভিন্ন প্রকার বিপদজনক ভাবধারা উস্কে দিচ্ছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, সঙ্গীতের ভিডিও ক্লিপ অরুচিকর জীবন পদ্ধতিকে উৎসাহিত করছে। উচ্ছৃঙ্খলতার ব্যবহার এবং ড্রাগ বিনোদনের আরেকটি উৎসের দৃষ্টান্ত। তারা বর্তমান যুব সম্প্রদায়ের মনকে অলক্ষ্যে দূষিত করে চলেছে। যারা এ ধরনের বিনোদনের উদ্ভাবক তারা এ দুষ্কর্মের জন্য পাপী এবং যারা বিরূপভাবে তাদের ধ্যানধারণা দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে, পরিণামে তাদের পাপের বোঝাও এদেরকে বহন করতে হবে।

অপরাধ ও পাপাচারে উৎসাহিত করে ও উস্কানি দিয়ে তারা মনুষ্যজাতির আখলাক (চরিত্র), হায়া (লজ্জা) এবং ফিতরাত (প্রকৃতিগত প্রবণতা)-এর দুর্নীতির জন্য দায়ী হয়েছে।

এই হাদিসটিতে সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় যে, ইসলাম উত্তম ও উপকারী কাজকর্মের সূচনা ও উদ্যোগকে উৎসাহিত করে। ইসলাম সৃজনশীলতাকে ততক্ষণ পর্যন্ত উৎসাহিত করে যতক্ষণ না তা ক্ষতি বা পাপের দিকে চালিত করে। যে মূল্যবোধ উম্মাহকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করে তার সাথে সৃজনশীলতা সংহত হওয়া বিধেয়। এ ধরনের সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা হয় এবং এজন্য পুরস্কার রয়েছে। যে ব্যক্তি তার সৃজনশীলতাকে একটি ভালো কাজের সূচনা বা উদ্যোগে ব্যবহার করে সে একাজের জন্য পুরস্কৃত হবে এবং কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত যারা তাকে অনুসরণ করবে তাদের প্রতিদানে কোনোরূপ হ্রাস না করেই তাকেও তাদের জন্য জায়গা দেওয়া হবে।

ব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্বের সাথে উদ্যোগ সংযুক্ত। এটি কুরআন মজিদের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্যোক্তা তারাই যাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী রয়েছে। আজকাল নেতৃত্ব নির্বাচনের সময় আমাদের এটা লক্ষ্য রাখা উচিত। এটা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন যে তাদের উদ্যোগ রয়েছে এবং বৃহত্তরভাবে সম্প্রদায় ও উম্মাহর কল্যাণে তারা আগ্রহী।

www.pathagar.com

পূর্বে বর্ণিত হাদিসটি তাদের জন্য সতর্কবাণীস্বরূপ যারা খারাপ ও ক্ষতিকর অভ্যাসের প্রচলন করে আল্লাহ তায়ালার বিরাগভাজন হচ্ছে। তারা তাদের দুষ্কর্মের জন্য পাপী হচ্ছে না বরং তাদের উৎসাহে যারা এসব কাজে তাদের অনুসারী হচ্ছে তাদের পাপও বহন করছে।

রসুল সা. কর্তৃক উল্লেখ করা হয়েছে এমনসব ইবাদতে পরিবর্তনের কিছুই নেই। কারণ তা রসুল সা.-এর আমলের দ্বারাই নির্ধারিত হয়ে রয়েছে।

'মাসালিহ আল-মুরসালাহ' হচ্ছে সেই ধারণা যেখানে রসুল সা. কর্তৃক সম্পাদিত হয়নি এমন কিছু চালু করা হয়ে থাকে। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে মিহরাব-এর প্রচলন যাতে জামাআতে সালাত আদায়ের সময় কাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় এবং কিবলার দিক নির্দেশও হয়ে থাকে। মিহরাব সালাতের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন সাধন করে না, বরং মসজিদের নতুন নক্শার কাজ করে যাতে লাভই হয়। আযান দিতে মাইক্রোফোনের ব্যবহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত। আযান একইভাবে দেওয়া হচ্ছে এবং এতে পরিবর্তন ঘটেনি; কেবল এর শব্দকে বৃদ্ধি করা হচ্ছে যাতে শোনা যায়। আরেকটি বিখ্যাত দৃষ্টান্ত হচ্ছে মাসহাফ (গ্রন্থ) আকারে আল-কুরআন সংকলন। আবুবকর (রাযি আল্লাহু আনহু) এর উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি কুরআনে কোনো পরিবর্তন সাধন করেননি। বরং একে সংকলিত করে সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এগুলো বিদআ'ত (দ্বীনে নব উদ্ভাবন) নয় যা ইসলামে নিন্দনীয়, কিন্তু ভালো কাজ প্রচলনের অন্তর্ভুক্ত। যেসব ভালো কাজ আল-কুরআন ও সুন্নাহর রক্ষাকবচ হিসেবে ভূমিকা রাখে তা উত্তম কাজ এবং এর জন্য পুরস্কৃত করা হবে।

ইসলামকে জীবনব্যাপী জ্ঞানভিত্তিক কর্মসূচি বলা হয়। ইসলামি সভ্যতার প্রতি ঘনিষ্ঠভাবে তাকালে স্বচ্ছভাবে দেখা যাবে যে ইসলাম এর দাবিতে সত্য : এভাবে একটি মাত্র শব্দ ইকরা'র মাধ্যমে, ইসলাম অনুসন্ধিৎসু মনকে পরিচর্যা করতে আরম্ভ করে, যেমন- আল-কুরআন, অন্যান্য সাহিত্য পাঠ করে এবং প্রকৃতিকে পর্যবেক্ষণ করে। আদর্শ (ধারণা) গঠন করবে এবং এই উপসংহারে উপনীত হবে যা তার নিজেকে এবং তার চারপাশের পৃথিবীকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে। জ্ঞানের সাধনা এবং প্রাকৃতিক প্রপঞ্চসমূহকে বোঝার জন্য যুক্তিবোধের প্রয়োগ ছিল জ্ঞানের ভিত্তিতে কুরআনের মৌলভিত্তি গঠন। অন্ধ অনুসরণ এবং অসময়ে ওয়াজকে

www.pathagar.com

যুক্তিবদ্ধ[৩৪] অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান এবং উপলব্ধির নতুন উদ্দীপনা দ্বারা পরিবর্তন করা হয়, যা হয়ে উঠেছিল ইসলামি চিন্তা ও পদ্ধতির মৌলিক উপাদান।

তারপর হতে অদ্যাবধি, কোনো গবেষণা নিবন্ধ বা প্রস্তাবই গায়ের দামে গৃহীত হয়নি; এসবের উৎপত্তি ও বৈধতা নির্ণয়ে যুক্তি ও যথার্থতা প্রয়োগ করা হয়েছে। এই নতুন পদ্ধতি এমনকিছু নিয়ে এসেছে যাকে এখন বৈজ্ঞানিক মানস বলে অভিহিত করা হয়। যা পৌরাণিক কল্পকথা বাতিল করে এবং প্রতি পদক্ষেপে বিশ্লেষণ, যুক্তি তর্ক ও প্রমাণপঞ্জির ওপর অবস্থান করে[৩৫]।

চিন্তা উদ্রেককারী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা হচ্ছে প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থের পরবর্তী বৈশিষ্ট্য। কুরআন মজিদে অন্ততপক্ষে একহাজার দু'শ প্রশ্ন রয়েছে। অনেক উদ্দেশ্যেই এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যেমন- কোন ভাব, ধারণা, মূল্যবোধ বা বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে। বাতিলকরণ : কোন ভাব, ধারণা বা বিশ্বাসে মনোযোগ আকর্ষণ ও উপলব্ধির পরিবর্তন হচ্ছে অন্যান্য উদ্দেশ্যের কয়েকটি।

যদি আমরা হিসাব করি যে, প্রকাশিত কুরআন মজিদের কপিসমূহের গড়ে ছয়শ' পৃষ্ঠা করে রয়েছে, তার মানে প্রতি এক পৃষ্ঠায় রয়েছে দুটি করে প্রশ্ন।

আমরা যদি সুন্নাহর বিষয়টি পরীক্ষা করি তবে আমরা একই অবস্থা দেখতে পাব। অনেক হাদিসেই নবি সা. চিন্তা উদ্রেককারী প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন।

একটি ঘটনায় নবি সা. তাঁর সাহাবিদেরকে নিম্নের প্রশ্নটি করেন : তোমরা কাকে নিঃস্ব মনে করো? তাঁরা উত্তরে বলেন, সেই ব্যক্তিকে যার কোনো দিরহাম বা দিনার নেই[৩৬]। তখন নবি সা. বললেন, প্রকৃতপক্ষে নিঃস্ব ঐ ব্যক্তি যে কিয়ামতের দিনে প্রচুর নেক আমল নিয়ে হাজির হবে, কিন্তু সেই সাথে তার আমলনামা পূর্ণ থাকবে গীবত, চোগলখুরী, অপবাদ দেওয়া, হত্যা ইত্যাদির মতো অনেক পাপ কাজ দ্বারা।

---

৩৪ মুহাম্মদ আসাদ যুক্তি ও কার্যকারণবাদ (হেতুবাদ)-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। যুক্তির বিপরীতে হেতুবাদে নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ নেই, তবে তা আন্দাজ অনুমানের ক্ষেত্রে উল্লম্ফন ঘটায়; এটি বিশুদ্ধ যুক্তির মতো ধারণক্ষম ও বিচ্ছিন্ন নয়, বরং চরম বিষয়ভিত্তিক ও অনুভূতিপ্রবণ। ইসলাম এট্ দি ক্রসরোডস্; পৃষ্ঠা- ৯২।

৩৫ আল-আলওয়ানী, তৃহা : ইজতিহাদ, (হার্নডন : আই আই আইটি, ১৯৯৩) পৃষ্ঠা ৪-৫।

৩৬ সেই মুদ্রা যা সেসময় প্রচলিত ছিল।

www.pathagar.com

এমতাবস্থায় তার ভালো কাজগুলো তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে, তারপরও যদি বণ্টন পূর্ণ না হয় তাহলে যাদেরকে সে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল তাদের খারাপ কাজের বোঝা তার ওপর চাপানো হবে। পরিণামে, তাকে নিক্ষেপ করা হবে জাহান্নামের আগুনে।

নবি সা. ও এক তরুণের মধ্যকার কথোপকথনও হাদিসে রয়েছে[৩৭]। তরুণটি নবি সা.-এর নিকট আবেদন করছে, হে আল্লাহর নবি, আমাকে ব্যভিচারের অনুমতি দিন। সাহাবিগণ রা. অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন : পৃথিবীতে কে এই লোক যে এরকম একটা অবৈধ কাজের অনুমতি চায়?

নবি সা. তাঁর সাহাবিদেরকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করতে এবং বিষয়টি তাঁর ওপর ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়ে লোকটিকে তাঁর আরো কাছে আসতে বললেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি এটা তোমার মায়ের সাথে করতে পছন্দ করো? লোকটি জোরের সাথে নেতিবাচক উত্তর দিল, ওহ্ না, হে আল্লাহর নবি।

নবি সা. ব্যাখ্যা করে তাকে বললেন, অন্যেরাও তাদের মায়ের সাথে এটা করা পছন্দ করবে না। কোনো প্রকার বিলম্ব না করে নবি সা. তাঁর অনুসন্ধানে এগিয়ে গেলেন : তুমি কি তোমার বোনের সাথে এটা করা পছন্দ করো? একইভাবে দৃঢ়তার সাথে উত্তর এলো, না, না, হে আল্লাহর নবি। তুমি কি তোমার খালা-ফুফুর সাথে এটা করতে চাও? কাম্য যুক্তিপূর্ণ উত্তরই চলতে থাকল, না, না, হে আল্লাহর নবি।

পরিশেষে মুহাম্মদ হযরত সা. লোকটির কাঁধে হাত রাখলেন -তার প্রতি অধিক যত্নবান এমন চিহ্নস্বরূপ- এবং আবেদনপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, 'হে আল্লাহ তায়ালা! তার পাপ ক্ষমা করে দিন, তার অন্তরকে পরিশুদ্ধ করুন এবং ব্যভিচার হতে তাকে দূরে রাখুন'। এমন তথ্য পাওয়া যায় যে, ঐ তরুণকে কখনো এমন কাজের চিন্তা করতেও দেখা যায়নি।

সাম্প্রতিক সময়ে ইসলামি প্রেক্ষাপটে সৃজনশীল চিন্তাপদ্ধতির ভূমিকা হিসেবে যুহাইর মানসুর আল-মিজিয়াদি লিখিত একটি বই পাওয়া যায়। গ্রন্থকারের যুক্তিতে[৩৮] যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা চিন্তা করতে কুরআনের অপূর্ব পদ্ধতি ব্যবহার

---

৩৭ মুসনাদে আহমদ ৫/২৫৬, ২৫৭।

৩৮ মুকাদিমা ফি মানহাজ আল-ইবদা : রোআইইয়াহ ইসলামিয়্যাহ, দারু-আল-ওয়াফা, আল-মানসুরাহ ১৯৯৩, পৃষ্ঠা- ৩১-৬৪।

www.pathagar.com

করব ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা আল্লাহ তায়ালার ধনাগার বের করতে বা আবিষ্কার করতে পারব না, যা সর্বশক্তিমান এই মহাবিশ্বে সৃষ্টি করেছেন। তিনি বলেন, মানুষের বিভিন্ন অনুভূতি দ্বারা গ্রহণের জন্য ইসলাম কতকগুলো অভিনব পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করেছে।

দৃষ্টির অনুভূতি সম্পর্কে :

১. আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টিকে সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ ও অবলোকন করা।

২. আল-কুরআনের হিদায়াত অর্জনের জন্য আমাদের দৃষ্টি ব্যবহার করা।

শ্রবণ অনুভূতির ক্ষেত্রে :

১. আল কুরআনের আয়াতসমূহ মনোযোগের/সতর্কতার সাথে শোনা।

২. যা উপকারী ও উত্তম তা শোনা আল-কূলু আল-হাসান।

৩. খারাপ কথা যেমন- পরনিন্দা, অপবাদ... ইত্যাদি এড়িয়ে চলা বা না শোনা।

শ্রবণকালে সত্য ও সঠিক খুঁজতে ও সতর্ক হতে অন্যের দ্বারা বোকা বনে যাওয়া বা কুপরিচালিত হওয়া যাবে না। তিনি তিনটি এলাকা চিহ্নিত করেছেন, যার ওপর মানুষকে চিন্তাভাবনা করতে হবে : মানবজীবন, মহাবিশ্ব এবং পরকাল।

চিন্তা করতে হবে ইসলামি বিশ্বদর্শনের সাথে সঙ্গতি রেখে।

ইসলামে চিন্তার লক্ষ্য হচ্ছে ইতকান বা পরিপূর্ণতা এবং ইহসান উৎকর্ষে পৌছানোর জন্য অনুগত হওয়া।

মানব চিন্তায় মুসলিম পণ্ডিতদের অবদান বিস্তৃতভাবে বর্ণনার পর[৩৯] গ্রন্থকার সংক্ষেপে তার মতে ইসলামি সৃজনশীল পদ্ধতি-এর শর্তাদি আলোচনা করেছেন, যেখানে তিনি নিম্নোক্ত ছ'টি শর্ত উল্লেখ করেছেন[৪০]।

১. ইসলামি আইন (শরিয়াহ) দ্বারা লক্ষ্য নির্ধারিত।

২. সৃজনশীলতা ইসলামি আইনের সাথে (শরিয়াহ) বিরোধপূর্ণ হবে না।

---

৩৯ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৩০-২৯৯।

৪০ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩০১-৩০৭।

www.pathagar.com

৩. সৃজনশীলতা আমাদের স্রষ্টা সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানের দিকে চালিত করবে।

৪. বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পথে চালিত করে এমন কোনো কিছুতেই সৃজনশীলতা থাকতে পারে, যা পর্যায়ক্রমে অধিকতর সামাজিক উন্নতির দিকে নিয়ে যাবে।

৫. এমন সবকিছুতেই সৃজনশীলতা থাকতে পারে যা মুসলিমদের শক্তি বৃদ্ধি করে।

৬. এমন যে কোন কিছুতেই থাকতে পারে যা ইসলামের বাণীর স্পষ্টতাকে বাড়িয়ে দেয় এবং সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হওয়ার কারণ হয়ে ওঠে।

এই শর্তগুলো খুবই সংক্ষিপ্ত এবং প্রকৃতিগত ভাবে তাত্ত্বিক। এগুলোর ওপর আরো অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন প্রয়োজন। সেই সাথে প্রয়োগ ও বাস্তব দৃষ্টান্তও প্রয়োজন। নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহের সাহায্যে সৃজনশীলতা ও শরিয়াতের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা যায় :

প্রথমত, প্রকৃত চিন্তাধারার উন্নয়নে শরিয়াহ হচ্ছে অন্যতম প্রাথমিক প্রেরণাদায়ক শক্তি।

দ্বিতীয়ত, পৃথিবীব্যাপী মুসলিমদেরকে একত্রীকরণে শরিয়াহ হচ্ছে একীভূতকরণ শক্তি বা বন্ড। সেই সাথে বিপরীতধর্মী ভাব, উদ্ভাবন, সমাধান, আবিষ্কার ইত্যাদিকে সংমিশ্রিত করে। এভাবে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো ভাবধারা, আবিষ্কার, সমাধান ইত্যাদি শরিয়াতের কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে ততক্ষণ তা গৃহীত ও সমর্থিত হবে।

তৃতীয়ত, সৃজনশীল ব্যক্তিকে তার সৃজনশীল প্রয়াস স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে চালনার ক্ষেত্রে শরিয়াহ মানসিক-নৈতিক সাহায্য প্রদান করে।

চতুর্থত, শরিয়াহ স্বাস্থ্যকর, নৈতিকভাবে-ন্যায়সম্মত পরিবেশের কাঠামো সরবরাহ করে বুদ্ধিবৃত্তির যথার্থ ও পরিপূর্ণ বিকাশ পথে সকল বাধা দূর করার মাধ্যমে[৪১]।

ওপরের আলোকে, সৃজনশীলতার ইসলামি ধারণার কতকগুলো বৈশিষ্ট্যে উপনীত হওয়া যায়। সর্বপ্রথম, সৃজনশীলতা হচ্ছে বহুমুখী প্রকৃতির; দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়গুলো এর অন্তর্ভুক্ত। দ্বিতীয়ত, যেহেতু সৃজনশীলতা প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের ভূমিকার সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত, সেহেতু একে

---

৪১ লোয়েফহোলজ, ওউয়িদা : Creativity in Islamic Thought, UIAM, Master' sthesis, Nov. 1999 PP. 113-117.

www.pathagar.com

দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা, তাক্ওয়া, বিনয় ও কৃতজ্ঞতার ধারণা হতে পৃথক করা যাবে না। তৃতীয়ত, বাস্তববাদিতা ও কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার পাশাপাশি, সৃজনশীল আবিষ্কার ও উদ্ভাবনসমূহে মানুষের আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলের প্রতিফলন ঘটতে হবে এবং অবশ্যই তার মধ্যে উপযোগমুখী কার্যকলাপ থাকবে না। চতুর্থত, সৃজনশীলতা ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিষয় হওয়া উচিত নয়, বরং সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও চাহিদাই বিবেচিত হওয়া বিধেয়। সৃজনশীলতার ইসলামি ধারণার পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পুরস্কারের বিষয়। পবিত্র কুরআন অনুযায়ী, সকল মানুষকে তাদের উদ্দেশ্য ও প্রয়াসের ভিত্তিতে বিচার করা হবে। যারা উত্তম কাজ করে তারা বিশাল পুরস্কারে ভূষিত হবে, পাশাপাশি যারা মন্দ ভাবধারা ও তা সৃষ্টির কাজে জড়িত, তারা তদনুযায়ী শাস্তি প্রাপ্ত হবে[৪২]।

তাফাক্কুর : ইজতিহাদের প্রধান উপাদান[৪৩]

মূল শব্দ জাহাদা হতে ইজতিহাদ শব্দটি উদ্ভূত। এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে কোনো কাজে কঠোর সংগ্রাম বা আত্ম-প্রচেষ্টা।

ইজতিহাদ মূলত বৌদ্ধিক প্রয়াস সম্বলিত বিষয়।

ইজতিহাদ বলতে আইনবিদের দ্বারা তার সকল মেধার প্রয়োগকে বুঝিয়ে থাকে যা শরিয়াতের উৎস হতে বিধি বহির্গত করা, বা এসব বিধি প্রয়োগ এবং বিশেষ বিষয়ে কার্যকর করতে ব্যবহার করা হয়[৪৪]।

অতএব, বিধি বের করে আনা বা শরিয়াতের বিধি কার্যকর করা *তাফাক্কুর* ছাড়া সম্ভব নয়।

ইসলাম একাধিক অভিমত এবং মতামতের পার্থক্যকে উৎসাহিত করে থাকে। এই শর্তে যে, সেগুলোকে কুরআন ও সুন্নাহ'র শক্ত যুক্তি, সবল ও বিশুদ্ধ সাক্ষ্য প্রমাণভিত্তিক এবং গ্রহণযোগ্য উত্তম কারণ দ্বারা সমর্থিত হতে হবে।

জীবনের অন্যতম বিরাট এক ঘটনায় নবি সা. তাঁর সাহাবিগণকে নির্দেশ দেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও আখিরাতে বিশ্বাস রাখে সে যেন বনু কুরাইযায় না পৌঁছায়

---

৪২ প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা- ১১৭-১২৩।

৪৩ এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে ইজতিহাদ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করা হবে।

৪৪ কামালী, মোহাম্মদ হাশিম : Principles of Islamic Jurisprudence ইলাহমিয়া পাবলিশার্স কে. এল. ১৯৯৯ পৃষ্ঠা ৩৬৭।

www.pathagar.com

আসরের সালাত আদায় না করে। বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, সেখানে পৌঁছাবার পূর্বে পথে থাকতেই ঐ সালাতের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়ে যায়। এ অবস্থায় তাঁরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়েন, একদল ওয়াক্ত মোতাবেক আসর সালাত পড়ার সিদ্ধান্ত নেন রসুল সা.-এর নির্দেশকে একটা পথ হিসেবে ব্যাখ্যা করে যাতে তাদেরকে তাড়াতাড়ি করতে বলা হয়। অন্য দল উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করেন এবং প্রদত্ত নির্দেশের প্রতি একাত্ম হয়ে সূর্যাস্তের পর 'আসর সালাত আদায় করেন। মদিনায় প্রত্যাবর্তনের পর ঘটনা তুলে ধরার পর মহানবি সা. উভয় অভিমতই অনুমোদন করেন। এই ঘটনাকে মুসলিম পণ্ডিতগণ ইজতিহাদ করার পক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

অন্য ঘটনা হচ্ছে মু'য়ায বিন জাবাল রা. সংক্রান্ত হাদিস যখন তিনি নবি সা. কর্তৃক ইয়েমেনে প্রেরিত হন। নবি সা. মু'য়ায রা.-কে জিজ্ঞাসা করেন, কোনো সমস্যা দেখা দিলে তুমি কি করবে? উত্তরে মু'য়ায বললেন, আমি এটাকে আল্লাহ তায়ালার কিতাবের হাওয়ালা করব। নবি সা. পুনরায় মুয়াযকে জিজ্ঞাসা করলেন, যদি আল্লাহ তায়ালার কিতাবে এর উল্লেখ না থাকে তাহলে? মু'য়ায রা. উত্তর দিলেন, তাহলে আমি তা আল্লাহর রসুলের সা. সুন্নাতে খুঁজব। তৃতীয়বার রসুল সা. জিজ্ঞাসা করলেন, যদি এতেও না পাও তাহলে তুমি কি করবে? মু'য়ায দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিলেন, তখন আমি ইজতিহাদ করব।

মু'য়ায রা. এর উত্তরে নবি সা. এতই খুশী হলেন যে তিনি তাঁর শেষ বক্তব্য 'ইজতিহাদ করা' অনুমোদন করলেন[৪৫]।

ইজতিহাদের তাৎপর্য হচ্ছে এমন : এটা আল্লাহ তায়ালার বাণীর ব্যাখ্যা এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের পরিবর্তনশীল অবস্থার সাথে এর আশা-আকাঙ্ক্ষার সংযোগ ঘটিয়ে ন্যায়, সমস্যার সমাধান এবং সত্যে উপনীত হওয়ার প্রধান উপকরণ হিসেবে চলমান থাকে[৪৬]।

অন্যভাবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে, কেউ বলতে পারেন : ইসলামের গৃহীত বিচারিত উৎসসমূহ সকল সময় ও স্থানের জন্য প্রযোজ্য। একথা বিবেচনায় রেখে ইজতিহাদকে একটি সৃজনশীল অথচ শৃঙ্খলাবদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়াস বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। মুসলিম সমাজের সংকোচন-প্রসারণশীল অবস্থা দ্বারা আরোপিত

---

৪৫ এই হাদিসটির বিশুদ্ধতা নিয়ে মুহাদ্দিসগণের মধ্যে মতোবিরোধ রয়েছে।

৪৬ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৬৬।

www.pathagar.com

চলকগুলো বিবেচনায় রেখে ঐসব উৎস হতে আইনসঙ্গত বিধি আহরণই এই প্রয়াসের লক্ষ্য[৪৭]।

ইজতিহাদের পরিস্থিতির উন্নয়নের জন্য ইসলামি চিন্তাধারায় মাকাসিদ (উদ্দিষ্ট) (Maqasid)-এর ধারণার প্রচলন করা হয়।

মোটের ওপর, শরিয়াহ সামগ্রিকভাবে পাঁচটি প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ প্রাথমিকভাবে সুরক্ষা ও উন্নয়নের চেষ্টা করে : ইমান, জীবন, বুদ্ধিমত্তা, বংশধারা বা প্রজন্ম ও সম্পত্তি। শরিয়াহ তাদের সংরক্ষণ ও অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপকে স্বীকৃতি দান করে[৪৮]।

সাধারণভাবে শরিয়াহকে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের কল্যাণে গুণবাহী গণ্য করা হয়, এসব কল্যাণ রক্ষায় এর আইনসমূহকে এভাবেই সাজান হয় যা পৃথিবীতে মানব জীবনের অবস্থার উন্নয়ন ও পূর্ণতায় সহায়ক হিসেবে বিবেচিত[৪৯]।

পরবর্তীকালে কিছু সংখ্যক প্রখ্যাত পণ্ডিত *মাকাসিদ*-এর তত্ত্ব ও বিজ্ঞানের উন্নয়নে অবদান রাখেন। আল-শাতিবী *মাকাসিদ* বিজ্ঞানের জ্ঞানকে মুজতাহিদের স্তরে উন্নীত হওয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে সমর্থন ও গুরুত্ব প্রদান করেন।

একজন সমকালীন পণ্ডিত, ইবনে আশূর, জোর দিয়ে বলেন যে, *মাকাসিদ* বিজ্ঞানের জ্ঞানে ইজতিহাদের সকল প্রকার প্রকাশের জন্য অপরিহার্য[৫০]।

যেহেতু শরিয়াহর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে কল্যাণের বৃদ্ধি সাধন এবং অকল্যাণ হ্রাস বা উচ্ছেদকরণ, সেহেতু নতুন উপ-ধারণা বিকাশ লাভ করেছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে অগ্রাধিকার প্রদান (আউলায়িআত), বিবদমান স্বার্থের মধ্যে অগ্রাধিকার নিশ্চিতকরণ (আল-তারাজিহ্) এবং কল্যাণ ও ক্ষতির পরিমাপ করা (মুওয়াযানাহ)।

---

[৪৭] আল-আলওয়ানী ত্বা-হা জাবির : Ijtihad, IIIT/Herndon, Va. 1993, পৃষ্ঠা-৮১ ইকবাল যুক্তি দেখান যে, আইনের ঘরানাগুলো ইজতিহাদের তিনটি মাত্রাকে স্বীকৃতি দেয় : (১) আইন প্রণয়নে কর্তৃত্ব যা ঘরানার প্রতিষ্ঠাতাদের সাথে বাস্তবে সীমাবদ্ধ; (২) কোন বিশেষ ঘরানার সীমারেখায় থেকে আপেক্ষিক কর্তৃত্ব প্রয়োগ এবং (৩) প্রতিষ্ঠাতাদের দ্বারা অস্থিরীকৃত বিশেষ মামলায় প্রযোজ্য আইন নির্ধারণের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিশেষ কর্তৃত্ব। (The Reconstruction of Religious thought in Islam, P-148)। ড. ত্ব-হা ইজতিহাদের তিনটি নতুন প্রবণতা খুঁজে পেয়েছেন, পৃষ্ঠা ২০ ও ২১। আমার বিনীত মতো হচ্ছে, এসকল প্রবণতার বিশ্লেষণ, মান নির্ধারণ, পুনঃপরীক্ষণ ও সতর্ক মূল্যায়ন প্রয়োজন।

[৪৮] কামালী, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৯৭।

[৪৯] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩৯৪।

[৫০] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪০৫।

www.pathagar.com

উপরে বর্ণিত ধারণাসমূহের নিম্নরূপ কিছু সাধারণ রীতি রয়েছে :

- কল্যাণ লাভের চেয়ে ক্ষতি এড়ানই অধিক কাম্য।
- একই পর্যায়ের ভিন্ন ক্ষতির দ্বারা কোনো ক্ষতি দূর করা যায় না, উচ্চতর হতে হয়।
- ব্যক্তিস্বার্থের ওপর সাধারণের স্বার্থ প্রাধান্য পায়।
- সাধারণ জনগণের অকল্যাণ এড়ান/প্রতিরোধে ব্যক্তির অকল্যাণ গ্রহণযোগ্য।
- প্রয়োজন নিষিদ্ধকে সমর্থন করে।
- একটি বৃহত্তর কল্যাণের জন্য আমরা ক্ষুদ্রতর কল্যাণ পরিত্যাগ করাকে সহ্য বা সমর্থন করতে পারি।
- একটি বড় ক্ষতিকে এড়াতে আমরা ছোট ক্ষতিকে সহ্য বা সমর্থন করতে পারি।
- বৃহত্তর কল্যাণ প্রাপ্তির আশায় আমরা একটি ক্ষুদ্রতর ক্ষতি সহ্য বা সমর্থন করতে পারি।
- আমরা বড় ক্ষতি এড়াতে ক্ষুদ্র লাভকে ছেড়ে দিতে পারি।

এ মূল্যবান রীতিগুলোকে বর্তমানে উম্মাহর সামনে উদ্ভূত সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ উত্তরণে খুবই সহায়ক বিবেচিত হতে পারে। অনুমতিযোগ্য ও অনুমতি অযোগ্য সৃজনশীল ভাবধারা ও প্রয়োগের মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষেত্রে উপাদান হিসেবে এগুলো ব্যবহারও করা যেতে পারে।

উপসংহার

এই বিশ্লেষণে *তাফাক্কুর* এর ধারণার বিস্তারিত ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপনের দায়িত্ব পালন করা হয়েছে। এই ধারণার প্রধান চিহ্ন তুলে ধরা হয়েছে এবং এসবের সামাজিক গূঢ়ার্থ সামনে রাখা হয়েছে। এ প্রবন্ধে উপস্থাপিত আলোচনা আমাদের এই উপসংহারে নিয়ে যায় যে, কুরআনী প্রেক্ষাপটে তাফাক্কুরের ধারণা সৃজনশীল চিন্তা অথবা জীবনের সর্বত্র সভ্যতার অগ্রগতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গণ্য হতে পারে। এটা হলো কেমনভাবে আমাদের নতুন প্রজন্ম তাফাক্কুরের ধারণা দেখে এবং এর বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিক উপযোগিতাকে উপলব্ধি করে।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল-কুরআনে চিন্তার স্টাইল

ধারণক্ষম মনোবিজ্ঞান (Cognitive Psychology) সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রসমূহে চিন্তার ধরন বা স্টাইল বর্ধিত হারে প্রসিদ্ধ হয়ে উঠছে। ষাটের দশকের শেষ দিকে এবং সত্তরের দশকের প্রথম দিকে নতুন চিন্তার ধরনের আবির্ভাব ঘটতে দেখা যায়, যা সম্প্রতি চিন্তার ধরনে চল্লিশের সংখ্যার সীমা ছাড়িয়ে গেছে, এর মধ্যে কিছু হচ্ছে তার পূর্ববর্তীগুলোর অধীন-দক্ষতা। এই চিন্তার ধরনসমূহের মধ্যে সৃজনশীল, সমালোচনামূলক, আবেগময়, উদ্দেশ্যমূলক, ইতিবাচক, দৃষ্টিগ্রাহ্য, সিদ্ধান্তমূলক, রূপকাশ্রিত চিন্তা নামাঙ্কিত করার মতো কয়েকটি মাত্র রয়েছে।

যেহেতু কুরআন মজিদ আল্লাহ তায়ালার বাণী, যা তাঁর শেষ নবি মুহাম্মদ (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) এর উপর প্রত্যাদিষ্ট হয়েছিল সমুদয় মানব জাতিকে জানাতে ও যোগাযোগ করতে এবং যেহেতু মানব মন এবং এর কর্ম সম্পাদনের সামর্থ্য আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই এটা দেখে যে, কুরআন বিভিন্ন প্রকার চিন্তার স্টাইল ব্যবহার করেছে। প্রতিটি স্টাইল বা ধরন নির্ধারিত লক্ষ্য পূরণে সতর্কতা ও কার্যকরতার সাথে ব্যবহার করা হয়েছে। বাণীকে ভালোভাবে বোঝা ও পৃথিবীতে কল্যাণময় জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে চিন্তার এসব ধরনকে মানব-উপলব্ধির পরিধি বিস্তৃততর করতে ব্যবহার করা হয়েছে। লোকদের বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রাধিকারের ভিন্নতাকে সামনে রেখে এগুলোকে বাণী পৌছাবার উপকরণ হিসেবেও গ্রহণ করা যেতে পারে।

এসব চিন্তার স্টাইলের প্রতি মনোযোগের অভাবের অন্যতম প্রধান কারণ হতে পারে ইসলামি চিন্তার জগতে যৌক্তিক ও জটিল চিন্তার স্টাইল (উসূল আল-ফিক্‌হ, আখলাক ও তাওহিদ), ৪র্থ শতাব্দী পর্যন্ত (হিজরি)।

চিন্তার শৈলীকে প্রকাশভঙ্গি গণ্য করাও একটি সহায়ক উপাদান, যদিও এই দুটি বিষয়ের মধ্যে শক্তিশালী সম্পর্ক বিদ্যমান।

কুরআনে ব্যবহৃত কিছু চিন্তার শৈলী নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

www.pathagar.com

১. কৌতুহলী চিন্তাশৈলী (Inquisitive Thinking Style)

শিক্ষণ-শিখন ক্ষেত্রে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা অত্যন্ত ফলপ্রসু উপায়ের একটি। কারণ এটি মস্তিষ্কের স্নায়ুজালে নতুন সংযোগের উন্নয়ন ঘটায়, যা পরবর্তীতে নতুন ভাবধারা ও ধারণার পথে চালিত করে।

আল-কুরআনে চিন্তা উদ্রেককারী প্রশ্নসমূহ মানুষকে চিন্তা করতে উদ্দীপ্ত করার একটি সাধারণ রীতি বা প্রপঞ্চ। আল-কুরআনে এক হাজার দু'শরও বেশি প্রশ্ন দেখা যায়। এই প্রশ্নগুলো বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। কোনো কোনো সময় কুরআন সরাসরি এসব প্রশ্নের উত্তর দেয়নি কারণ তা আমাদের কাছে স্পষ্ট। এ প্রপঞ্চটিকে বাগ্মিতাপূর্ণ প্রশ্ন বলা হয় এবং কখনো উত্তরও দেওয়া হয় সমস্যা বা ঘটনাকে স্পষ্ট করার জন্য।

এর দ্বারা এটা নির্দেশিত হয় যে, ইসলামে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা অতি গুরুত্বপূর্ণ। অন্য কথায়, ইসলাম জ্ঞান অর্জনের জন্য প্রশ্ন করাকে উৎসাহিত করে। কুরআনে উত্থাপিত প্রশ্নসমূহকে মনোযোগের সাথে বিবেচনা করে পাঠক এ ব্যাপারে ভালো বোঝসমঝ লাভ করতে পারে। এর অর্থ হচ্ছে কেবলমাত্র যারা সঠিক পদ্ধতিতে কুরআান পাঠ করে তারাই এই কৌতুহলী চিন্তাকে আত্মস্থ করতে পারবে।

অত্যন্ত জ্ঞানী সাহাবি ইব্ন আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কিভাবে তিনি স্বল্প সময়ের মধ্যে জ্ঞানের বিশালতর ক্ষেত্রকে আয়ত্ত করতে পেরেছেন। তিনি জবাবে বলেন, একটি কৌতুহলী জিহ্বা এবং একটি সমঝদার হৃদয় দিয়ে।

এটা পরিষ্কারভাবে ও সহজেই লক্ষ্য করা যায় যে, আল-কুরআনে যেসব প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে তা এদের উত্তরের ভিত্তিতে তিন প্রকার : প্রথমটি, এমন প্রশ্ন যার উত্তর দেওয়া হয়েছে নতুন তথ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয়টি এমন যেখানে উত্তর স্পষ্ট এবং সন্দেহাতীত প্রত্যেক পাঠকের কাছে, এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হচ্ছে কোনো সত্যকে স্মরণ করানো বা দৃঢ় করা। তৃতীয় প্রকারটি এমন যাতে উত্তর দেওয়া হয়নি। কারণ এক্ষেত্রে চিন্তার ও উত্তরে পৌছানোর জন্য তার প্রতিফলন প্রয়োজন রয়েছে।

যেসব বিভিন্ন উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে আল-কুরআনে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছে তার দৃষ্টান্ত নিম্নে দেওয়া হলো।

ক. বিশ্বাস/ইমানকে দৃঢ় করা, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

আমি কি তোমাদের প্রভু নই? (সুরা আ'রাফ ৭ : ১৭২)

www.pathagar.com

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কোনো স্রষ্টা আছে কি, যে তোমাদেরকে আকাশমণ্ডলী ও যমীন হতে রিয্ক দান করে? (সুরা ফাতির ৩৫: ৩)

পুনরায় বলা যায়, এই আয়াতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা অবিশ্বাসীদেরকে প্রশ্ন করেছেন তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ আছে কি না যে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সকল সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে? এটাই তাঁর একত্বকে দৃঢ় ও নিশ্চিত করার পদ্ধতি।

খ. নিশ্চয়তা সৃষ্টি করা, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> তুমি কি তাকে দেখনি যে ইবরাহীমের সাথে তার প্রভু সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়েছিল, কারণ আল্লাহ তায়ালা তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন? যখন ইবরাহীম তাকে বলল, আমার প্রভু তিনি, যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই। ইবরাহীম বলল, বটে! আল্লাহ তায়ালা সূর্যকে পূর্ব দিক হতে উঠান, তুমি একে পশ্চিম দিক হতে উদয় করাও। অতঃপর অবিশ্বাসীটি হতবুদ্ধি হয়ে গেল (সুরা বাকারা ২ : ২৫৮)।

গ. বৈরী মতামত বাতিল করে দেয়া, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> তোমরা কিরূপে আল্লাহ তায়ালাকে অবিশ্বাস করো অথচ তোমরা প্রাণহীন ছিলে, তিনি তোমাদেরকে জীবন দিয়েছেন? আবার তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় জীবিত করবেন (কিয়ামতের দিন), এবং অবশেষে তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে (সুরা বাকারা ২ : ২৮)।
>
> এই একই বক্তব্য রয়েছে সুরা ইউনুস ১০ : ৫৯ ও আল-সাফফাত এর ৯৫ আয়াতে।

ঘ. সীমালংঘনকারীদের ভৎর্সনা করা, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> তোমাদের নিকট কি কোনো সতর্ককারী আসেনি? (সুরা মুলক ৬৭ : ৮)
>
> একই বক্তব্য রয়েছে আল-নিসা'র ৯৭ আয়াতে।

www.pathagar.com

ঙ. আল্লাহ তায়ালার মহানত্ব ও মহিমা প্রকাশ, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে (সুরা বাকারা ২ : ২৫৫)?

চ. শেষ বিচার দিবসে দুঃখে অবিশ্বাসীদের কান্না ও আফসোস দেখানো, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> এবং উপস্থিত করা হবে আমলনামা, এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ রয়েছে তার কারণে অপরাধীদেরকে তুমি দেখবে আতংকগ্রস্ত। তারা বলবে, হায় দুর্ভাগ্য আমাদের! এ কেমন গ্রন্থ (আমলনামা)! এতো ছোট বড় কিছুই বাদ দেয় না; বরং তা সমস্ত হিসাব রেখেছে (সুরা কাহাফ ১৮ : ৪৯)।

ছ. অবিশ্বাসীদেরকে তাদের মিথ্যা দাবি বিশ্বাস করানো, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> তোমাদের প্রভু কি তোমাদেরকে পুত্র সন্তানের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাঁর নিজের জন্য ফিরিশতাগণকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? তোমরা তো নিশ্চয়ই ভয়ানক কথা বলো (সুরা বনী ইসরাঈল ১৭ : ৪০)।

জ. মিথ্যা বিশ্বাস যা ধ্বংসে চালিত করে তা সম্বন্ধে সন্দেহ উত্থাপন, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> যিনি আনুগত্যের পথ নির্দেশ করেন তিনি আনুগত্যের অধিক হকদার, না যাকে পথ না দেখালে সঠিক পথ পায় না সে? (সুরা ইউনুস ১৩ : ৩৫)

এই আয়াতে পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা ঐসব মানুষকে প্রশ্ন করছেন যাদের আল্লাহ তায়ালাতে কোনো বিশ্বাস নেই, সতর্কভাবে চিন্তা করার জন্য যে, তারা সেই এক-কে মেনে চলবে যিনি তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন, নাকি তাকে যে পথ দেখাতে পারে না।

ঝ. প্রসন্নতা প্রার্থনা, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> আমাদের মধ্যে যারা নির্বোধ তাদের কৃতকর্মের জন্য কি তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে? (সুরা আ'রাফ ৭ : ১৫৫)

ঞ. অতীত ইতিহাস হতে শিক্ষা গ্রহণের জন্য মানবজাতিকে সাবধান করা, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

www.pathagar.com

> এরা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল? (সুরা ফাতির ৩৫ : ৪৪)

ট. নবি মুহাম্মদ সা.-কে সান্ত্বনা দান ও দুশ্চিন্তামুক্তকরণ, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> ওদের মধ্যে কেউ কেউ তোমার কথা শোনে, কিন্তু তুমি কি বধিরকে শোনাবে তারা না বোঝলেও? (সুরা ইউনুস ১০ : ৪২)

ঠ পাঠককে সতর্ককরণ, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> যারা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে না তারা কি দেখে না মেঘমালাকে, কিভাবে তা জলভারে স্ফীত হয়, লক্ষ্য করে না কিভাবে তারা সৃষ্ট হয়েছে? এবং আকাশের দিকে, কিভাবে তা উচ্চে তুলে ধরা হয়েছে? এবং পর্বতমালার প্রতি কিভাবে তা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত? এবং জমিন, কিভাবে তা বিস্তৃত?

আল্লাহ তায়ালা পাঠক বা শ্রোতার দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন মহাবিশ্বের সৃষ্টির প্রতি যা এর স্রষ্টার অস্তিত্বের নির্দেশক, যিনি কেবলমাত্র এক, যিনি ইবাদতের একমাত্র হকদার এবং আনুগত্যেরও। কুরআনের অন্য এক আয়াত এমনই ধরনের উদ্দেশ্যযুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলছেন,

> কিংবা তারা কি আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব অস্বীকার করে? তারা কি অনস্তিত্ব হতে নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টি করেছে অথবা তারা দৈবাৎ তাদের স্রষ্টা হয়ে বসেছে? (সুরা তূর ৫২ : ৩৫)

এখানে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে চ্যালেঞ্জ করছেন তাদের নিজ সৃষ্টি পর্যবেক্ষণে নিজেদের চিন্তাশক্তি ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে।

> আল্লাহ তায়ালা বলেন, তবে কি তারা (সত্যিকারভাবে) বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তায়ালার সাথে এমন কোনো শরীক রয়েছে যারা আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করেছে? (সুরা আর রা'দ ১৩ : ১৬)

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা অবিশ্বাসীদের নিকট সৃষ্টি এবং এর স্রষ্টার মধ্যে তুলনা দ্বারা যুক্তি পেশ করছেন, এটা দেখিয়ে যে উভয়ের মধ্যে রয়েছে দুস্তর ব্যবধান। তাছাড়া আল্লাহ তায়ালা ছাড়া সত্যিকারের এমন কোনো ইলাহ নেই যার সত্যিকার অর্থে সৃষ্টি করার ক্ষমতা রয়েছে, অর্থাৎ এমন কিছুর অস্তিত্ব দান করতে পারে যার কোনো অস্তিত্ব ছিল না।

www.pathagar.com

এসব আয়াত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নাযিল হয়। যারা প্রকৃত পদ্ধতিতে কুরআন পাঠ করে কেবল তারাই চিন্তার এই কৌতূহলপূর্ণ শৈলী আয়ত্ত করতে পারে। চিন্তার পদ্ধতির মাধ্যমে আত্ম-নির্দেশনার ক্ষেত্রে মুসলিমগণ অমুসলিমদের চেয়ে পৃথক। তাই, এই ধরনের চিন্তার ক্ষেত্রে মুসলিমের নিকট আল-কুরআন বাস্তবতার ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে[৫১]।

২. উদ্দেশ্যমূলক চিন্তাশৈলী (Objective Thinking Style)

উদ্দেশ্যমুখিনতার অর্থ হচ্ছে সাক্ষ্য প্রমাণ ভিত্তিক দাবি ও সিদ্ধান্ত/রায়, যা স্থিরনিশ্চয়তার ওপর প্রতিষ্ঠিত, সন্দেহের ওপর নয় অথবা পক্ষপাত এড়াবার জন্য আন্দাজ অনুমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, ব্যক্তিগত স্বার্থভিত্তিক নয় কিংবা রায় প্রদানের ক্ষেত্রে মতামত তৈরিতে হুজুগও নয়।

এখান থেকে কুরআনের উদ্দেশ্যমূলক চৈন্তাশৈলীকে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করা যায়।

ক. দাবি প্রমাণে সাক্ষ্য অন্বেষণ। এতদ্‌সম্পর্কিত আয়াতসমূহ নিম্নরূপ :

অ. আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> তোমরা যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো, তবে তোমাদের দাবির পক্ষে প্রমাণ উপস্থিত করো (সুরা বাকারা ২ : ১১১)।

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবি সা.-এর মাধ্যমে কাফিরদেরকে (ইহুদি) তাদের কিতাব হতে উপস্থাপিত বক্তব্যের পক্ষে প্রমাণ পেশ করতে বলেছেন।

আ. আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> তারা কি তাঁর পরিবর্তে ইবাদতের জন্য কাল্পনিক ইলাহ স্থির করেছে? বলো, হে নবি' তোমরা তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত করো যার দাবি তোমরা করছো। আমার সঙ্গে যারা আছে এটাই তাদের জন্য উপদেশ, যেমন- উপদেশ ছিল আমার পূর্বে আগতদের প্রতি (সুরা আম্বিয়া ২১ : ২৪)।

উল্লিখিত দুটি আয়াতে আল্লাহ তায়ালা প্রতিমাপূজকদেরকে তাদের দাবির পক্ষে প্রমাণ পেশ করতে বলছেন। যদি তারা সত্যবাদী হয়ে থাকে।

---

[৫১] কৌতূহল-উদ্দীপক চিন্তাশৈলী বিষয়ে অধিক অন্তর্দৃষ্টি অর্জনার্থে দেখুন : আতিয়্যাহ সেলিম : আল-সুয়ালা-ওয়া-আল-জাওয়াবু ফি আয়াত আল-কিতাব, মদিনা মুনাওয়ারা, দার-আল-তুরাথ, ১৪০৮/১৯৮৭।

www.pathagar.com

ই. আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কি অন্য কোনো ইলাহ আছে? বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ করো (সুরা নামল ২৭ : ৬৩-৬৪)।

ঈ. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন :

> প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে আমি একজন সাথী বের করে আনব এবং (মুশরিকদেরকে) বলব : তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত করো যার দাবি তোমরা করছিলে। তখন ওরা জানতে পারবে ইলাহ হওয়ার একমাত্র অধিকার সত্যিকারভাবে আল্লাহ তায়ালারই এবং তারা যে মিথ্যা (মিথ্যা ইলাহ) উদ্ভাবন করেছিল তা তাদের নিকট হতে অন্তর্নিহিত হবে (সুরা কাসাস ২৮ : ৭৫)।

খ. অনুমানে বিশ্বাস না করার জন্য আমাদেরকে হুঁশিয়ারি

আন্দাজ অনুমানে বিশ্বাস করা সম্বন্ধে আমাদেরকে সতর্ক করে অনেক আয়াত রয়েছে, তার মধ্যে কতকগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

অ. আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> ওদের অধিকাংশ অনুমানেরই অনুসরণ করে, সত্যের পরিবর্তে অনুমান কোনো বিকল্প নয় (সুরা ইউনুস ১০ : ৩৬)।

এই আয়াত হতে আমরা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, কিছু লোক তাদের অনুমানের অনুসরণ করে এই সত্যতা সত্ত্বেও যে, সত্যের মোকাবিলায় অনুমান কখনো দিক নির্দেশ করতে পারে না। অন্য কথায়, এই আয়াতের উদ্দেশ্য সেসব লোকদের নিন্দা করা যারা অনুমানকে তাদের জীবনে নির্দেশনা হিসেবে ব্যবহার করে।

আ. আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> তারা (যারা তাদের পূজারি) তো অনুমান ব্যতীত কিছুরই অনুসরণ করে না এবং তাদের নিজ প্রবৃত্তির, যদিও তাদের নিকট তাদের প্রতিপালকের পথ-নির্দেশ এসেছে (সুরা নাজম ৫৩ : ২৩)।

www.pathagar.com

ই. আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> সে ভাবত যে সে কখনো ফিরে যাবে না (আমাদের নিকট)। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ফিরে যাবে। তার মধ্যে যা ছিল তার সবই তার প্রতিপালক দেখেছেন (সুরা ইনশিকাক ৮৪ : ১৪-১৫)।

এ আয়াতে আমরা দেখতে পাই যে, যারা চিন্তাক্ষেত্রে অনুমানের পথ অনুসরণ করে তারা বিশ্বাস রাখে না যে, তাদেরকে আল্লাহ তায়ালার নিকট ফিরে যেতে হবে। এ কারণেই আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে নিন্দা জানাচ্ছেন যারা চিন্তাক্ষেত্রে অনুমানের ওপর নির্ভর করে।

গ. আল-হাওয়াকে নিন্দা করা বা আমাদেরকে সতর্ক করা যাতে আমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিগত স্বার্থ, সংস্কার এবং অন্যান্য ধরনের পক্ষপাত দ্বারা চালিত না হই, কারণ এসব মানবিয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই আল-হাওয়ার উপাদান রয়েছে

চিন্তাশৈলীর উদ্দেশ্যের এই দিক সম্বন্ধে আল-কুরআন হতে কতকগুলো আয়াত নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

অ. আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> তবে, এটা কি এমন নয় যে যখনই কোনো রসুল এমন কিছুসহ তোমাদের নিকট এসেছে যা তোমাদের মনঃপূত নয়, তখনই তোমরা ঔদ্ধত্য দেখিয়েছ এবং (তাদের) কতককে তোমরা অস্বীকার করেছ এবং (তাদের) কতককে হত্যা করেছ? (সুরা বাকারা ২ : ৮৭)

এই আয়াতে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, যাদের চিন্তাভাবনা তাদের কামনা-বাসনা দ্বারা প্রভাবিত তারা উদ্ধত ও মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে। তারা আল্লাহর নবিদের আ.-কে হত্যা করতে পারে। অন্য কথায়, এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে আমাদের মন্দ কামনা-বাসনার অনুসরণে সতর্ক করছেন।

আ. আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> তোমরা ন্যায়বিচার করতে কামনার অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা সত্যকে পাশ কাটিয়ে যাও কিংবা প্যাঁচাল কথা বলো, তবে জেনে রাখো তোমরা যা করো আল্লাহ তায়ালা তার সম্যক খবর রাখেন (সুরা নিসা ৪ : ১৩৫)।

www.pathagar.com

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে নিন্দা জানাচ্ছেন যারা সত্য হতে বিচ্যুত হওয়ার জন্য তাদের কামনা-বাসনার অনুসারী হয়। এ ধরনের চিন্তাশৈলী হতে যে জ্ঞান আমরা লাভ করি তা হলো আমরা প্রকাশ্য বা গুপ্ত যা কিছুই করি আল্লাহ তায়ালা সে সম্বন্ধে সম্যক অবহিত।

ই. আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> তুমি কি লক্ষ্য করেছ কখনও (ঐ জাতীয় লোককে) যে তার খেয়াল খুশিকে নিজের ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে এবং (তাই) আল্লাহ তায়ালা জেনেশুনে (যে তার মন সর্বপ্রকার দিক নির্দেশ হতে রুদ্ধ রেখেছে) তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং তার কানে ও হৃদয়ে মোহর করে দিয়েছেন? (সুরা জাছিয়া ৪৫ : ২৩)

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা আল-হাওয়া (খেয়ালখুশি) কে নিন্দা করছেন এবং এর দ্বারা আমাদেরকে কুপরিচালিত হতে নিষেধ করছেন। এই নিন্দাবাদ ঐ সীমারেখা পর্যন্ত প্রযোজ্য যাতে আল্লাহ তায়ালা পূর্ণ শক্তিসহকারে আল-হাওয়ার বিরুদ্ধাচরণের পরামর্শ দিয়েছেন। এটা হচ্ছে জান্নাতে প্রবেশের একটি পূর্বশর্ত।

ঘ. অন্ধ অনুসরণ ও অন্ধ গোঁড়ামিকে নিন্দাজ্ঞাপন এমনকি ইবাদতেও

অ. আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> এভাবে তোমাদের পূর্বে কোনো কাওমের কাছে যখনই কোনো সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখনই ওরা সমৃদ্ধিশালী হতে গিয়ে আত্মবিস্মৃত ও (আমলে) নিঃস্ব ব্যক্তিরা সর্বদাই বলেছে, দেখো, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং তাদেরই পদচিহ্ন আমরা অনুসরণ করি।
>
> (যখনই প্রত্যেক সতর্ককারী নবি) বলত, তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে পথে পেয়েছ, আমি যদি তোমাদেরকে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট পথনির্দেশ দিই তবুও কি তোমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে? (এর) উত্তরে তারা বলত, তোমরা (যা দাবি কর সত্য বলে) যে সংবাদসহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা (সত্য হলেও) প্রত্যাখ্যান করি (সুরা আয যুখরুফ ৪৩ : ২৩-২৪)।

www.pathagar.com

এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে তাদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে যারা আল্লাহ তায়ালার বাণীর পরিবর্তে তাদের পূর্বপুরুষদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে। এ আয়াত দুটির উদ্দেশ্য হচ্ছে গোঁড়া বা পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসারীদের পথনির্দেশ করা সেই বাণীর সাহায্যে যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসুলদের আ. মাধ্যমে প্রেরণ করেছেন।

আ. আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ তায়ালা যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে ও রসুলের দিকে এসো তারা জবাব দেয়, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যা বিশ্বাস করতে ও আমল করতে পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। কী! যদিও তাদের পূর্বপুরুষগণ কিছুই জানত না, এবং তারা সৎপথ প্রাপ্তও ছিল না, তথাপি? (সুরা মায়েদা ৫: ১০৪)

পুনরায় এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তাদের পূর্বপুরুষদেরকে অনুসরণ করতে সাবধান করছেন কারণ তারা তাঁর বাণী বা পথনির্দেশ সম্বন্ধে কিছুই জানত না। এই হচ্ছে এ আয়াতের উদ্দেশ্য।

ই. আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> যে দিন তাদের মুখমণ্ডল আগুনে ওলটপালট করা হবে, সেদিন তারা আক্ষেপ করে বলবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহ তায়ালাকে মানতাম এবং তাঁর রসুলকে মানতাম! তারা আরো বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরাতো আমাদের নেতা ও বড় লোকদের আনুগত্য করেছিলাম এবং ওরাই আমাদেরকে সত্য পথ হতে ধ্বংসের পথে চালিত করেছিল (সুরা আহযাব : ৬৬-৬৭)।

এ আয়াত ব্যাখ্যা করে শেষ বিচারের দিন ঐ লোকদের অবস্থা কেমন হবে যারা তাদেরকে আগুনে নিক্ষিপ্ত করার জন্য তাদের নেতাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করবে। তাদের নেতাদের প্রতি গোঁড়ামির এই হবে প্রতিফলন। এই আয়াতগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা তাই আমাদেরকে ঐসব লোকদের মতো হতে নিষেধ করছেন।

উল্লিখিত এসব আয়াত মানুষের সীমাবদ্ধতা নির্দেশ করে। ইসলামে নিষ্পাপ মানুষ কেবল নবিগণ, তাও অভিপ্রায় অনুযায়ী। এমন হওয়ার কারণ তাঁরা ওহি দ্বারা পরিচালিত হয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁদের কাজের সাথে সাথেই তাঁদের সংশোধন করেছেন।

www.pathagar.com

এসব উপাদান বিষয়ভিত্তিক চিন্তার দিকে চালিত করে যখন কুরআন চালিত করে উদ্দেশ্যমূলক চিন্তার দিকে, যেখানে চিন্তার সকল নেতিবাচক উপাদানকে বিনষ্ট করা হয়েছে।

৩ . ইতিবাচক চিন্তাশৈলী (Positive Thinking Style)

কুরআনে ইসলামের ইতিবাচক চিন্তাশৈলীর ব্যাপারে প্রচুর অবদান রয়েছে। এই শৈলীকে নিম্নবর্ণিত দৃষ্টিকোণে বিভক্ত করা যায় :

ক. আল্লাহ তায়ালার দয়া হতে নিরাশ না হওয়া

এ বিষয়ে কুরআনের আয়াতসমূহ নিম্নে দেওয়া হলো :

অ. আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> হে আমার পুত্রেরা! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তার সহোদরের খোঁজ করো এবং আল্লাহ তায়ালার জীবন প্রদায়ী আশিস হতে নিরাশ হয়ো না, নিশ্চয়ই সত্য অস্বীকারকারীগণ ব্যতীত কেউই আল্লাহ তায়ালার আশিস হতে নিরাশ হয় না (সুরা ইউসুফ ১২ : ৮৭)।

এ আয়াতের মধ্যে চিন্তার ইতিবাচক শৈলী রয়েছে। এখানে নবি ইয়াকুব আ. তাঁর ছেলেদেরকে আল্লাহ তায়ালার দয়া হতে নিরাশ না হওয়ার এবং সর্বদা ইতিবাচক হওয়ার শিক্ষা দিচ্ছেন, কারণ কেবলমাত্র যারা সত্যকে অস্বীকার করে তারাই আশা ছেড়ে দেয় আল্লাহ তায়ালার জীবনদানকারী অনুগ্রহ হতে।

আ. আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> বলো, হে আমার বান্দা (দাস) গণ! যারা তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ- আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন; কারণ তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (সুরা যুমার ৩৯ : ৫৩)।

এ আয়াত অনুযায়ী যারা নিজেদের ওপর অত্যাচার করে অনুতপ্ত আল্লাহ তায়ালা নিজে তাদেরকে ক্ষমা করবেন। এছাড়া, তিনি তাদের মনে তাঁর দয়া হতে নিরাশ না হওয়ার জন্য ইতিবাচক চিন্তাশৈলী নির্মাণ করছেন।

www.pathagar.com

ই. আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> (ইব্রাহীম) বিস্ময় ভরে বলে উঠল, যারা পথভ্রান্ত তারা ব্যতীত আর কেই বা রয়েছে যে তার প্রতিপালকের দয়া হতে নিরাশ হতে পারে (সুরা হিজর ১৫ : ৫৬)!

খ. আল্লাহ তায়ালার পথনির্দেশ এবং আমাদের প্রতি সাহায্যের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার প্রতি আশা ও বিশ্বাস থাকা

আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অবিশ্বাস করার ব্যাপারে সতর্ক করেন। ইতিবাচক চিন্তার এই দিক সম্পর্কে কিছু আয়াত রয়েছে।

অ. আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> যেখানে অন্যরা, যারা কেবল নিজেদের সম্বন্ধে ভাবছিল (কিভাবে নিজেদের রক্ষা করবে) এবং অন্ধের ন্যায় আল্লাহ তায়ালা সম্বন্ধে জাহিলী যুগের (কাফের) মূর্খদের ন্যায় অবাস্তব ধারণা করেছিল (সুরা আলে ইমরান ৩ : ১৫৪)।

এ আয়াতের ভাষ্য এই যে, কিছু লোক আছে যারা তাঁর সৃষ্টির ওপরে আল্লাহ তায়ালার দয়া সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা পোষণ করে, কাফেরদের মতো করে, যাদের আল্লাহ তায়ালার ওপর কোনো ইমান নেই। এ আয়াত আল্লাহ তায়ালার দয়া সম্বন্ধে আমাদের অন্তরে ইতিবাচক চিন্তা পোষণের কথাও বলে।

আল্লাহ তায়ালার ওপর বিশ্বাস রাখা জীবনের একটি বিজয়। আল্লাহ তায়ালার প্রতি অবিশ্বাসী হওয়ার কারণে আমাদের নিজেদেরকেই অভিযুক্ত করা উচিত। আল্লাহ তায়ালার দয়া সম্বন্ধে উত্তম ধারণা পোষণ তাঁর সম্বন্ধে আমাদের মনে মজবুত আশারই সঞ্চার করে। এর সাথে একটি হাদিসে কুদসীর বর্ণনার সম্পর্ক পাওয়া যায় যাতে আল্লাহ তায়ালা সম্বন্ধে ধারণার কথা বলা হয়েছে।

গ. আল্লাহ তায়ালার ওপর নির্ভরতার (তাওয়াক্কুল) ধারণা

আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করার পর এই ধারণাটি ব্যবহার করতে হবে। এটা ইতিবাচক চিন্তাশৈলীসমূহের অন্যতম যা কেবল ইসলামেই পাওয়া যায়। চিন্তার এই দিকটি সম্বন্ধে কতকগুলো আয়াত উল্লেখ করা হলো।

www.pathagar.com

অ. আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> আর তোমরা যদি মুমিন হও তবে আল্লাহ তায়ালার উপর নির্ভর করো (সুরা মায়েদা ৫ : ২৩)।

এ আয়াত অনুযায়ী, কেবল তারাই আল্লাহ তায়ালার ওপর নির্ভর করে যাদের তাঁর ওপর সত্যিকার বিশ্বাস রয়েছে।

আ. আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> অতঃপর যখন তুমি কোনো কাজের সংকল্প করো তখন আল্লাহ তায়ালার ওপর নির্ভর করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওপর নির্ভরশীলদের ভালোবাসেন (সুর আলে ইমরান ৩ : ১৫৯)।

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে তাঁর ওপর নির্ভর করতে উদ্বুদ্ধ করছেন। কাজেই, মুসলিম হিসেবে আল্লাহ তায়ালার ওপর আমাদের নির্ভরতা থাকা উচিত। কারণ তাঁর ওপর নির্ভরশীলদের তিনি ভালোবাসেন।

ই. আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> এবং প্রত্যেকে যারা আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে, তিনি (সর্বদাই) পথ করে দেন (সুখের) এবং তার ধারণাতীত উৎস হতে তাকে রিযক দান করেন; যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ওপর নির্ভর করে তার জন্য তিনি একাই যথেষ্ট (সুরা তালাক ৬৫ : ২-৩)।

এই উপ-ধারণা আমাদেরকে খুব শক্তভাবে প্রভাবিত করে, কারণ আমরা আমাদের চাহিদা পূরণে কঠিন পরিশ্রম করে থাকি।

ঘ. আল-কাদর-এর ধারণাকে প্রয়োজনীয় প্রয়াস ও অতঃপর আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার প্রতি সোপর্দ করার সঠিক ব্যাখ্যাসহ গ্রহণ করা যায়

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগত পর্যায়ে তোমাদের ওপর যে বিপর্যয় আপতিত হয়, আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই কিতাবে লিপিবদ্ধ থাকে; আল্লাহ তায়ালার পক্ষে এটা খুবই সহজ। এটা এজন্য যে তোমরা যা হারিয়েছ (পাওনি) তার জন্য যেন তোমরা বিমর্ষ না হও, এবং যা তিনি

www.pathagar.com

> তোমাদেরকে দিয়েছেন তার জন্য হর্ষোৎফুল্ল না হও। আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন না উদ্ধত ও অহংকারীদেরকে (সুরা হাদীদ ৫৭ : ২২-২৩)।

একটি হাদিসে নবি সা. বলেছেন, যা তোমার জন্য উপকারী তার জন্য সচেষ্ট হও। আল্লাহ তায়ালার সাহায্য প্রার্থনা করো। এবং ধৈর্যহারা হয়ো না। এ হাদিসের শিক্ষা অনুযায়ী আমাদের অবশ্যই প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কাদেরকে সঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারলে আমাদের ইতিবাচক পদ্ধতি পূর্ণতা লাভ করবে এবং সঠিক পথে আমাদের মনোভাবকে প্রভাবিত করবে।

ঙ. আশাবাদকে উৎসাহিত করা এবং হতাশাবাদকে নিরুৎসাহিত করা

সুন্নাহ আমাদেরকে আশাবাদী হতে উৎসাহিত করে এবং হতাশাবাদী হতে নিরুৎসাহিত করে (যে সত্যিকারভাবে নিজেই বলে যে লোকেরা ধ্বংস হয়েছে, সে সেই যে ধ্বংস হয়েছে)।

চ. কুসংস্কারে বিশ্বাস করায় নিষেধাজ্ঞা

আল-কুরআন ছাড়া সুন্নাহও মুসলিমদেরকে কুসংস্কারে বিশ্বাস করতে নিরুৎসাহিত করে। কুসংস্কারে বিশ্বাস মানবিয় চিন্তা ও মানবিয় বুদ্ধিমত্তাকে হ্রাস করে। জীবন সংগ্রামে ও সমস্যায় আল-কুরআন ও সুন্নাহ আমাদেরকে ইতিবাচক চিন্তাশক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করে।

৪. প্রকল্পিত চিন্তা (Hypothetical Thinking)

চিন্তার এই শৈলী বা ঢং মানবিয় বুদ্ধিবৃত্তিক বৃদ্ধিসাধনের লক্ষ্যে কাজ করে এটাকে সত্যের দিকে মেলে ধরার দ্বারা। আল-কুরআনের আয়াত দিয়ে আমরা দেখব কিভাবে চিন্তার এই প্রক্রিয়া মানবমনে উন্নত করা যায় যাতে সে একজন ভালো মুসলিম হয়ে উঠতে পারে। এই প্রক্রিয়া সম্বন্ধে কুরআনের কিছু আয়াত নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

ক. আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> তারা কি কোনো কিছু ব্যতীত নিজেরাই সৃষ্টি হয়েছে না কি ওরা নিজেরাই স্রষ্টা? (সুরা তূর ৫২ : ৩৫)

www.pathagar.com

কুরআনে এ আয়াতটি উদ্ধৃত হয়েছে অবিশ্বাসীদের যুক্তি প্রতিহত করার জন্য আল্লাহ তায়ালার প্রতি যাদের কোনো ইমান নেই। চিন্তার এই প্রকল্পিত পদ্ধতি ব্যবহার করে আয়াতটি অবিশ্বাসীদেরকে তাদের যুক্তি উপস্থাপনের চ্যালেঞ্জ প্রদান করে। এ আয়াত স্পষ্ট জবাব দেয় যে আল্লাহ তায়ালাই সৃষ্টিকর্তা। তাদেরকে সরাসরি নিন্দা না করে এই প্রশ্ন দ্বারা তাদেরকে তাদের হৃদয় উন্মুক্ত করতে দেওয়া হয়েছে।

খ. আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> এবং বলো, হয় আমরা (যারা তাঁকে বিশ্বাস করি) অথবা তোমরা (যারা তাঁর একত্ব অস্বীকার করে) সৎপথে স্থিত অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পতিত (সুরা সাবা ৩৪ : ২৪)।

এ আয়াত হতে বোঝা যায় যে, পক্ষসমূহের একটি মিথ্যা বলছে এবং তারা এটা করে নিশ্চিতার্থক পদ্ধতিতে। এভাবে যেহেতু এটা কোনো যুক্তিবাদী উপায় নয় তাই তা অন্যপক্ষকে আহত করে না। কিছু মুফাসসির বলেন যে, তারা মিথ্যা বলছে তবে তা সরাসরি পেশ করছে না। আল-কুরআন ইঙ্গিত করছে যে, এই ঢং-য়ে নিশ্চয়তার সাথে পেশ করা যায়, আক্রমণাত্মকভাবে নয়। এবং একটি প্রকল্পিত শৈলী ব্যবহার করে এটা এই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, এক পক্ষ সরল পথে রয়েছে যেখানে অন্য পক্ষ ভুল পথে।

এখানে লক্ষণীয় যে অন্যের দোষ চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে কুরআন প্রদর্শিত মূল লক্ষ্য হচ্ছে তাদেরকে আঘাত দেওয়া নয় কারণ তা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই অস্বীকৃতির দিকে নিয়ে যাবে।

গ. আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> ইউসুফ বলল, সে-ই আমা হতে অসৎকর্ম কামনা করেছিল। স্ত্রীলোকটির পরিবারে একজন পরামর্শ দিল, যদি ওর জামার সামনের দিক ছেঁড়া হয়ে থাকে তাহলে স্ত্রীলোকটি সত্য কথা বলেছে এবং সে (ইউসুফ) মিথ্যাবাদী। কিন্তু যদি তার জামা পেছন হতে ছিন্ন করা হয়ে থাকে তবে স্ত্রীলোকটি মিথ্যাবাদী এবং পুরুষটি সত্য বলছে (সুরা ইউসুফ ১২ : ২৬-২৭)।

এ আয়াতে দুটি প্রকল্পিত সত্য রয়েছে; যদি ইউসুফ আ.-এর পোষাক সম্মুখ হতে ছেঁড়া থাকত তবে স্ত্রীলোকটি নিরপরাধ এবং পেছন থেকে হলে ইউসুফ আ. নিরপরাধ। এখানে প্রকল্পিত চিন্তার আরেকটি লক্ষণ রয়েছে : সাক্ষ্যের উপস্থাপন

www.pathagar.com

শুরু হচ্ছে প্রথমে দোষী/অপরাধীর দিক থেকে, মনে হচ্ছে যেন সে (স্ত্রীলোকটি) সঠিক কিন্তু বক্তব্যের শেষের দিকে আয়াতটি প্রত্যয়ের সাথে বোঝাতে সমর্থ হয় যে, স্ত্রীলোকটিই অপরাধী।

ঘ. অবিশ্বাসীদের সাথে ফিরআউনের কথোপকথনের ক্ষেত্রেও প্রকল্পিত চিন্তা ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> ফিরআউন বংশের এক বিশ্বাসী ব্যক্তি যে তার ইমান গোপন রেখেছিল, বলল, তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এজন্য হত্যা করবে যে সে বলে আমাদের রব আল্লাহ তায়ালা, অথচ সে তোমাদের রবের নিকট হতে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে তোমাদের নিকট এসেছে? এবং যদি সে মিথ্যাবাদী হয়, তার মিথ্যাবাদিতার দায় সে বহন করবে, আর যদি সে সত্যবাদী হয়, তাহলে সে তোমাদেরকে যে শাস্তির কথা বলে তা তোমাদের ওপর আপতিত হবে। আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না (সুরা মুমিন ৪০ : ২৮)।

ঙ. এটা সত্য উদঘাটনের জন্য ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> অতঃপর রাত্রির অন্ধকার যখন তাঁকে (ইবরাহীম আ.) আচ্ছন্ন করল, তখন সে নক্ষত্র দেখে বলল, এ-ই আমার রব। কিন্তু যখন তা অস্তমিত হলো তখন সে বলল, যা অস্তমিত হয় তা আমি পছন্দ করি না। অতঃপর সে যখন চাঁদকে উদিত হতে দেখল তখন বলল, এ-ই আমার রব। যখন এ-ও অস্তমিত হলো তখন সে বলল, আমাকে আমার রব সৎপথ না দেখালে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হব। অতঃপর যখন সে সূর্যকে দীপ্তিমানরূপে উদিত হতে দেখল তখন বলল, এ-ই আমার রব, যখন এ-ও অস্তমিত হলো তখন সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহ তায়ালার শরীক করো তার সাথে আমার কোনো সংশ্রব নেই (সুরা আন'আম ৬ : ৭৬-৭৮)।

৫. যৌক্তিক চিন্তা (Rational Thinking)

আক্ষরিক অর্থে যৌক্তিক বলতে যৌক্তিকভাবে চিন্তা করার সম্ভাবনা থাকা, যুক্তি দ্বারা গঠিত, কারো যুক্তিবাদিতাকে সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহার এবং সঠিক সিদ্ধান্ত লাভ

www.pathagar.com

করাকে বোঝায়। যুক্তির বিষয়ে গ্রহণযোগ্য হওয়া, বোকামী, অসম্ভব কিংবা সীমাতিরিক্ত না হওয়াকেও বোঝায়[৫২]।

ধারণাগতভাবে যৌক্তিকতা শব্দটির কমপক্ষে সাতটি অর্থ রয়েছে, সেগুলো হলো :

১. ধারণাগত যৌক্তিকতা, যার অর্থ হচ্ছে অস্পষ্টতা ও বাহুল্য কমিয়ে আনা।

২. ন্যায়ানুগ যৌক্তিকতা, যার অর্থ হচ্ছে সামঞ্জস্য বিধান ও বিরোধ এড়ানোর জন্য চেষ্টা করা।

৩. পদ্ধতিভিত্তিক যৌক্তিকতা, অর্থাৎ প্রশ্ন উত্থাপন, সন্দেহ প্রবণতা ও সমালোচনা, প্রমাণ ও সাক্ষ্য বিচার এবং দাবিকরণ, তা অনুকূল বা প্রতিকূল যাই হোক।

৪. জ্ঞানতত্ত্বীয় যৌক্তিকতা যা অভিজ্ঞতাভিত্তিক সমর্থন প্রত্যাশা করে এবং বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানভাণ্ডারের সাথে সামঞ্জস্যহীন আন্দাজ অনুমানকে এড়িয়ে চলে।

৫. তত্ত্বগত যৌক্তিকতা যা বর্তমান সময়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সর্বদাই মূল্যবান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের সামঞ্জস্য বিধান করে।

৬. মূল্যায়ন যৌক্তিকতা যার অর্থ হচ্ছে লক্ষ্যের জন্য সংগ্রাম যা অর্জন যোগ্যতা ও অর্জন করার উপযোগিতার বাড়তি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন।

৭. বাস্তব যৌক্তিকতা, এটা খাপ খাওয়ানোর উপায় যা দৃশ্যমান লক্ষ্যে পৌছানো সহায়ক বলে মনে হয়[৫৩]।

আল-কুরআন নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে যৌক্তিক চিন্তাশৈলী ব্যবহার করেছে :

- আল্লাহ তায়ালার অস্তিত্ব, তাঁর একত্ব, তাঁর গুণাবলী এবং একমাত্র তিনিই ইবাদত পাওয়ার সত্যিকার অধিকারসম্পন্ন তা প্রমাণ করা ও দৃঢ় করা;
- বিচার দিবস প্রমাণ ও দৃঢ়করণ;

---

[৫২] উইলিয়াম লিট্‌ল লিখিত The Short Oxford English Dictionary, ৩য় সংস্করণ, খণ্ড ২, ক্লোরেডন প্রেস, অক্সফোর্ড, লন্ডন, ইউ. কে।

[৫৩] জোসেফ আগাসী ও ইয়ান চার্লস জার্ভিয়া : Rationality : theoretical view, Martineis Nijhoff Publisher, Dardrecht, নেদারল্যান্ড, ১৯৮৭।

www.pathagar.com

- যারা আল্লাহ তায়ালা ও আখিরাতের অস্তিত্ব অস্বীকার করে তাদের ত্রুটিপূর্ণ যুক্তিকে আক্রমণ করা এবং তাদের উপস্থাপিত যুক্তিতর্ক ও ভুল ধারণাকে বাতিল করে দেওয়া।

অস্বীকারকারীদের মতামত বাতিল করে আল্লাহ তায়ালার একত্ব সমর্থনে যৌক্তিক চিন্তাশৈলী ব্যবহারে আল-কুরআন দৃঢ়তার সাথে বলে :

> যদি আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত বহু ইলাহ থাকত (আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে) তবে উভয়ই ধ্বংস হয়ে যেত। অতএব ওরা যা বলে তা হতে আরশের অধিপতি আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, মহান (সুরা আম্বিয়া ২১ : ২২)।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> আল্লাহ তায়ালা কোনো সন্তান গ্রহণ করেননি এবং তাঁর সাথে অন্য কোনো ইলাহ নেই। (যদি থাকত) তবে প্রত্যেক ইলাহ নিজ নিজ সৃষ্টি নিয়ে পৃথক হয়ে যেত এবং একে অপরের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করত। ওরা (অবিশ্বাসীরা) যা আরোপ করে তা হতে আল্লাহ তায়ালা কত পবিত্র (সুরা মু'মিনুন ২৩ : ৯১)।

যারা বিচার দিবসকে অস্বীকার করে তাদের দাবিকে বাতিল করার জন্য আল-কুরআন এই চিন্তাশৈলী ব্যবহারের ক্ষেত্রে দু'ধরনের চিন্তাধারা প্রয়োগ করে। এর প্রথমটিতে তাদেরকে বলা হয় যে, নতুন জিনিস সৃষ্টির চেয়ে পুনঃসৃষ্টি সহজ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> এবং তিনিই যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, অতঃপর (এটা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর) তিনি এর পুনরাবৃত্তি করবেন; এবং এটা তাঁর জন্য অধিকতর সহজ (সুরা রূম ৩০ : ২৭)।

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে,

> মানুষ (অবিশ্বাসী) কি মনে করে যে আমরা তার অস্থি পুনঃসংযোজিত করতে পারব না? হ্যাঁ আমি ওর অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত যথাযথভাবে পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম। তবুও মানুষ মৃত্যু ও কিয়ামতকে (অর্থাৎ তার সম্মুখে যা আছে তাকে) অস্বীকার করে এবং পাপকার্য অব্যাহত রাখতে চায় (সুরা কিয়ামা ৭৫ : ৩-৫)[৫৪]।

---

[৫৪] আরো দেখুন : আন্-নাযিআত : ২৭ ' সুরা আবাসা ৮০ : ২৪ সুরা হাজ্জ ২২ : ৫-৬, আল-জাসিয়া : ২৪-২৬।

www.pathagar.com

অবিশ্বাসীদের প্রত্যাখ্যান করতে দ্বিতীয় উপায় একথা বলা যে, যিনি নাস্তি হতে আস্তিতে আনতে পারেন, তিনি কিছু না হতে কিছু সৃষ্টি করতেও পারেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> মানুষ কি দেখে না আমি তাকে সৃষ্টি করেছি সামান্য শুক্রবিন্দু হতে- অথচ পরে সে হয়ে পড়ে প্রকাশ্য বিতণ্ডাকারী। এবং (এখন) সে (আমাদের সম্বন্ধে যুক্তি পেশ করেও) বলে, অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে যখন তা পঁচে গলে যাবে? বলো, ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনি যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রতিটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত (সুরা ইয়াসীন ৩৬ : ৭৭-৭৯)।

তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকারকারীদের যুক্তি প্রতিহত করতেও আল-কুরআন যৌক্তিক চিন্তাশৈলী ব্যবহার করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> তারা কি কোনোকিছু ছাড়াই সৃষ্ট হয়েছে, না ওরা নিজেরাই স্রষ্টা? না কি ওরা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? বরং ওদের তো কোনো নিশ্চিত বিশ্বাস নেই (সুরা তূর ৫২ : ৩৫-৩৬)।

৬. প্রতিক্ষেপনকারী/ধ্যানাভিমুখী চিন্তা (Reflective/Contemplative Thinking)

প্রথমেই বলতে হয়, কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে এজন্যই যাতে যে ব্যক্তি তা পাঠ করে সে যেন গভীরভাবে চিন্তা করে এবং এর বাণী তার অন্তরে প্রতিফলিত হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> এটা (এই কুরআন) এমন এক কিতাব, এটা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি অনুগ্রহপূর্ণ করে, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ (সুরা সাদ ৩৮ : ২৯)।

কুরআন মহাবিশ্বের সৃষ্টি অনুধাবনার্থে মানবজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে : আকাশ, তারকারাজি, সমুদ্র, প্রাকৃতিক বিষয়াদি যেমন- দিন ও রাত্রি, বায়ু, বৃষ্টি ইত্যাদি। এর প্রতিফলন ঘটে এভাবে :

- আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টির প্রশংসা দিয়ে
- আত্ম-শান্তি

www.pathagar.com

- আল্লাহ তায়ালার যিকর (স্মরণ)
- চিন্তাশীলকে তার কর্তব্য স্মরণ করান এবং তা পূরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করান।
- মহাবিশ্বকে পর্যবেক্ষণ, লক্ষ্য ও পরীক্ষা করা। এটা মহাবিশ্ব নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মনীতি আবিষ্কারের দিকে নিয়ে যায়, যাকে মানুষের অধীন করা হয়েছে যাতে সে পৃথিবীকে আবাদ করে এবং সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করে।

এখান থেকে প্রতিক্ষেপক চিন্তাকে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রসমূহে চালিত করা যায় :

ক. আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> নিশ্চয়ই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিন ও রাত্রির পরিবর্তনে, মানুষের হিতসাধনকারী সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আকাশ হতে যে বারিবর্ষণ দ্বারা আল্লাহ তায়ালা মৃত ধরিত্রীকে পুনরুজ্জীবিত করেন তাতে এবং তার মধ্যে যাবতীয় জীবজন্তুর বিস্তারণে, বাছুর দিক পরিবর্তনে এবং আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে, নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানবান মনুষ্যকুলের জন্য (সুরা বাকারা ২ : ১৬৪)।

খ. প্রতিফলন ও অনুধাবনের আরেকটি ক্ষেত্র কুরআনের আয়াত নিজেই।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> যারা (আল্লাহ তায়ালার) সিংহাসন (আরশ) ধারণ করে আছে এবং যারা এর চারপাশ ঘিরে রয়েছে, তারা তাদের প্রতিপালকের অসীম পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে (বলে) : হে আমাদের প্রভু! তোমার দয়া ও জ্ঞান সবকিছুকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে; অতএব যারা তওবা করে ও তোমার পথ অনুসরণ করে তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত হুতাশন হতে তাদের রক্ষা করো (সুরা মুমিন ৪০ : ৭)।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় আল-শাইখ আবদুর রাহমান বিন নাসের আল-সাদী বলেন, আল্লাহ তায়ালা ফিরিশতাদের ক্ষমা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে বক্তব্যের পরে (যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য প্রার্থনা করে) তাঁর প্রত্যাদিষ্ট বাণী সহযোগে প্রার্থনা করার একটি

www.pathagar.com

অতি সুন্দর বিনয়ী ভঙ্গিমার পদ্ধতি বর্ণনা করছেন। এখানে অনুধাবনকারী কেবল শব্দের অর্থের মাঝেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবে না। সে শব্দের অর্থ উপলব্ধি করার চেষ্টা করবে। যখন সে নিশ্চিত হবে যে, সে শব্দটি সত্যিকারভাবে বোঝতে পেরেছে, তখন সে এর প্রতি যুক্তিসংগত দৃষ্টি দেবে, এর লক্ষ্যে যাওয়ার পথ খুঁজবে, এর অন্তর্নিহিত ভাব চিহ্নিত করবে এবং এর ওপর নির্ভরশীল বিষয়াদি অন্বেষণ করবে। সে এ ব্যাপারেও পরিপূর্ণ নিশ্চিত হবে যে তার উপলব্ধি আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার সাথে সংগতিপূর্ণ, যেমন- সে নিশ্চিত হয়েছে যে, আল্লাহ তায়ালা বিশেষ নির্দিষ্ট ভাব প্রকাশেই এই শব্দ ব্যবহার করেছেন।

যে বিষয়গুলো তার প্রাপ্ত নিশ্চয়তার দিকে চালিত করে তা ছিলো আল্লাহ তায়ালার অভিপ্রায়। দুটি কারণে : প্রথমত, এই ঘটনা সম্পর্কে তার অবধারণ ও নিশ্চয়তা এ সত্যতাভিত্তিক যে, শব্দটির অর্থ উপলব্ধি ঘটেছে এর অর্থের ওপর ভিত্তি করে; এবং দ্বিতীয়ত, তার এই জ্ঞান যে আল্লাহ তায়ালা সর্বজ্ঞ। তিনি তাঁর বান্দাদের তাঁর কিতাবের ওপর চিন্তা ও ধ্যান করার নির্দেশ দিয়েছেন, এবং তিনি জানেন শব্দের বিভিন্ন ভাবের মধ্যে কোন্‌টি প্রকৃত অর্থ, কারণ তিনি জানিয়েছেন যে, তাঁর গ্রন্থ হিদায়াতের উৎস, সবকিছুর জ্যোতি ও বিশদ ব্যাখ্যা, এবং আরো এই যে, বক্তব্যে তিনিই সবচেয়ে বাগ্মিতাপূর্ণ ও ব্যাখ্যায় সুস্পষ্ট। তাই, আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা অনুযায়ী বান্দা জ্ঞানের অগাধ কোষাগার হতে তার অংশ ও কল্যাণ গ্রহণ করবে[৫৫]।

প্রতিক্ষেপক/প্রতিদলনীয় চিন্তার উদ্দেশ্যসমূহকে নিম্নবর্ণিত তালিকাভুক্ত করা যায়[৫৬] :

১. এটা প্রমাণ করা যে, আল-কুরআন আল্লাহ তায়ালার নিকট হতে প্রত্যাদিষ্ট গ্রন্থ।

২. বিশ্বাসীদেরকে এটা মনে করিয়ে দেওয়া যে, বিজয় কেবল আল্লাহ তায়ালার কাছেই চাইতে হবে।

৩. বিচার দিবসের ওপর বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করা।

৪. প্রাকৃতিক বিলিবন্দোবস্তকে পুনঃতৎপর করা (সহজাত প্রকৃতি)।

৫. আল্লাহ তায়ালার একত্বের ওপর, কেবল তিনিই ইবাদতের যোগ্য এই ধারণার ওপর জোর দেওয়া।

---

৫৫ তাইসির আল-করিম আল-রাহমান (১৯৯৯)। আল-রিসালা, পৃষ্ঠা ৬৭৯।

৫৬ আল-নাহলাভী, আবদ্ আল রাহমান : আল-তারবিয়াহ বি আল-ইবরা, দার আল-ফিকর আল-মু'আসির, বৈরুত, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ৩১-৩২।

www.pathagar.com

৭. মানসগোচর চিন্তা (Visual Thinking)

মানসগোচর চিন্তা বা দৃষ্টিলব্ধ চিন্তা হচ্ছে চিন্তা করা ও ভাবমূর্তির মাধ্যমে যোগাযোগ করার সামর্থ্য। আল কুরআনে বিচার দিবসে জান্নাত, জাহান্নাম ও বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনার ক্ষেত্রে দৃষ্টিলব্ধ/মানসগোচর চিন্তাকে ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালার একত্বকে দৃঢ় করা এবং অবিশ্বাসীদের ভ্রান্ত ধারণা অপনোদনে এটা ব্যবহার করা হয়েছে। আল-কুরআনে এসব অবস্থার বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে এই চিন্তাশৈলী আমাদের কল্পনাকে উস্কে দেয়। বলা হয়ে থাকে যে, সাহাবি রা.-দের একজন তাঁর জীবনে জান্নাত ও জাহান্নামের আগুন দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। যখন তাঁকে এ সম্পর্কে চ্যালেঞ্জ করা হয় এবং জিজ্ঞাসা করা হয় কিভাবে এটা সম্ভব? তিনি সহজে উত্তর দেন : নবি মুহাম্মদ সা.-এর চোখ দিয়ে। এবং তিনি বুঝিয়েছেন যে, তিনি এগুলো দেখেছিলেন আল-কুরআনে উদ্ধৃত এসবকে মানসপটে এনে অথবা নবি সা.-এর নীতি ও হাদিসের মধ্যে।

এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের দেখার এমন শক্তি দিয়েছেন যা মানবিয় ধারণার বাইরে, অপ্রত্যক্ষভাবে আমরা আমাদের কল্পনার মাধ্যমে দেখতে পারি, যা শিক্ষার অন্যতম শক্তিশালী পথ।

এ সম্পর্কে যেসব আয়াত কথা বলে তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো :

ক. বিচার দিবসের ভয়াবহ মুহূর্তের কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> হে মানুষ! ভয় করো তোমাদের প্রতিপালককে; কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ংকর ব্যাপার। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী বিস্মৃত হবে তার দুগ্ধপোষ্য শিশুকে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে (নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই); এবং সমস্ত মানবজাতিকে দেখে মনে হবে যেন মাতাল, যদিও তারা নেশাগ্রস্ত নয়- বস্তুত আল্লাহ তায়ালার শাস্তি বড়ই কঠিন (সুরা হাজ্জ ২২ : ১-২)।

এ আয়াত দুটি অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা আমাদের বিচার দিবসের ঘটনা মানশ্চক্ষে চিন্তার ঢং-এ প্রত্যক্ষ করাচ্ছেন। চিন্তার এরকম পদ্ধতি আমাদের স্পষ্টভাবে যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছে সেদিন কেমন ভয়ংকর হবে সে ব্যাপারে। অন্য আরেক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

www.pathagar.com

সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো। এবং পর্বতসমূহ হবে ধুনিত রঙিন পশমের মতো (সুরা ক্বারিয়া ১০১ : ৪-৫)।

খ. এই চিন্তাশৈলী যা কুরআনে ব্যবহৃত হয়েছে তা আল্লাহ তায়ালার বাণীর প্রতি এর নির্দেশনাকে বাতিল করার মধ্য দিয়ে হয়েছে। অবিশ্বাসীদের দুর্ব্যবহারও বর্ণনা করে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

ওরা যেন ভীতসন্ত্রস্ত গর্দভ যা সিংহের সম্মুখ হতে পলায়নপর (সুরা মুদ্দাস্সির ৭৪ : ৫০-৫১)।

অন্য এক আয়াতে,

এবং মানবজাতির মধ্যে কেউ কেউ রয়েছে যারা আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করে প্রান্তের ওপর অবস্থান করে (সন্দেহের সাথে); যদি তার মঙ্গল হয় তাহলে তাতে তার চিত্ত প্রশান্ত হয় এবং কোনো পরীক্ষার সম্মুখীন হলে সে তার মুখ ফিরিয়ে নেয় (অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের পর অবিশ্বাসের দিকে ফিরে যায়)। সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি (সুরা হাজ্জ ২২ : ১১)।

গ. পাঠক বা শ্রোতার হৃদয় ও অনুভূতিকে স্পর্শ করার জন্য আল-কুরআন জীবনের সাথে প্রাকৃতিক প্রপঞ্চ, জাহান্নামের আগুন ইত্যাদির মতো কঠিন বস্তুকে যুক্ত করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

এবং শপথ রজনীর যখন তা গত হতে থাকে (আল-ফাজর : ৪)। তিনিই দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন যাতে ওদের একে অন্যকে দ্রুত গতিতে অনুসরণ করে ... (সুরা আ'রাফ ৭ : ৫৪)। যখন ওরা তার মধ্যে (জাহান্নামের আগুণে) নিক্ষিপ্ত হবে তখন ওরা জাহান্নামের শব্দ শুনবে এবং তা হবে উদ্বেলিত। রোষে জাহান্নাম যেন ফেটে পড়বে (সুরা মুলক ৬৭ : ৭-৮)।

৮. রূপকাশ্রিত চিন্তা (Metaphorical Thinking)

রূপককে এভাবে বর্ণনা করা যায়, এক প্রকার বাক্যালংকার যা দুটি বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য বা ঘনিষ্ট তুলনা ব্যবহার করে, সাধারণত কোনো কিছু দেখা হয়, কোনো

www.pathagar.com

কিছু হতে যেন তাদের মধ্যে মিল রয়েছে। রূপক হচ্ছে শব্দের ব্যবহার ও প্রসঙ্গ সম্প্রসারণের সাধারণ উপকরণ[৫৭]।

অতএব এই শব্দের অর্থ হচ্ছে দুটি শব্দের মধ্যে সাদৃশ্যভিত্তিক তুলনা। একজন পাশ্চাত্য গ্রন্থকারের মতে রূপক হচ্ছে একটি উপকরণ যা দিয়ে কোনো কিছুর আলোকে কোনো কিছুকে দেখা হয়ে থাকে[৫৮]।

এতে ভাব বা ধারণার ব্যবহার ঘটে যা আলোচনা বা অভিজ্ঞতা জ্ঞাত, যা দিয়ে অনভিজ্ঞতার অন্য ক্ষেত্রকে বর্ণনা করা হয় নির্দিষ্ট সমান্তরাল, সাদৃশ্যতা অথবা দুই ক্ষেত্রের মধ্যে কার্যক্রমে আপাত-আত্মবিরোধী সম্পর্ক নির্ণয়ে।

একে নীতিগর্ভ রূপক কাহিনীও বলা হয়।

আল-কুরআনে ব্যবহৃত নীতিগর্ভ রূপক কাহিনীকে অন্তরস্পর্শী রচনাশৈলী, বাস্তবতার নিকটতর, প্রেষণার শক্তি, প্রতিষেধক ব্যবস্থা এবং আলোকিতকরণের একটি উৎস হিসেবে বর্ণনা করা যায়[৫৯]।

প্রকরণের বিষয়ে বিদ্বানগণ নীতিগর্ভ রূপক কাহিনীকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন : স্পষ্ট, লুক্কায়িত এবং অর্পিত[৬০]। এখানে কুরআনে নীতিগর্ভ রূপক কাহিনী ব্যবহারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে এর উদ্দেশ্য যা নিম্নোক্তভাবে বিভক্ত করা যায় :

ক. আল্লাহ তায়ালার একত্বের ওপর জোর দেওয়া ও তা প্রত্যয়ন করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> আল্লাহ তায়ালা একটি দৃষ্টান্ত পেশ করছেন : একজন দাসের প্রভু অনেক (তাদের মতো যারা আল্লাহ তায়ালার সাথে অন্যদের ইবাদত করে) যারা পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন এবং আরেক দাসের প্রভু কেবল

---

৫৭ The Hutchinson Dictionary of Ideas (গ্রেট বৃটেন, হেলিগন পাবলিশিং লিমিটেড, ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ৩৪৭।

৫৮ Metaphor in the History of Psychology, edited by David & Leary (নিউইয়র্ক, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি), পৃষ্ঠা ১৩৭।

৫৯ ইসরার আহমদ খান : Quranic Studies : An Introduction (কুয়ালালামপুর, জামান ইসলাম মিডিয়া, ২০০০), পৃষ্ঠা ২৩৫-২৩৬।

৬০ ক্বাতান মান্না : মাবাহিথ ফি 'উলূম আল-কুরআন (কায়রো, ওয়াহবাহ, ১৯৯৫)।

www.pathagar.com

একজন। এই দুজনের (দাসের) অবস্থা কি সমান? সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালারই কিন্তু ওদের অধিকাংশই তা জানে না (সুরা যুমার ৩৯ : ২৯)।

খ. কোনো কিছুকে প্রমাণিত করা যা মানুষের উপলব্ধি ক্ষমতার ঊর্ধ্বে যেমন পুনরুত্থান। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

এবং তাঁর একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও শুষ্ক, ঊষর; কিন্তু আমরা ওতে বারি বর্ষণ করি তখন তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয় বিকাশের জন্য (তরুলতা জন্মানোর জন্য)। নিশ্চয়ই যিনি জীবন দান করেন তিনিই মৃতকে জীবন দিতে সক্ষম পুনরুত্থান দিবসে। বস্তুত তিনি তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান (সুরা হা-মীম আস সাজদা ৪১ : ৩৯)।

গ. ভালো কাজকে উৎসাহিত ও উন্নীত করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

যারা নিজেদের ধনৈশ্বর্য আল্লাহ তায়ালার পথে ব্যয় করে তাদের উপমা একটি (শস্য) বীজ যা সাতটি শীষ উৎপন্ন করে, প্রত্যেক শীষে একশ শস্যকতা। আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ তায়ালা প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ (সুরা বাকারা ২ : ২৬১)।

ঘ. মানুষের দৃষ্টিতে কুৎসিত করে প্রদর্শন করে মন্দ কাজকে নিরুৎসাহিত করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

যারা আল্লাহ তায়ালার পরিবর্তে (কোনো কিছু বা কোনো শক্তিকে) অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তাদের উপমা মাকড়সা, যে নিজের জন্য ঘর বানায় এবং ঘরের মধ্যে মাকড়সার ঘরইতো দুর্বলতম। তারা যদি এটা বুঝত (সুরা আনকাবূত ২৯ : ৪১)!

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল অতঃপর তা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তকের বোঝা বহনকারী গর্দভ (যা হতে তারা কোনো উপকার পায় না)। কত নিকৃষ্ট সে সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত যারা আল্লাহ তায়ালার বাণীকে মিথ্যা বলে আর আল্লাহ তায়ালা যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না (সুরা জুম'আ ৬২ : ৫)।

www.pathagar.com

পুনরায় এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা উপমা ব্যবহার করেছেন তাওরাতের অনুসারী ও গর্দভের মধ্যে তুলনা করার ক্ষেত্রে, যে বোঝা হিসেবে বই পুস্তক বহন করে কিন্তু তা যে কত মূল্যবান সে সেটা জানে না। এটা তাদের দৃষ্টান্ত যারা তাওরাত পাঠ করে। কিছু মুফাসসিরের মতে এই আয়াত তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা ইমান ও আমলের আমানত আদায়ে ব্যর্থ হয়েছে এবং তা আমাদের জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য।

ঙ. আমাদের জীবনকে বস্তুবাদী প্রলোভন দ্বারা চালিত না হওয়ার জন্য সতর্ককরণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> জেনে রাখো (হে মানুষ)! এই পৃথিবীর জীবন তো ক্রীড়া কৌতুক, জাঁকজমক এবং তোমাদের পারস্পরিক শ্লাঘা (এর কারণ) ও (তোমাদের) ধনসম্পদ ও সন্তান সন্ততিতে প্রাচুর্য্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর উপমা (জীবনদায়ী) বৃষ্টি, যাদ্বারা উৎপন্ন শস্যসম্ভার কৃষককে চমৎকৃত করে; কিন্তু তারপর তা শুকিয়ে যায় এবং তোমরা তা হলুদবর্ণ দেখতে পাও এবং অবশেষে তা খড়কুটায় পরিণত হয় (সুরা হাদীদ ৫৭ : ২০)।

চ. সুপথপ্রাপ্ত ও ভ্রান্তপথের অনুসারীদের মর্যাদাগত তুলনা করার জন্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> যে ব্যক্তি (মূর্খতা ও অবিশ্বাসের কারণে) মৃত ছিল এবং পরে আমি (জ্ঞান ও ইমান দ্বারা) জীবন দান করেছি এবং যাকে মানুষের মধ্যে চলার জন্য (ইমানের) আলো দিয়েছি, সে কি তার মতো যে অন্ধকারে রয়েছে এবং (অবিশ্বাস, অংশীবাদ ও কপটতার জন্য) সে স্থান হতে কখনও বের হতে পারে না? এভাবে কাফেরদের দৃষ্টিতে কৃতকর্ম শোভন করে রাখা হয়েছে (সুরা আন'আম ৬ : ১২২)।

যে তাঁকে বিশ্বাস করে এবং যে করে না এমন লোকদের মধ্যে আরেকটি তুলনা করতে, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> এই দুই ধরনের মানুষের উপমা অন্ধ ও বধিরের এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তিসম্পন্নের উপমা। তুলনায় এই দুই কি সমান? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না (সুরা হূদ ১১ : ২৪)?

www.pathagar.com

ছ. আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর মহান গুণাবলীর মহিমা বর্ণনা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> আল্লাহ তায়ালা আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর জ্যোতি। তাঁর জ্যোতির উপমা যেন একটি দীপাধার যার মধ্যে রয়েছে এক প্রদীপ; প্রদীপটি রয়েছে একটি কাচের আবরণের মধ্যে, যে কাচ দেখতে উজ্জ্বল নক্ষত্রসদৃশ, প্রজ্জ্বলিত করা পুতপবিত্র যয়তুন (বৃক্ষ) এর তেল দিয়ে, যা প্রাচ্যের নয় প্রতীচ্যেরও নয়। অগ্নি ওকে স্পর্শ না করলেও তা (নিজেই) উজ্জ্বল আলো দেয়। জ্যোতির ওপর জ্যোতি! আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা পথ দেখান তাঁর জ্যোতির দিকে। এবং আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন এবং আল্লাহ তায়ালা সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ (সুরা নূর ২৪ : ৩৫)।

এ আয়াতটি ঐসব আয়াতের অন্তর্ভুক্ত যার মধ্যে রূপকাশ্রিত চিন্তাশৈলী রয়েছে। এ আয়াতে তিনি তাঁর হিদায়াতকে সেই প্রদীপের সাথে তুলনা করেছেন যা সাধারণত গৃহে জ্বালানো হয়। তিনি সত্য সন্ধানে আমাদেরকে আমাদের বিবেক বুদ্ধি (আক্‌ল) প্রজ্ঞার সাথে ব্যবহারের শিক্ষা দিচ্ছেন।

৯. সাদৃশ্যমূলক চিন্তা (Analogical Thinking)

কুরআনে ব্যবহৃত এটি আরেক চিন্তাশৈলী। এটি দুটো বস্তুর মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত সাধারণ সাদৃশ্য উল্লেখ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। সাদৃশ্যমূলক চিন্তা আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে উন্নত করে এবং একবার ঠিকমতো ব্যবহৃত হলে উপলব্ধি ক্ষমতাকে বিস্তৃত করে। আমরা এ ধরনের কুরআনের আয়াত হতে গভীর উপলব্ধির মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করতে ও চিন্তাশৈলীকে উন্নত করতে পারি। কুরআনে এ ধরনের চিন্তাশৈলী সংশ্লিষ্ট কতকগুলো আয়াত রয়েছে।

ক. অংশীবাদ, কপটতা এবং অবিশ্বাসকে নিরুৎসাহিত করতে পরকালীন জগতে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল সম্বন্ধে প্রত্যাদেশ করে, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> যারা সত্যকে অস্বীকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ, তাদের (উত্তম) কর্মসমূহ মরুভূমিতে মরীচিকাসদৃশ, তৃষ্ণার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে-যতক্ষণ না তা তার নিকট উপস্থিত হয়, উপস্থিত হলে দেখবে তা কিছুই নয়; এর পরিবর্তে সেখানে সে দেখবে (যে) আল্লাহ তায়ালা (সর্বদা উপস্থিত) তার সাথে রয়েছেন এবং (যে) তিনি তার কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দেবেন। আল্লাহ তায়ালা হিসাব গ্রহণে অতি দ্রুত (সুরা নূর ২৪ : ৩৯)।

www.pathagar.com

এ আয়াত অনুযায়ী আল্লাহ তায়ালা অবিশ্বাসীদেরকে তুলনা করছেন মরুভূমিতে পিপাসার্ত ব্যক্তির সাথে। তার কৃতকর্ম তাদের নিকট মরুভূমিতে মরীচিকার ন্যায়, অথচ তারা মনে করে যে তা তাদেরকে আখিরাতে সাহায্য করবে, কিন্তু মরীচিকা যেমন পানি নয় তেমনি তাদের কৃতকর্মও নিষ্ফল। একই রকম আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> (এটা অতঃপর) তাদের উপমা যারা তাদের রবকে অস্বীকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ। তাদের উপমা এই যে, তাদের কর্মসমূহ ভস্মসদৃশ যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়। পরকালীন জীবনে তারা তাদের কৃত সৎকাজ হতে কোনো উপকারই পাবে না যা তারা মনে করে থাকে : আল্লাহ তায়ালাকে এই অস্বীকৃতিই বস্তুতপক্ষে ধ্বংসের চূড়ান্ত (সুরা ইবরাহিম ১৪ : ১৮)।

পুনরায় এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা অবিশ্বাসীদের কৃতকর্মকে ছাইয়ের সাথে তুলনা করছেন যা বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যায় ঝড়ের দিনে। এটাই হচ্ছে কুরআনে ব্যবহৃত সাদৃশ্যমূলক শৈলী যা দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় অবিশ্বাসীদের কৃতকর্ম কতটা নিষ্ফল।

খ. সৎবাক্য (অর্থাৎ তাওহিদের শব্দাবলী) এবং অসৎ বাক্য (অর্থাৎ অবিশ্বাসের শব্দাবলী)-এর মধ্যে পার্থক্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> তুমি কি দেখো না কিভাবে আল্লাহ তায়ালা উপমা দিয়ে থাকেন? সৎ বাক্যের উপমা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ, যার মূল সুদৃঢ়ভাবে সংযুক্ত ও যার শাখাপ্রশাখা (পৌঁছায়) আকাশে (অর্থাৎ অতি উচ্চ), যা সর্বদাই ফল দান করে তার প্রভুর অনুমতিক্রমে। এবং আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। এবং অসৎ বাক্যের তুলনা এক মন্দ বৃক্ষ যার মূল ভূপৃষ্ঠ হতে বিচ্ছিন্ন, যার কোনো স্থায়িত্ব নেই (সুরা ইব্রাহীম ১৪ : ২৪-২৬)।

গ. ইমান ও মূর্খতার মধ্যে তুলনা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান, অন্ধকার ও আলো, ছায়া ও রৌদ্র এবং সমান নয় জীবিত ও মৃত (অন্তরের)। দেখো (হে মুহাম্মদ), আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করাণ; তুমি শোনাতে পারবে না যারা কবরে রয়েছে তাদেরকে (মৃতদের মতো অন্তরে মৃত) (সুরা ফাতির ৩৫ : ১৯-২১)।

www.pathagar.com

একটি স্পষ্ট ছবি তৈরি করে এবং এই দুই দিকের বিশাল পার্থক্য উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা পাঠক/শ্রোতাদের নিকট এই তথ্য পৌছান যে, আল্লাহ তায়ালার দৃষ্টিতে বিশ্বাসের কী মূল্য।

এই আয়াত নবি সা.কে সত্য প্রচারে প্রচুর উদ্দীপনা দান করে, কারণ আল্লাহ তায়ালা রসুল স.-কে তাদেরকে উপেক্ষা করতে বলেছেন যারা সত্যকে অস্বীকার করে[৬১]।

১০. আবেগপূর্ণ চিন্তা (Emotional Thinking)

আবেগপূর্ণ চিন্তাকে অন্যের প্রতি সহানুভূতিবোধ হতে উদ্ভূত চিন্তাও বলা হয়, বান্দার প্রতি আল্লাহ তায়ালার যত্ন বা দয়াকে বুঝায়। কুরআনের অনেক স্থানে এই চিন্তাশৈলী দেখতে পাওয়া যায়। যেখানে পাঠক বা শ্রোতার হৃদয়কে স্পর্শ করার মতো প্রকাশভঙ্গি ব্যবহার করা হয়েছে। এ ধরনের চিন্তা-প্রকাশক আয়াত নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ক্ষমা করতে চান, আর যারা (কেবল) নিজেদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যে তোমরা ভীষণভাবে পথচ্যুত হও (সুরা নিসা ৪ : ২৭)।

এ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করার পরিবর্তে হিদায়াতের পথে আসার জন্য উৎসাহিত করছেন। আল্লাহ তায়ালা কতটা যত্নশীল তা দেখাতেই তিনি তাঁর পক্ষ হতে পুরস্কারস্বরূপ দয়া প্রদর্শন করছেন।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> বলো! (আল্লাহ তায়ালা এভাবে বলছেন) হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ-আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা সমুদয় পাপ ক্ষমা করবেন-কারণ, নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (সুরা যুমার ৩৯ : ৫৩)।

---

[৬১] এ শৈলীর সাথে সম্পর্কযুক্ত আরো আয়াত রয়েছে : আল-আহযাব : ১৯, আল-আন'আম : ১২৫, সুরা বাকারা ২ : ১৯।

www.pathagar.com

এই আয়াতে পাপিষ্ঠ বান্দাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ বর্ণনা করা হয়েছে। যারা পূর্ণ মনোযোগের সাথে কুরআন পাঠ করে কেবল তারাই এই প্রপঞ্চ সম্বন্ধে সচেতন হতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> এবং যখন আমার বান্দারা আমার সম্বন্ধে তোমাকে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই, আহ্বানকারী যখন আমাকে ডাকে আমি তার ডাকে সাড়া দিই। সুতরাং তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করুক যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে (সুরা বাকারা ২ : ১৮৬)।

পুনরায় এ আয়াতে বান্দার প্রতি আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহ আমরা অনুভব করতে পারি যখন তারা তাঁকে ডাকে। এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় কিভাবে সহমর্মী চিন্তা মানুষের অন্তরকে পরিবর্তন করে যদি তারা তাদের বিবেককে সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করে।

এছাড়া, কুরআন দু'ধরনের প্রকাশভঙ্গি ব্যবহার করেছে : আশা ও ভয়ের আবেদন।

যেসব আয়াত বিশ্বাসীদের সুখময় পরিসমাপ্তির এবং অবিশ্বাসীদের মর্মান্তিক পরিণতির বর্ণনা দেয় সেগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> তোমরা উভয়েই (জান্নাত হতে পৃথিবীতে) একত্রে নেমে যাও, তোমরা পরস্পর পরস্পরের শত্রু। পরে আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট সৎপথের নির্দেশ এলে যে আমার পথ অনুসরণ করবে সে বিপথগামী হবে না এবং দুঃখকষ্টও পাবে না। কিন্তু যে আমার স্মরণ হতে বিমুখ তার জন্য জীবন হবে কষ্টময় এবং আমরা তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করব অন্ধ অবস্থায় (সুরা ত্বহা ২০ : ১২৩-১২৪)[৬২]।

যেসব আয়াতে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির কথা রয়েছে বিশ্বাসীদের জন্য সেগুলোও এ ধরনের। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

---

৬২ আরো দেখুন : (৩ : ৩০), (৪ : ১১৫-১১৬, ১৩৭, ১৬৭-১৬৮) : (৫ : ১৩-১৪, ৪৮, ৫৬-৬৭, ৬৯, ৯৮, ১১০-১১২)।

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা মুমিন নর ও নারীকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন জান্নাতের, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত যেখানে তারা চিরদিন থাকবে এবং জান্নাত আদনে উত্তম বাসস্থানের। আল্লাহ তায়ালার মহাসন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ। উহাই মহাসাফল্য (সুরা তাওবা ৯ : ৭২)[৬৩] ।

অন্যদিকে, যেসব আয়াতে আল্লাহ তায়ালার ক্রোধের বর্ণনা রয়েছে অবিশ্বাসীদের প্রতি সেগুলোও এ ধরনের। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

... এবং যার ওপর আমার ক্রোধ আপতিত হয় সেতো ধ্বংস হয়ে যায় (সুরা ত্বহা : ৮১)[৬৪] ।

১১. প্রত্যক্ষ চিন্তা (Perceptual Thinking)

এ শৈলী তার চতুর্দিকের পৃথিবী সম্বন্ধে মানবিয় প্রত্যক্ষণের সাথে সম্পর্কিত। কুরআন কিছু বিষয় সম্বন্ধে নতুন উপলব্ধির উদ্যোগ গ্রহণ ও তা প্রতিষ্ঠাকল্পে এবং অন্যান্য বিষয়ে ইতিমধ্যে বিরাজমান উপলব্ধি পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে নাযিল হয়।

এ প্রসঙ্গে কুরআনে আলোচিত কিছু বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

পরকালীন জীবনের অবস্থা : অধিকাংশ মানুষই এই পৃথিবীকে সমুন্নত করতে এবং তাদের চূড়ান্ত গন্তব্যকে উপেক্ষা বা অস্বীকার করতে চায়।

আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে অবিশ্বাসীদের ধারণা পরিবর্তন : তারা বিশ্বাস করতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু একই সময়ে তারা পুতুল পূজা করে। ফলে, আল্লাহ তায়ালা তাদের মিথ্যা ধারণা পরিবর্তন করেন তাদেরকে এই বলে যে, তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং কেবল তিনিই সেই অদ্বিতীয় যাঁর ইবাদত করা কর্তব্য।

মূল্যবোধ : প্রত্যক্ষ চিন্তা অত্যন্ত কার্যকরভাবে কোনটা ভালো এবং কোনটা খারাপ এ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে মূল্যবোধ ও নৈতিকতাকেও দেখে থাকে।

কুরআনে যেসব আয়াত এ ধরনের চিন্তাশৈলী ব্যবহার করেছে তার উদাহরণস্বরূপ নিম্নের আয়াতগুলো উদ্ধৃত করা হলো :

---

৬৩ আরো দেখুন : (৯ : ২১) (৫ : ১১৯), (৫৮ : ২২), (৯৮ : ৮); (৫ : ১১৯) (৭ : ২৮); (৪৮ : ২৯)

৬৪ এই আয়াতগুলোও দেখুন : (৮ : ১৬), (১৬ : ১০৬), (৪২ : ১৬), (৪৮ : ৬)।

www.pathagar.com

ক. তারা যা ঘৃণা করে বা অপছন্দ করে এমন জিনিস হতে লোকেরা সাধারণত ও প্রকৃতিগতভাবে ভালো কিছু আশা করে না। কুরআন এই ধারণাকে একথা বলে পরিবর্তন করতে এসেছে যে এটা সত্য নয় এবং আমরা যা অপছন্দ করি তা আমাদের জন্য ভালো ও উপকারী হিসেবে রূপান্তরিত হতে পারে। এমন দুটি অবস্থা রয়েছে যেখানে এই ধারণা সত্য বলে প্রতীয়মান। একটি হচ্ছে যুদ্ধরত শত্রুদল এবং আত্মরক্ষার্থে মুসলিম সম্প্রদায়, যা অনেক লোকই অপছন্দ করতে পারে কারণ যোদ্ধা আহত হতে পারে কিংবা মারাও যেতে পারে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> তোমাদের জন্য (আল্লাহ তায়ালার পথে) যুদ্ধকে ফরজ করা হলো যদিও তোমরা তা অপছন্দ করো, কিন্তু তোমরা যা পছন্দ করো না সম্ভবত তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং তোমরা যা পছন্দ করো তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আল্লাহ তায়ালা জানেন; তোমরা জানো না (সুরা বাকারা ২ : ২১৬)

এই আয়াত বর্ণনা করে যে, যদিও মুসলিমরা শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে অপছন্দ করে, এটা তাদের জন্য উত্তম। এটা চিন্তার প্রত্যক্ষণ শৈলীর অন্তর্ভুক্ত। কুরআন জিহাদ (এবং কিতাল) প্রসংগে এই বোধকে পরিবর্তন করে, কারণ এটা উত্তম কাজ যেহেতু আল্লাহ তায়ালা জানেন অথচ আমরা জানি না।

দ্বিতীয় অবস্থাটি সমাজ জীবন এবং সাফল্যের সাথে পারিবারিক বিষয়ের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> এবং তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সম্মানের সাথে জীবনযাপন করবে। যদি তাদেরকে অপছন্দ করো তবে এমন হতে পারে যে আল্লাহ তায়ালা যাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন তোমরা তাকেই অপছন্দ করছ (সুরা নিসা ৪ : ১৯)।

আল্লাহ তায়ালা এদিকে মনোযোগ আকর্ষণ করছেন যে, মানুষের চিন্তা এমন কিছুকে গ্রহণ করতে পারে না যা তার ইচ্ছার বিপরীত। তাই, এ আয়াতে, প্রত্যক্ষ চিন্তাশৈলী সিদ্ধান্ত গ্রহণে মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করছে। তবে, কখনও, কিছু জিনিস যা আমাদের চিন্তার বিপরীত তা অপছন্দ করলেও আমাদের জন্য উপকারী। এখানে ইসলামের লক্ষ্য হচ্ছে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। হাদিসে এই আয়াতের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। নবি (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলেন,

www.pathagar.com

বিশ্বাসীর উচিত নয় তার স্ত্রীকে ঘৃণা করা যদিও তার কোনো কোনো বৈশিষ্ট্যে সে অসুখী, এক্ষেত্রে অন্য গুণগুলো দেখে তার সন্তুষ্ট থাকা কর্তব্য।

কুরআন এই ধারণার একটি জীবন্ত উদাহরণ দিচ্ছে। যখন নবি সা.-এর কোনো একজন স্ত্রীকে (আল-ইফ্‌ক) এ অভিযুক্ত করা হয় তখন কুরআন একথা বলে বিস্ময় প্রকাশ করে :

> যারা এ অপবাদ রচনা করেছে তারা তো তোমাদেরই একটা দল। একে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না। বরং এটাতো তোমাদের জন্য কল্যাণকর (সুরা নূর ২৪ : ১১)।

খ. লোকেরা সাধারণভাবে মৃত্যুকে একটি দুঃখজনক ঘটনা হিসেবে এবং জীবনকে উত্তম কিছু হিসেবে মনে করে থাকে, এটা কেমন তা না জেনেই। অন্য কথায়, মৃত্যু একটি ঋণাত্মক বোধ হিসেবে এবং জীবন ধণাত্মক বোধ হিসেবে বিবেচিত। এর ফলে আজকাল গুরুতর শাস্তি সম্বন্ধে বিতর্ক রয়েছে। বহু পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী এটাকে বাতিল করার পক্ষে। এক্ষেত্রে কুরআনের পৃথক মতো রয়েছে। ইসলামি ফৌজদারী আইনে কিসাস'-এর অথবা হত্যাকারীর জন্য রক্তপণকে শাস্তির উপায় বলে ধারণা রয়েছে। কুরআনে এই ধারণার যে বর্ণনা রয়েছে তা ভিন্নরকম। আল্লাহ তায়ালা বলেন, এবং কিসাসে রয়েছে জীবন-এর নিরাপত্তা (২ : ১৭৯)।

এতে বলা হয়েছে, যদি তুমি নিজেকে রক্ষা করতে চাও অন্যায়কারীদের হাত হতে এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা পেতে চাও শাস্তি ও উন্নতির নিশ্চয়তাবিধানকল্পে, তাহলে তুমি অবশ্যই তাদেরকে শাস্তি দেবে যারা সামাজিক নিরাপত্তার প্রতি বাধাস্বরূপ এবং ক্ষতিকর। যারা ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তাদেরকে হত্যাকরাসহ অপরাধীদের শাস্তি প্রদান হচ্ছে ফৌজদারী মামলাসমূহে সীমারেখার নিশ্চয়তা এবং শান্তিপূর্ণভাবে স্বাভাবিক জীবন যাপনের গ্যারান্টি[৬৫]।

গ. 'মহত্ব' কে সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে এই গুণ অর্জনে পার্থক্য রয়েছে। কিছু লোকের নিকট সেই ব্যক্তিই মহৎ যিনি কোনো মহান গোত্র বা পরিবার বা

---

[৬৫] ফাতি ওসমানী : The Concept of the Qur'an, topical Reading, 1st ed. ABIM, Kulalampur, 1997।

www.pathagar.com

বিশেষ বংশ বা জাতি হতে আগত। কুরআন এসেছে এই ধারণাকে পরিবর্তন করতে। কুরআন বর্ণনা করে যে, অতি মহৎ ব্যক্তি তিনিই যিনি ধর্মভীরু এবং সৎ, তার লিঙ্গ, বর্ণ, জাতি বা গোত্র যেমনই হোক না কেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> তোমাদের মধ্যে সেই সবচেয়ে সম্মানিত যে সবচেয়ে তাক্ওয়াসম্পন্ন (সুরা হুজুরাত ৪৯ : ১৩)।

ঘ. একজন মানুষের দৈহিক চেহারা কি তাকে ভালো বলে বিচারের জন্য যথেষ্ট? কিছু লোক অন্যদের চেহারা দেখেই আকৃষ্ট হয় এবং তৎক্ষণাৎ তাকে ভালো বলে রায় দেয়। কুরআন এক্ষেত্রে মুনাফিকদের সম্বন্ধে বর্ণনা করতে গিয়ে আমাদেরকে ভিন্ন ধারণা দেয় :

> তুমি যখন ওদের দিকে তাকাও (তখন) ওদের দেহাকৃতি তোমার নিকট প্রীতিকর মনে হয়, ওরা যখন কথা বলে, তুমি সাগ্রহে ওদের কথা শুনে থাকো, কিন্তু বাস্তবে ওরা দেওয়ালে হেলান দেওয়া অবস্থায় রক্ষিত কাঠের স্তম্ভ সদৃশ ... (সুরা মুনাফিকুন ৬৩ : ৪)।

এখানে আল-কুরআন আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে মুনাফিকদের চেহারা দেখে এবং তাদের সুন্দর কথাবার্তা শুনে প্রভাবিত না হতে। কারণ বাস্তব অবস্থা পুরাপুরি বিপরীত।

একইভাবে আমরা দেখি যে, সুন্নাতেও এই চিন্তাশৈলী ব্যবহৃত হয়েছে। নবি সা. বলেছেন : শক্তিশালী সে ব্যক্তি নয় যে তার প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করে বরং সে ব্যক্তিই শক্তিশালী যে ক্রোধের মুহূর্তে তার মেজাজকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

অতএব রসুল সা.-এর শিক্ষা জীবনের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আমাদের নবি সা-এর সময় একদা এক যুবক তাঁর সা.-এর নিকট যিনা (ব্যাভিচার) করার অনুমতি চাইল এবং রসুল সা. ঐ সময় বিষয়টি বিচক্ষণতার সাথে মোকাবেলা করলেন, একই সময়ে তাঁর সাহাবিদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে। আমাদের নবি সা. প্রত্যক্ষ চিন্তাশৈলী তরুণদের এবং সাহাবিদের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করে শিক্ষা দিয়েছেন যে, ব্যভিচার একটি অনাকাঙ্ক্ষিত কাজ এবং ইসলামে নিষিদ্ধ। তাকে (তরুণকে) একথা জিজ্ঞাসা করেছেন যে এটা যদি তার মায়ের, বোনের এবং ফুফু/খালার ক্ষেত্রে ঘটে তবে সে কেমন অনুভব করবে। এভাবে তিনি ঐ তরুণকে যিনা (অবৈধ যৌনাচার বা ব্যভিচার)-র অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে সচেতন করেন।

www.pathagar.com

১২. ধারণাগত চিন্তা (Conceptual Thinking)

এ ধরনের চিন্তাশৈলীকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায় :

ক. ধারণাগত বিস্তৃতি

এর মধ্যে রয়েছে নতুন অবস্থার উপযোগীকরণের জন্য গঠন, প্রসারণ, বিস্তৃতকরণ, সংশোধন এবং ধারণাবিশোধন এবং এভাবে নতুন অর্থ তৈরিকরণ[৬৬]।

ইবাদত-এর ধারণা সীমাবদ্ধ ছিল ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান কার্যাদির এবং ধর্মীয় ভালো কাজের মধ্যে যার সম্পর্ক ছিল ইসলামের কেবল আধ্যাত্মিক দিকের সাথে। যেসব কাজ আল্লাহ তায়ালাকে খুশি করে তার সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে ইসলাম এসেছে এই শব্দটির অর্থ বিস্তৃত করতে। এর ধারণাকে প্রসারিত করা হয়েছে আধ্যাত্মিক মাত্রাকে উৎকর্ষিত করে অন্য নতুন মাত্রায় প্রবেশ করাতে। অভাবীকে সাহায্য করা, উম্মাহর কল্যাণে কাজ করা বা বৃহত্তর অর্থে মানবতার জন্য, অন্যদের শিক্ষাদান করা এবং পেশা পরিচালনা করা-সবই ইবাদতের রূপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে যা পুরস্কার দাবি করে। শর্ত এই যে তা করা হবে ভালো উদ্দেশ্যে এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য।

প্রশস্ততর অর্থ প্রদানের নিমিত্তে ইবাদতের অনেক প্রকরণ বিস্তৃত করা হয়েছে। মৌখিক প্রার্থনার অর্থ দু'আ করা বা মিনতি জানানো। ইসলাম প্রার্থনার সুপরিচিত পদ্ধতিসমূহের অর্থের বিস্তৃতি সাধন করেছে। যার মধ্যে দু'আ ছাড়া অন্যান্য আমলও রয়েছে। যেমন- তাকবীর দেওয়া, ঝুঁকা (রুকু), সিজদা ইত্যাদি।

শব্দগত অর্থে সিয়াম হচ্ছে কোনোকিছু হতে বিরত থাকা। ইসলাম এর নতুন অর্থ প্রদান করেছে, তা হলো খাওয়া, পান করা এবং যৌন সংযোগ ও এর সাথে সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপ থেকে রমাজান মাসে সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিরত থাকা। এ একই বিষয় বলা যেতে পারে বাধ্যতামূলক দান (যাকাত) তীর্থযাত্রা (হাজ্জ) এবং ইবাদতের অন্যান্য প্রকরণের ব্যাপারে।

---

[৬৬] Thomas B. Ward & Others সম্পাদিত Creativethought, American Psychology Association, Washington D.C. পৃষ্ঠা ১০।

www.pathagar.com

খ. ধারণাগত সংযোজন/সংমিশ্রণ

ধারণাগত সংমিশ্রণ বলতে দুটি ধারণাকে একত্রে সংযোজন করে একটি নতুন ভাবধারা বা অর্থ তৈরি করা বোঝায়। যেখানে একটি অস্তিত্বহীন ধারণা জন্মলাভ করে। এটা মৌলিক পদ্ধতিসমূহের অন্যতম যার ফল সৃজনশীল এবং ধারণাগত পরিবর্তন ও বিকাশের উৎস[৬৭]।

চিন্তার এই শৈলী সম্পর্কে কিছু আয়াত রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> এবং তোমরা সকলে সমবেতভাবে আল্লাহ তায়ালার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ো না (সুরা আলে ইমরান ৩ : ১০৩)।

এই আয়াতে ধারণাগত চিন্তাশৈলী রয়েছে যেখানে এটা হাব্‌লুল্লাহ বা আল্লাহ তায়ালার রজ্জুর ধারণা উদ্ধৃত করে। এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা সকল মুসলিমকে অনুপ্রাণিত করছেন আল্লাহ তায়ালার বন্ধনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার জন্য। এখানে হাব্‌লুল্লাহ বলতে ইসলাম বা কুরআনকে বোঝান হয়েছে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> ... তবে তাক্‌ওয়ার পোশাকই সর্বোৎকৃষ্ট (সুরা আরাফ ৭ : ২৬)।

এবং তিনি অন্য আয়াতে বলেন :

> আল্লাহ তায়ালা-সচেতনতাই (আত্মসংযম-তাক্‌ওয়া) সবকিছুর চেয়ে শ্রেষ্ঠ (সুরা বাকারা ২ : ১৯৭)।

এসব আয়াতে উদ্ধৃত আত-তাকওয়া নির্দেশ করে যে আল্লাহ তায়ালা ভীতির পোষাক মানবিয় নীতির চেয়ে উত্তম। এটা মানবিয় ধারণাকে প্রশস্ত করার জন্যও।

তৃতীয় একটি আয়াতে, 'তারা তোমাদের পোষাক এবং তোমরা তাদের' (সুরা বাকারা ২ : ১৮৭)।

এই আয়াতটি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের প্রতীকীকরণ করে এবং নির্দেশ করে যে, এ সম্পর্ক ভালোবাসা, গুণধারণ এবং একে অন্যের প্রতি সমর্থনের ভিত্তিতে হওয়া উচিত।

বার্ধক্যজনিত বয়স বর্ণনায় কুরআন স্থির করে,

> এবং আমার মাথা শুভ্রোজ্জ্বল হয়েছে বার্ধক্যে (সুরা মারইয়াম ১৯ : ৪)।

---

[৬৭] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬-৭।

www.pathagar.com

এখানে ব্যবহৃত আবরি শব্দটির আক্ষরিক অর্থ প্রজ্জ্বলিত যা সাধারণত আগুনের সাথে সংযুক্ত। এর দ্বারা দেখানো হয়েছে কতো দ্রুত সাদা চুল বাড়তে থাকে।

নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে আল-কুরআন অপূর্ব প্রাকৃতিক প্রপঞ্চের বর্ণনা দিয়েছে :

> এবং (শপথ) রাত্রির যা অন্ধকার হয়ে নেমে আসে এবং চন্দ্রের যা কোমলভাবে শ্বাস নেয় (সুরা ইনফিতার ৮২ : ১৭-১৮)।

এটা এমন বর্ণনা যেন রাত্রি ও চাঁদ জীবন্ত কিছু।

১৩. ইন্দ্রিয় চিন্তা (Intuitive Thinking)

মুসলিমদের আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত অন্তর্দৃষ্টি ও ইলহাম-এর সাথে এই চিন্তাশৈলী সম্পৃক্ত। এটা শুধু তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা তাদের যুক্তিবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তিকে ব্যবহার করে থাকে। তারা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক হেদায়েতপ্রাপ্ত ও প্রত্যাদিষ্ট। যার ফলে এ অন্তর্দৃষ্টি ও প্রেরণা এসে থাকে। এই শৈলীর সাথে সম্পর্কিত আল-কুরআনের কিছু আয়াত নিম্নরূপ :

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> সে উত্তরে বলল : আমি কোনো কিছু দর্শনে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিলাম যা তারা দেখতে সমর্থ ছিল না, সুতরাং আমি সেই সংবাদ বাহকের পদচিহ্ন হতে একমুষ্ঠি (ধুলা) নিয়েছিলাম এবং তা নিক্ষেপ করেছিলাম; আমার মন আমার জন্য এরূপ করা শোভন করেছিল (সুরা ত্বহা ২০ : ৯৬)।

এ আয়াতে সামিরী দাবি করেছিল সে কোনো কিছু দর্শনে অন্তর্দৃষ্টি প্রাপ্ত হয়েছিল যা অন্যরা দেখতে পায়নি। তাই সে যুক্তি দেখায় যে, সে সেই দূতের শিক্ষানুযায়ী কাজ করেছে ঐ অন্তর্দৃষ্টির কারণে যদিও সে ছিল সত্যপথ হতে বিচ্যুত।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> এবং অতএব, (যখন সে [মুসা] জন্মগ্রহণ করল), আমরা মুসা-জননীর অন্তরে ইঙ্গিতে নির্দেশ দান করলাম : তাকে (কিছু সময়ের জন্য) দুধ পান করাও এবং তারপর, যখন তুমি তার সম্পর্কে কোনো আশংকা করবে, তাকে নদীতে নিক্ষেপ করো এবং ভয় করো না, দুঃখও করো না, কারণ আমি একে তোমার নিকট ফিরিয়ে দেবো এবং আমাদের রসুলদের একজন করব (সুরা কাসাস ২৮ : ৭)।

www.pathagar.com

এ আয়াত অনুযায়ী, আল্লাহ তায়ালা মুসার মায়ের অন্তরে তাকে দুগ্ধ দান করতে ও ভয় পেলে তাকে নদীতে নিক্ষেপ করতে ইঙ্গিত করলেন। আল্লাহ তায়ালা তাকে নিশ্চয়তা দিলেন যে, তিনি মুসার প্রতি খেয়াল রাখবেন। এ অনুপ্রেরণা (ইঙ্গিত) মুসা-জননীকে শান্ত থাকতে সাহায্য করে। কারণ তাঁর অন্তর স্বজ্ঞামূলকভাবে আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক পরিচালিত হয়েছিল।

বিদ্বানগণ আল-কুরআনে বিভিন্ন প্রকার ওহির কথা বলে থাকেন, তার মধ্যে স্বজ্ঞা (ইলহাম) অন্যতম। স্বজ্ঞা বা ইন্দ্রিয়জ চিন্তা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সমন্বয় বলেও পরিচিত। পরেরটি নিম্নের আয়াত হতে গৃহীত :

> বলো, (হে মুহাম্মদ) : এই আমার পথ; আমি আল্লাহ তায়ালার দিকে আহ্বান জানাই নিশ্চিত জ্ঞান সহযোগে (বাসিরাহ), আমি এবং যারা আমার অনুসরণ করে ... (সুরা ইউসুফ ১২ : ১০৮)।

সঠিক বিষয় বলা বা করা, সঠিক সময়ে, সঠিক পথে, সঠিক ব্যক্তির সাথে-এভাবেই জ্ঞানকে সংজ্ঞায়িত করা যায়।

১৪. বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা (Scientific Thinking)

কুরআনের আলোকে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাশৈলী সেই শৈলীর ব্যঞ্জনা প্রকাশ করে যা দ্বারা কুরআন প্রকৃতি বিজ্ঞান সম্পর্কে মানুষের চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করে, যাতে তার মধ্যে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহ তায়ালার মহানত্ব উপলব্ধি ও স্বীকৃতি প্রদানের সামর্থ্য তৈরি হয় এবং পাশাপাশি এই চিন্তা দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যকে সামগ্রিকভাবে মানবতার কল্যাণে ব্যবহারের জন্য বিকাশ সাধন করা যায়।

কলমের প্রশংসা ও একে সমর্থ করে তোলা এবং জ্ঞান অর্জনকে সম্মান করা ছিল আল-কুরআনের প্রথমে প্রত্যাদিষ্ট আয়াতসমূহের অন্যতম। পরবর্তীতে নাযিলকৃত অন্যান্য আয়াতে ইসলাম প্রকৃতি অধ্যয়নে উৎসাহ দিয়েছে। তাছাড়া, আল-কুরআন সমুদ্র, পর্বতমালা, ভ্রূণের বিভিন্ন পর্যায় এবং বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পূর্বগামী কিছু নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক সত্য উল্লেখ করেছে, যাদের মধ্যে কিছু সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে, এসব আয়াত নাযিল হওয়ার এক হাজার চারশ বছরেরও বেশি সময় পরে। এটা সুনিশ্চিতভাবে কুরআনের বাণীর অলৌকিকত্ব প্রমাণ করে।

আকাশমণ্ডল সৃষ্টি সম্পর্কে কুরআন বলে,

www.pathagar.com

> অতঃপর আল্লাহ তায়ালা আকাশমণ্ডল (গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদি) সৃষ্টিতে মনঃ সংযোগ করেন, যখন সেগুলো ছিল ধুম্রবিশিষ্ট উপাদানমাত্র (সুরা ফুস্‌সিলাত : ১১)।

অন্য আয়াতে

> অবিশ্বাসীরা কি (ভেবে) দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী মিশে ছিল একত্রে (ওতপ্রোতভাবে) আমরা ওদেরকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার পূর্বে এবং প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি হতে? তবুও ওরা কেন (আল্লাহতে) ইমান আনবে না? (সুরা আম্বিয়া ২১ : ৩০)।

কুরআন প্রকৃতি রাজ্যের অন্যতম বিশাল রহস্য উন্মোচন করেছে : বিশাল বস্তু হতে গ্রহরাজি পৃথকীকরণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন, যারা অবিশ্বাস করে তারা কি জানে যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী একটি একক সামগ্রী হিসেবে একত্রে সংযুক্ত ছিল, পরে তাদেরকে আমরা বিচ্ছিন্ন করেছি? এবং আমরা প্রত্যেকটি প্রাণবিশিষ্ট জীবকে পানি হতে সৃষ্টি করেছি? এরপরও কি তারা বিশ্বাস করবে না? এবং আমরা পৃথিবীপৃষ্ঠে দৃঢ় পাহাড় পর্বত স্থাপন করেছি, যাতে তা (পৃথিবী) আন্দোলিত না হয়, এবং আমরা তার মধ্য দিয়ে প্রশস্ত পথ করে দিয়েছি অতিক্রান্ত হওয়ার জন্য যাতে তারা পথপ্রাপ্ত হয়। এবং আমরা আকাশকে করেছি ছাদ, নিরাপদ এবং সুপ্রহরাবিশিষ্ট। তার পরেও তারা এসব নিদর্শন (সূর্য, চন্দ্র, বায়ুপ্রবাহ, মেঘ ইত্যাদি) হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

> এবং তিনিই যিনি সৃষ্টি করেছেন রাত্রিকে এবং দিবসকে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করছে (সুরা আম্বিয়া ২১ : ৩০-৩৩)।

আল-কুরআন সেই উপাদানের বর্ণনা দেয় যা প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুকে তার নির্ধারিত পথে ধরে রাখে এভাবে :

> আল্লাহ তায়ালাই ঊর্ধ্বদেশে আকাশমণ্ডলী স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত এবং অতঃপর সমাসীন হলেন আরশোপরি। এবং তিনি নিয়মাধীন করলেন সূর্য ও চন্দ্রকে; প্রত্যেকে নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত আবর্তন করে। এভাবে আল্লাহ তায়ালা মহাবিশ্বের সমস্ত বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং তাঁর নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন। যাতে তোমরা (কিয়ামত দিবসে) তোমাদের প্রভুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পারো (সুরা আর রা'দ ১৩ : ২)।

www.pathagar.com

আল-কুরআন পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ ঘূর্ণনের কথা বলে :

> তুমি পর্বতমালা দেখে একে অচল ও কঠিন মনে করছো। কিন্তু তাদের অভ্যন্তরে গতি রয়েছে, যেমন মেঘের গতি। এই গতি আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি। তিনি সবকিছুকে নিপুণ সুষমা দান করেছেন এবং তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবহিত (সুরা নামল ২৭ : ৮৮)।

মূর্খতার অন্ধকার যুগে, কুরআন পৃথিবীর গতি সংক্রান্ত কিছু বিষয় অবতীর্ণ করে এবং পর্বতমালার কিছু বিষয়, এভাবে বর্ণনার মাধ্যমে :

> আমি কি করিনি ভূমিকে শয্যা এবং পর্বতসমূহকে পেরেক? (সুরা নাবা ৭৮ : ৬, ৭)

> এবং তিনিই পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা এর অসম গতিকে প্রতিরোধ করার জন্য (সুরা লোকমান ৩১ : ১০)।

মানব সৃষ্টি হচ্ছে বিজ্ঞানের আরেকটি গবেষণার বিষয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও, তবে (অনুধাবন করো) আমরা তোমাদেরকে (অর্থাৎ আদমকে) সৃষ্টি করেছি মাটি হতে। তারপর শুক্র (মিশ্রিত বিন্দু) হতে, তারপর আলাকা (রক্তবিন্দু) হতে, তারপর ক্ষুদ্র গোশতপিণ্ড হতে-পূর্ণাকৃতি কিংবা অপূর্ণাকৃতি (যা গর্ভপাতে হয়ে থাকে)-যাতে তোমাদের নিকট স্পষ্ট করা যায়। আমি যা ইচ্ছা করি তা এক নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি, তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে প্রত্যাবৃত্ত করা হয় হীনতম বয়সে, ফলে ওরা যা কিছু জানত সে সম্বন্ধে আর সজ্ঞান থাকে না। তোমরা ভূমিকে দেখ পতিত, কিন্তু যখন আমি ওর ওপর পানি বর্ষণ করি (অর্থাৎ বৃষ্টি) তখন তা শস্যশ্যামলা হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্‌গত করে সবধরনের নয়নাভিরাম উদ্ভিদ। এটা এজন্য যে, আল্লাহ তায়ালা তিনি সত্য, এবং এ তিনিই যিনি জীবন দান করেন মৃতকে, এবং তিনিই যিনি সবকিছু করার শক্তি রাখেন। এবং অবশ্যম্ভাবীরূপে সেই মহাক্ষণ আসছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই; এবং অবশ্যই যারা কবরে রয়েছে তাদেরকে আল্লাহ তায়ালা পুনরুত্থিত করবেন (সুরা হাজ্জ ২২ : ৫-৭)।

www.pathagar.com

সূরা আল-মুমিনূন এর ১২-১৯ আয়াতেও মানব জাতির সৃষ্টি সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত ঘোষণার তৃতীয় উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে কিভাবে প্রাকৃতিক দুগ্ধ তৈরি হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কুরআন পশুর মধ্যে দুগ্ধ সঞ্চারিত হওয়ার জন্য যেসব উপাদান বর্ণনা করে, আধুনিক বিজ্ঞান তার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> অবশ্যই পশু ও জীবজন্তুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় সত্যতা রয়েছে। ওদের শরীরে ধারণকৃত বস্তু হতে নিঃসৃত বিশুদ্ধ দুধ তোমাদের পান করাই, যা আসে তাদের নাড়িভুঁড়ি ও রক্ত হতে। তারপর এটা তাদের পানের জন্য সহজ করে দিই যারা তা পান করে (সূরা নাহল ১৬ : ৬৬)।

মরিস বুকাইলি বলেন, বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ হতে এই আয়াতের অর্থ অনুধাবন করতে হলে মনস্তাত্ত্বিক ধারণাসমূহকে বিবেচনা করতে হবে[৬৮]। অতঃপর কিছু বিশদ বর্ণনার পর উপসংহারে তিনি বলেন, এখানে যে প্রাথমিক পদ্ধতি যা প্রতিটি বিষয় বা বস্তুকে গতিময় রাখে, তা হলো অন্ত্র ও রক্তের উপাদানগুলোকে এর নিজস্ব দেওয়ালের একটা স্তর পর্যন্ত একত্রে আনয়ন করা। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এই ধারণা হচ্ছে পরিপাক ব্যবস্থা সম্বন্ধে রসায়ন ও দেহতত্ত্বের আবিষ্কারের ফল। নবি সা.-এর যুগে এটা পুরোপুরি অজানা ছিল যা কেবল সাম্প্রতিককালে বোঝা সম্ভব হয়েছে[৬৯]।

লিঙ্গ সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য কী?

কুরআনুল কারীম উদ্ভিদের রাজত্বে লিঙ্গনীতি স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করে, একই সাথে উদ্ভিদের পুরুষ ও রমণী জীবজাতের অস্তিত্ব বিষয়ও, যা কিছু সাম্প্রতিক সময় পর্যন্তও অজানা ছিল। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> তারা কি জমীনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না? সেখানে আমি প্রত্যেক প্রকার উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায় (সূরা আশ-শুআরা ২৬ : ৭)।
>
> আমরা আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষাই এবং তাতে জন্মে থাকে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ জোড়ায় জোড়ায় (সূরা ত্বহা ২০ : ৭)।

---

[৬৮] The Bible, the Qur'an and Sciencet North Americantrust Publication, Indiana, USA, 1979, P. 196.

[৬৯] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৯৭।

www.pathagar.com

> পবিত্র ও মহান তিনি (আল্লাহ তায়ালা) যিনি প্রত্যেক প্রজাতিকে সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়-উদ্ভিদ, মানুষ এবং অন্যান্য ধরনের সৃষ্টি যা তোমাদের অজানা (সুরা ইয়াসীন ৩৬ : ৩৬)।

মানুষের মধ্যে, পশু ও উদ্ভিদের মধ্যে দুই লিঙ্গ সম্পর্কিত নিয়মনীতি উপস্থাপনের পর কুরআন সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব ধারণকারী বিধি-বিধান বিশদ আলোচনা করেছে।

> আমরা সমস্ত কিছুর জোড়া সৃষ্টি করেছি যাতে তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করতে পারো (সুরা যারিয়াত ৫১ : ৪৯)।

কুরআন পর্যায়ক্রমে উদ্ভিদ জন্মানোর প্রক্রিয়া সংক্রান্ত ঘটনা বর্ণনা করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> পৃথিবীর দিকে তাকাও : প্রথমে এটি শুষ্ক ও উদ্ভিদ উৎপাদনের অনুপযোগী থাকে, অতঃপর আমরা এর ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করি এবং তা শস্য-শ্যামলা হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ (সুরা হাজ্জ ২২ : ৫)।

উদ্ভিদ উদ্‌গত হওয়ার ব্যাপারে কুরআন আরেকটি উপাদানের ভূমিকা ও প্রকারের কথাও উল্লেখ করে, তা হলো বায়ু।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> আমি প্রেরণ করি বায়ু গর্ভসঞ্চার ও ফলবতী করার উপাদান হিসেবে, তারপর পাঠাই বৃষ্টি আকাশ হতে (সুরা হিজর ১৫ : ২২)।

আমরা দেখতে পাই যে, ওপরের আয়াতসমূহে বাতাসের দ্বারা সম্পাদিত দুটো কাজের বিষয় প্রত্যাদেশ করা হয়েছে। গর্ভসঞ্চার ও ফলবতী করা ছাড়াও বাতাস মেঘমালা আনয়নে বড় ভূমিকা পালন করে, যা পর্যায়ক্রমে নিয়ে আসে বৃষ্টিকে।

১৫. আকাঙ্ক্ষা/অভিলাষপূর্ণ চিন্তা (Wishful Thinking)

সত্যে পরিণত হওয়া নিশ্চিতভাবেই সম্ভব নয় এমন বিষয়ে ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষা করাই হচ্ছে অভিলাষপূর্ণ চিন্তার সংজ্ঞা[৭০]। কুরআন বিভিন্নভাবে এই চিন্তনশৈলী ব্যবহার করেছে।

---

[৭০] De Bono : Serious Creativity.

www.pathagar.com

ক. বিচার দিবসে অবিশ্বাসীদের চূড়ান্ত দুর্দশা ও পরিতাপ দেখাবার উদ্দেশে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

যারা সত্য অস্বীকারে অবিচলিত ছিল এবং রসুলের কথার প্রতি কোনো প্রকার কর্তপাত করেনি, তারা সেদিন কামনা করবে, যদি তারা মাটির সাথে মিশে যেত (সুরা নিসা ৪ : ৪২)!

এবং তারা যারা (তাদের পার্থিব জীবনে) সত্য প্রত্যাখ্যানে ছিল অবিচলিত, তারা আর্তস্বরে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! যেসব জিন্ন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল তাদের উভয়কে দেখিয়ে দিন, আমরা উভয়কে পদদলিত করব, যাতে তারা হয় সকলের মধ্যে হীনতম (সুরা ফুস্‌সিলাত ৪১ : ২৯)।

খ. কল্যাণের উৎকর্ষ সাধান, যেমন অভাবীকে সাহায্য করা, একথা বলে যে, যদিকোন ব্যক্তি এমন না করে তাহলে সে মৃত্যুর সময় ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হবে এবং (এখন) সে ইচ্ছা করবে যেন তাকে ভাল কাজ করার জন্য আরো সময় দেয়া হয়। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালা বলেন,

"এবং আমি তোমাদেরকে যে রিয্‌ক দিয়েছি তোমরা তা হতে ব্যয় করবে তোমাদের কারো মৃত্যু আসার পূর্বে; অন্যথায় মৃত্যুসময় কারো ঘনিয়ে এলে তখন সে বলবে, 'হে আমার প্রভু! আমাকে আরো কিছুকাল অবকাশ দিলে আমি দানসাদকা করতাম এবং সৎকর্মশীলদে অন্তর্ভুক্ত হতাম!" (সুরা মুনাফিকুন ৬৩ : ১০)

গ. নির্দিষ্ট ধরনের কিছু লোকের অভিলাষী চিন্তা (যেমন- ইহুদিদের), তাদের অন্যদের চেয়ে বেশিদিন বাঁচার আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

তুমি নিশ্চয়ই তাদেরকে দেখবে জীবনের প্রতি যে কোনো লোক, এমনকি যারা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্যের ওপর দেবত্ব আরোপ করে (অর্থাৎ মুশরিক) তাদের চেয়েও লোভী। তাদের প্রত্যেকে হাজার বছর বাঁচার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। কিন্তু দীর্ঘ আয়ু তাদেরকে (পরকালীন জীবনের) শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারবে না। কারণ তারা যা করে আল্লাহ তায়ালা সেসবের দ্রষ্টা (সুরা বাকারা ২ : ৯৬)।

www.pathagar.com

উপসংহার

এটি পরিষ্কার যে কুরআনী চিন্তাশৈলী যা কখনও কখনও কৌতূহলী শৈলীতে পুনরাবৃত্ত বলে বোধ হতে পারে, একই সময়ে প্রকল্পিতও হতে পারে। এটি কুরআনের আরেকটি মহান বৈশিষ্ট্য যে, একই আয়াতে একই সাথে একাধিক শৈলী ব্যবহার করতে পারে। প্রথম দর্শনে এটাকে অধিক্রমণ মনে হতে পারে, কিন্তু বিষয় তা নয়।

এগুলো কুরআনে ব্যবহৃত কতকগুলো চিন্তনশৈলী যা আমি এভাবে আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছি। আমি নিশ্চিত ও আস্থাশীল যে, আরো অনেক রয়ে গেছে। এবং আমি বিশ্বাস করি যে, এই অধ্যায়টি অন্যান্য গবেষকদেরকে অধিক সংখ্যক উদ্ভাবনে উৎসাহিত করবে।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

আল-ইজতিহাদ এবং সৃজনশীলতার উদ্যোগ গ্রহণে এর ভূমিকা

সূচনা

আল-ইজতিহাদ ও সৃজনশীলতার ওপর আলোচনা, পরেরটি সম্বন্ধে উদ্যোগ গ্রহণে পূর্বেরটির ভূমিকা, প্রথমেই একজন গবেষকের কাছ থেকে আল-ইজতিহাদ ও সৃজনশীলতার অর্থ বুঝবার দাবি রাখে তাদের সম্পর্ক অথবা আন্তঃসম্পর্ক কিংবা সামঞ্জস্য উপলব্ধি করার প্রয়োজনে। পাশ্চাত্য যদি বৃহত্তরভাবে একটি বিজ্ঞান কিংবা বর্তমান সময়ে সমাজকে উদ্বুদ্ধকরণের হাতিয়ার হিসেবে সৃজনশীলতা বিষয়ে সাধারণ তত্ত্ব উপস্থাপন করে থাকে, তারা তা করেছে (তত্ত্বটিকে তৈরি করেছে) এর উপস্থত্বগত মাত্রা হতে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর নীতিগত বা মূল্যবোধ-ভিত্তিক মাত্রার প্রতি খেয়াল না রেখে। অন্যদিকে, আমাদের সত্যিকার ইসলামি বিশ্বাস সৃজনশীলতা বা সৃজনশীল ইজতিহাদকে শরিয়াহর প্রেক্ষাপট হতে দেখে থাকে, যা সৃজনশীলতার মাত্রাকে এর উপস্থত্বগত মাত্রার ওপর স্থান দেয়। ইসলাম সৃজনশীলতা বা কর্মদক্ষতাকে এবং এর পূর্ণাঙ্গতা বা আইনগত ইজতিহাদকে মুসলিমের জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছে। আল-কুরআন এমন গুরুত্বপূর্ণ আয়াতে পূর্ণ যা ঘটনাবলীর ব্যবস্থাপনায় সৃজনশীলতা, কর্মের পূর্ণতা অর্জন এবং উৎকর্ষ সাধনে ইজতিহাদের কথা বলে। একজনকে (একজন মুসলিমকে) কথায় ও কাজে সৃজনশীলতার পথে উদ্বুদ্ধ করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> তিনি মৃত্যু ও জীবনকে সৃষ্টি করেছেন এটা দেখে নেওয়ার জন্য যে, তোমাদের মধ্যে কর্মে কে শ্রেষ্ঠ (সুরা মুলক ৬৭ : ২)।

আল-ফুযাইল ইবনে আয়ায 'কর্মে শ্রেষ্ঠ' শব্দাবলীর অর্থ করেছেন অতি আন্তরিক ও সঠিক কর্ম হিসেবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> আমার বান্দাদের তা-ই বলতে বলো যা সর্বোত্তম ... (আল-ইসরা ১৭ : ৫৩)।
>
> মানুষের সাথে সুন্দর (সর্বশ্রেষ্ঠ) কথা বলবে ... (সুরা বাকারা ২ : ৮৩)।

আল্লাহ তায়ালা মুসা আ. কে নির্দেশ দিয়ে বলেন,

www.pathagar.com

> ... এগুলোকে নাও এবং শক্তভাবে ধরো এবং তোমাদের সম্প্রদায়কে তা গ্রহণ করতে নির্দেশ দাও যা ওর মধ্যে সর্বোত্তম (সুরা আ'রাফ ৭ : ১৪৫)

> তোমরা উত্তম পন্থা ব্যতীত আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্ক করো না (আন-আনকাবূত : ৪৬)।

সন্দেহ নেই, আল-ইহসান (সর্বোত্তম) শব্দটির সর্বোচ্চ অর্থ হচ্ছে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে বিষয়াদি ব্যবস্থাপনার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা এবং কোনো ঘটনার ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে সর্বোত্তম সমাধান অন্বেষণ করা। এটি সৃজনশীলতার একটি ধরন।

অন্যদিকে, ইসলাম প্রত্যেক কাজে ইজতিহাদ, জিহাদ ও সাধনার প্রতিফলকে মানুষের জন্য জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহীয়ানের হিদায়াত হিসেবে বিবেচনা করে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> এবং যারা আমার জন্য সংগ্রাম করে আমি তাদেরকে অবশ্যই আমার পথে পরিচালিত করব (আল-আনকাবুত : ৬৯)।

এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল, এই ইঙ্গিতসহ যে, এই প্রেক্ষিতে জিহাদ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমাদের জীবনের সকল পর্যায়ে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া, যা আল্লাহ তায়ালার বাণী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত,

> বলো, নিশ্চয়ই আমার সালাত ও আমার কুরবানী, আমার জীবন এবং আমার মরণ সবই মহাবিশ্বের রব আল্লাহ তায়ালার জন্য। তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আমি এজন্য আদিষ্ট হয়েছি এবং আমি মুসলিমদের (তাঁর ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণকারী) মধ্যে প্রথম (আল-আন'আম : ১৬২-১৬৩)।

এ অধ্যায়ের প্রতিপাদ্য হচ্ছে সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে ইজতিহাদের ভূমিকা পরীক্ষা করা। সংস্কারবাদ (তাজদীদ), উত্তম অভিযোজন এবং দক্ষতা দ্বারা পরিবর্তনশীল বাস্তবতা মোকাবেলায় সৃজনশীলতার সমকালীন অথবা ইজতিহাদ এর অগ্রগামী ধারণার একই অর্থ রয়েছে কিনা সেটাও অনুসন্ধান করা হবে।

আল-ইজতিহাদ এর আক্ষরিক অর্থ

আল-ইজতিহাদের আক্ষরিক অর্থ সৃজনশীলতা (ইফতি'আল) যা কায়ক্লেশ অথবা সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা (আল-জুহদ/আল-জাহদ) বোঝায়। তারা বলে আল-জুহদ হচ্ছে কঠিন পরিশ্রম (আল-মুশাক্কাহ), যা দ্বারা সামর্থ্য (আল-তাকাহ)ও বোঝায়।

www.pathagar.com

এভাবে আল-ইজতিহাদ আল-জুহদ হতে উৎপন্ন, অর্থ কায়ক্লেশ ও সামর্থ্য। তাই, আল-ইজতিহাদ কোনো উৎপাদিত বস্তুতে উৎপাদনের পরিশ্রম দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। ইবনে ফারিস বলেন, জুহদ এর উৎপত্তি (মূলশব্দ জিম-হা-দাল) গত অর্থ কায়ক্লেশ এর প্রকৃতি-প্রত্যয়সহ। তারা বলে, জাহাদতু নাফসি ওয়া আজহাদতু (আমি আমার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়েছি/কঠিনতম পরিশ্রম করেছি)। এখানে আল-জুহদ এর অর্থ সামর্থ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন, যারা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী প্রদান করে[৭১]। তারা বলে আল-মাজহুদ হচ্ছে অতিশয় কঠিন কাজ এবং সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা।

আল-শামাখ বলেন, সে আত্মত্যাগ করে যখন সতীনেরা উত্তম সুস্বাদু মিষ্টি পরিবেশন করে কোনো কষ্ট স্বীকার ছাড়াই (মাজহুদ) নিশ্চিত হতে সমর্থ হয়।

অন্য যেসব শব্দ এ বিষয় কিংবা আল-জিহাদ অধ্যায়ের নিকটতর সেগুলো হচ্ছে : শক্ত মাটি, অমুক এবং অমুক খাদ্যের জন্য সংগ্রাম করছে, অর্থাৎ সে অতিরিক্ত খাবার দ্বারা অত্যধিক বোঝাভারাক্রান্ত, লোভী সংগ্রামী ও কঠিন পরিশ্রমী মেষপালক; সে সম্পদের জন্য ভোগের জন্য সংগ্রাম করেছে এবং এভাবে তা ভোগ করেছে[৭২]।

আল-রাগিব আল-ইস্পাহানী বলেন, আল-জুহদ ও আল-জাহদ সামর্থ্য (আল-তাকাহ) এবং কঠিন পরিশ্রম (আল-মাশাক্কাহ) এর দিকে ইঙ্গিত করে। এক্ষেত্রে, আল-ইজতিহাদ হচ্ছে সংগ্রামে টিকে থাকার জন্য কারো সামর্থ্যকে কাজে লাগানো। তারা বলে, আমি আমার মতকে কাজে লাগিয়েছি (জাহাদতু রা'ঈ), অর্থাৎ আমি এটাকে আমার আদর্শের সাথে মিশিয়েছি[৭৩]।

আল-ইজতিহাদ এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে গভীর চিন্তার পদ্ধতি যা মুজতাহিদকে (গবেষক বা আইনজ্ঞ) বা সৃজনশীল ব্যক্তিকে কোনো ঘটনা নিয়ন্ত্রণে সচেতন করে। এ অর্থ আল-জাসাস'র বক্তব্যকে দৃঢ় করে যে আল-জিহাদ হচ্ছে কারো গবেষণা সামর্থ্য দ্বারা সবকিছু করা এবং ব্যবহৃত প্রচেষ্টার চেয়ে কঠিন পরিশ্রমকে বেশি করে উপলব্ধি করা। তার চেয়ে বরং ব্যবহৃত প্রচেষ্টার উর্ধ্বে যাওয়ার অসম্ভাব্যতাকে উপলব্ধি করা সেই সীমা পর্যন্ত যা আল্লাহ তায়ালার বক্তব্যে স্থিরীকৃত, আল্লাহ তায়ালা কারো ওপর তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপান না (সুরা বাকারা ২ : ২৮৬)।

---

৭১ আত তাওবা : ৭৯

৭২ দেখুন Ibn Faris, Abu al-Hassan, Mujam Maqayis Al-Lughah Vol. 3 ed. 'Abu Al-Salam Muhammed Harun, ১ম সংস্করণ (বৈরুত : দার আল-জাইল, ১৯৯১) পৃষ্ঠা ৪৮৬-৪৮৭।

৭৩ আল-রাগিব আল-ইস্পাহানী, Mufrahat : Ghartib al-Qur'an Al-Karim পৃষ্ঠা ৩৪৮।

www.pathagar.com

তাই সে তার নিজ মতো ও আদর্শের নির্যাসকে কাজে লাগায় ঐ বিষয়ের ওপর যা ঐ দুগ্ধের মতো যা থেকে মাখন বের করা হয়। সে সুন্দরভাবে তার ভাব ও এর পক্ষে যুক্তি এবং তার মতামত যথাযথ প্রেক্ষিতে পেশ করতে পারে।

গ্রন্থকারের মতে, আল-ইজতিহাদের আক্ষরিক অর্থ সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলেও আধুনিক সৃজনশীলতার অর্থের কাছাকাছি। আল-ইজতিহাদের প্রায়োগিক অর্থ উপস্থাপনে এই নৈকট্য বা সামঞ্জস্য অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়াবে যদিও তা হবে আল-ফিকহ'র অধিকাংশ ক্ষেত্রে।

আল-ইজতিহাদের প্রায়োগিক অর্থ

ইবনে কাইয়্যিম আল-জাওয়িইয়াহ (মৃত্যু : ৭৫১ হিজরি)

তিনি আল-ইজতিহাদকে সংজ্ঞায়িত করেন এই বলে যে, সত্যিকার দৃষ্টিভঙ্গি লাভের চেষ্টায় দীর্ঘ চিন্তনের পর হৃদয় যা সিদ্ধান্ত নেয়[৭৪]। এই সংজ্ঞা প্রত্যেক ইজতিহাদের ক্ষেত্রে বিষয় বা প্রাপ্ত ইস্যু অধ্যয়নে যথার্থতা লাভের জন্য ইস্যুর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল দিককে আমলে নেওয়ার শর্ত আরোপ করে। এই সংজ্ঞা যথার্থতা অন্বেষণে সত্যবাদিতা, আন্তরিকতা এবং আত্মার শুদ্ধতাও দাবি করে। তাই প্রকারান্তরে যা দাবি করা হচ্ছে তা হলো যথার্থতা, এছাড়া কিছু নয়।

আহমাদ ইবনে আলী আল-রাযী, সাধারণ্যে আল-জাস্‌সাস নামে পরিচিত (মৃত্যু ৩৭০ হিজরি)।

মুজতাহিদ (আইনবিদ)-এর অধ্যয়নের ক্ষেত্রে তার উদ্দেশ্য পূরণের প্রতিটি প্রয়াসই ইজতিহাদ। তবে, আল-জাসসাস আল-ইজতিহাদকে এক প্রকার প্রথা (উরফ) হিসেবে গণ্য করেছেন যাতে ঘটনা বিষয়ক নির্দেশনার ক্ষেত্রে কোনো প্রত্যক্ষ ওহির সাক্ষ্য নেই। এসব নির্দেশনা সাধারণ জ্ঞানের সাথে যুক্ত। এটা এ কারণে যে, প্রথাগতভাবে এবং বিদ্বানগণের ঐতিহ্য অনুযায়ী, ইজতিহাদকে ব্যক্তির ব্যক্তিগত মতামত বা তার ইজতিহাদের রায় হিসেবে গণ্য করা হয়[৭৫]।

---

৭৪ ইব্‌ন কাইয়্যিম আল-জাওযিইয়াহ, ই'লাম আল-মুওয়াক্কিয়ীন 'আন রাব্ব আল-'আলামীন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৬।

৭৫ আহমাদ ইবনে আলী আল-রাযী আল জাসসাস, উসুল আল-ফিকহ, যা আল-ফুসূল ফী আল-উসুল নামে পরিচিত, খণ্ড ৪, সম্পাদনায় আজিল জসিম আল-নাশমী, ২য় সংস্করণ (কুয়েত : উইজারাহ আল-আওকাফ ওয়া আল-শু'উন আল-ইসলামিয়াহ, ১৯৯৪) পৃ-১০।

www.pathagar.com

আল-জাসসাস পরে আল-ইজতিহাদকে এর প্রকরণের ভিত্তিতে সংজ্ঞায়িত করেছেন, এই বলে যে, শরিয়াতে আল-ইজতিহাদ'র তিনটি অর্থ রয়েছে :

প্রথমত : আইনগত অনুসিদ্ধান্ত (আল-কিয়াস আল-শুর'ত), অবরোহিত ত্রুটিপূর্ণ কারণের ভিত্তিতে (ইল্লাহ) মূলগ্রন্থেও এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। মূল বিষয় (আল-আসল) হতে সহায়ক বিষয়ে (আল-ফার) নির্দেশনা বর্ধিতকরণের ক্ষেত্রে ইল্লাহ ব্যবহার করা হয়। এটাই ইজতিহাদের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে-যদিও এটা প্রকৃতপক্ষে কিয়াস বিষয়ে সংশ্লিষ্ট। এটার কারণ হলো, নির্দেশনার অনুপস্থিতিতে ইল্লাহ এর উপস্থিতি প্রমাণে বাধ্য নয়; এবং প্রতিষ্ঠার একটি পদ্ধতি হিসেবে ইল্লাহ হচ্ছে একটি ইজতিহাদের সংকেত, প্রধানত মতামত–ভিত্তিক, এজন্য যে (নির্দেশনা বর্ধিতকরণের) বিজ্ঞান অজানা বিষয় (ইল্লাহ)-এর অধীনও নয়। এক্ষেত্রে ঐ বিজ্ঞানের পদ্ধতিই ইজতিহাদ।

দ্বিতীয়ত : আল-ইজতিহাদ তাই যা মতামত দ্বারা সাব্যস্ত করা হয়, ইল্লাহ এর সাহায্য ছাড়াই যা মূল বিষয়কে সহায়ক বিষয়ে বর্ধিতকরণের নির্দেশনার জন্য প্রয়োজন, যেমন- দূরবর্তী কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কা'বার দিক নিশ্চিতকরণের জন্য ইজতিহাদ ব্যবহৃত হয়।

তৃতীয়ত : ইজতিহাদ হচ্ছে একটি ব্যবহারশাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত[৭৬]। ওপরের সংজ্ঞা এই নির্দেশনা দেয় যে, ইজতিহাদ আল-ফিকহর ক্ষেত্রেও ইস্যুর বাহ্যিক অবস্থার ওপর হতে কিয়াস ব্যবহার পর্যন্ত বর্ধিত করা যায়। এটি একটি জটিল মানসিক প্রক্রিয়া এবং ব্যক্তিগত কিংবা অন্য ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা পর্যন্ত প্রয়োগযোগ্য, যেমন- আল-কা'বার দিক নিশ্চিতকরণ, ক্ষতি ও ভ্রুণের মূল্য নির্ধারণ ইত্যাদি। বরং এই সংজ্ঞা গতানুগতিক নীতিনির্ভর যা সুস্থ মনের কোনো ব্যক্তি কর্তৃক খণ্ডন করা যাবে না।

আল-কাযী আবদ আল-জাব্বার (মৃত্যু-৪১৫ হিজরি) এবং আবু আল-হুসাইন আল-বাসরী (মৃত্যু : ৪৩৬ হিজরি)

তাঁর শিক্ষকের পুস্তকের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে আবু আল-হুসাইন আল-বাসরী মু'তাযিলী বলেন, আল-ইজতিহাদ হচ্ছে শরিয়াতের মূলগ্রন্থগত নির্দেশ প্রতিষ্ঠার

---

[৭৬] আল-জাস্‌সাস, আবু বকর আল-রাযী, al-Fusuil Fi al-Usul, প্রাগুক্ত, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১০-১১।

www.pathagar.com

একটি পদ্ধতি, ঐ প্রকারের নির্দেশ যা মতপার্থক্য অনুমোদন করে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করে। এ সংজ্ঞা আমাদের শিক্ষকদের উত্তরাধিকারীদের মীরাস এবং তখন থেকেই ফিক্‌হ (মাযাহিব)-এর সকল ঘরানা কর্তৃক ধারণকৃত যারা আল-ইজতিহাদ নিয়ে আলোচনা করেছে[৭৭]।

এ সংজ্ঞা মুজতাহিদ (আইনশাস্ত্রবিদ)কে মূল্য দেয়, তার ইজতিহাদের পূর্বে নবি সা.-এর হাদিসের সাথে সঙ্গতি রেখে, যদি বিচারক/শাসক ইজতিহাদ করেন এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন-আপাতভাবে কিংবা শরিয়াহর নির্দেশে (প্রতিষ্ঠা করে); কিংবা তার ইজতিহাদের পর, যেখানে তাকে মাফ করা হয়, বরং পুরস্কৃত করা হয়। এটি হচ্ছে ইজতিহাদ ও সৃজনশীলতার জন্য উদ্বুদ্ধকরণের নির্যাস, যা সত্যিকার ইসলামি আকীদার পক্ষে কাজ করে।

আবু ইয়া'লা-আল-'উকবুরী আল-হাম্বলী (মৃত্যু : ৪২৮ হিজরি)

আবু ইয়া'লার মতে, ইজতিহাদ হচ্ছে লক্ষ্য অর্জনের প্রয়াসে নিবেদিত হওয়া[৭৮]।

ইমাম আল-হারামাঈন তাঁর লেখায় ইজতিহাদকে লক্ষ্য অর্জনের পথে সচেষ্ট আত্ম নিবেদন বলে সংজ্ঞায়িত করেছেন[৭৯]।

আল-মাওয়ার্দী (মৃত্যু : ৪৫০ হিজরি)

তিনি বলেন, আল-ইজতিহাদ হচ্ছে নিদর্শনের ভিত্তিতে (আল-ইমারাত) ন্যায়ের জন্য প্রচেষ্টা যা এর দিকে (ইমারাতের দিকে) চালিত করে[৮০]।

কোনো ঘটনার নির্দেশনার ক্ষেত্রে ইসলাম এটা আবশ্য পালনীয় করেছে যে, লক্ষ্য ও ন্যায়ের সত্যবাদিতা নিশ্চিন্তকরণে অশেষ সাবধানতা অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে। পূর্ববর্তী নির্দেশনা প্রতিপালনের জন্য নয়। ইসলাম পরিপূর্ণ সৃজনশীল

---

৭৭ দেখুন আবু আল-হুসাইন আল-বাসরীকৃত শারহ আল-'আমদ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৭৩।

৭৮ আল-আকবরী, আবু বকর, রিসালা ফী ইলম উসূল আল-ফিকহ, মুওয়াফফাক ইবনে আবদুল্লাহ সম্পাদিত (রিয়াদ : আল-মাকতাবা আল-মাককিইয়াহ ওয়া আল-মাকতাবা আল-বাগদাদিইয়া), পৃষ্ঠা ৭৮-৮০।

৭৯ আল-জুওয়াইনী ইমাম আল-হারামাঈন, আল-ওয়ারাকাত ফী উসূল আল-ফিকহ, সম্পাদনায় : আবদ্ আল-লতীফ মুহাম্মদ আল-আবদ (দার আল-নাশর, n.d.), পৃষ্ঠা ৩০।

আরো দেখুন, ফাওকিইয়াহ হুসাইন মাহমুদ সম্পাদিত আল-কিফায়া ফী আল-জাদাল (কায়রো : মাত বা'আহ আল-বাবী আল-হালাবী ওয়া শুরাকা'উহু, ১৯৭৯), পৃষ্ঠা ৫৮।

৮০ আল-মাওয়ার্দী, আদাক আল-কাযী, পৃষ্ঠা ৪৮৯।

www.pathagar.com

ইজতিহাদের পরিবেশও দাবি করে, সর্বোত্তমটি বাছাই এবং সর্বোত্তম নিদর্শন (আল ইমারাত) পরীক্ষণের মাধ্যমে, যা ঘটনাপ্রবাহের নির্দেশনা প্রতিষ্ঠায় সমাধানের দিকে পরিচালিত করে। আল-ইমারাত শব্দটি মতামতের নির্দেশক যা প্রত্যেক নতুন ইজতিহাদের জন্য একটি অভিন্ন কিংবা এমনকি আরো উত্তম ইমারাত আবিষ্কার করার সুযোগ সৃষ্টি করে।

ইব্ন হাযম আল-যাহিরী (মৃত্যু : ৪৫৬ হিজরি)

কোনো ঘটনা ঘটতে দেখলে সে ব্যাপারে নির্দেশ অন্বেষণে সামর্থ্য কাজে লাগানকে[৮১] তিনি আল ইজতিহাদ বলে অভিহিত করেছেন। তাছাড়া আইন বিশারদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ইবনে হায্ম বলেন, আল-ইজতিহাদ হচ্ছে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া এবং সত্যানুসন্ধানে প্রয়োজনমত সামর্থ্যকে কাজে লাগানো[৮২]। তাফসীর আল-ফায তাজরী বাইনা আল-মুতাকাল্লিমীন ফী আল-উইছুল নামক গবেষণা প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, সত্য অনুসন্ধানে আল-ইজতিহাদ হচ্ছে চূড়ান্ত প্রয়াস নিবেদন করা এবং যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই এ সত্য অনুসন্ধানে নিজেকে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে হলেও নিবেদিত করা[৮৩]।

ইসলাম ঘটনাসংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো প্রকার পূর্বকৃত নির্দেশ প্রদানকে বাতিল করে দেয়, যাকে ইবনে হায্ম মুজতাহিদ বা সৃজনশীল ব্যক্তির সাথে সংঘাতমূলক ঘটনা বলে অভিহিত করেছেন। নিজেকে অতিনিবেদন না করে নির্দেশ তৈরিকেও এ নিষেধ করে। এটা রসুল (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)-এর হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত যা তায়াম্মুম (পরিষ্কার মাটি দ্বারা পবিত্র হওয়া) সম্বন্ধে তাঁর একজন সাহাবির সাথে সম্পর্কিত। কোনো কোনো সাহাবি ঘোষণা করেন (ফাত্ওয়া দেন) যে তাকে গোসল করতে হবে (তায়াম্মুমের পরিবর্তে)। তিনি গোসল করেছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ মারা যান।

---

৮১ ইবনে হাযম, আল-ইহ্কাম ফী উসূল আল-আহকাম, খণ্ড ২ (বৈরুত : দার আল-ফিকর, n.d.) পৃষ্ঠা ৫৮৭ মুহাম্মদ ইবনে আলী আল-শাওকানী, ইরশাদ আল-ফুহুল (বৈরুত : দার আল-ফিকর, n.d.) পৃষ্ঠা ২৫০।

৮২ ইব্ন হাযম, আল-ইহকাম ফী উসূল আল-আহকাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৫, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১৩।

৮৩ ইব্ন হায্ম, মাজ্ম আল-রাসাইল ইব্ন হাযম, খণ্ড ৪, সম্পাদনা : ইহসান আব্বাস, ১ম সংস্করণ (বৈরুত : আল-মু'আস্সাসাহ আল-আরাবিইয়াহ লি আল-দিরাসা ওয়া আল-নাশ্র)।

www.pathagar.com

আল-গাজ্জালী (মৃত্যু : ৫০৫ হিজরি)

আল-গাজ্জালী ইজতিহাদকে শরিয়াহর জ্ঞান অন্বেষণে কারো নিজ ক্ষমতার সর্বাধিক ব্যবহার বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, পরিপূর্ণ ইজতিহাদ তখনই হয় যখন কেউ নিজ ক্ষমতাকে অনুসন্ধান কাজে চরমভাবে কাজে লাগায় সেই সীমানা পর্যন্ত যেখানে সে ঐ অনুসন্ধানের উর্ধ্বে যাতায়াতে নিজে অসমর্থ বলে অনুভব করে[৮৪]।

আল-গাজ্জালীর সংজ্ঞা মুজতাহিদকে কেন্দ্রবিন্দু গণ্য করে এবং তাকে পরম মূল্য দেয়। যিনি বিশ্বাস করেন যে, তিনি ইজতিহাদ হতে যা অর্জন করেছেন তা জ্ঞান যা তার সামর্থ্যের সীমানা বৃদ্ধি করে।

এখানে জ্ঞানের অর্থ চূড়ান্ত বিশ্বাস যে, এটাই তা যা তার (মুজতাহিদ) কাছে দাবি করা হয়েছিল, এবং এ বিশ্বাস করে না যে এটাই সে সত্য যার জন্য অন্যেরা অবশ্যই তার অনুসরণ করবে। এক্ষেত্রে জ্ঞান ও মতামতের অর্থ, আল-ইজতিহাদের সংজ্ঞায় জ্ঞান ও মতামতের কিছু যোগ করতে হবে কিনা। কিছু সংখ্যক বিদ্বানের এমন পরস্পর বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ দেখে ইবনে তাইমিয়াহকে বলতে হয়েছিল, আমি বলেছি, যদি কোনো মুজতাহিদের মতামত নির্দেশ জারির ক্ষেত্রে দুটি পরস্পরছেদী সম্ভাবনার দ্বারা আবৃত করা যায়, তাহলে তাকে তার মতামতের নির্দেশনা বাস্তবায়ন হতে বিরত থাকতে হবে। কারণ জ্ঞান হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট ফলাফল, যেখানে মতামত জ্ঞানের মধ্য দিয়ে আসে[৮৫]। ইবনে তাইমিয়াহ এই বলে পুনরায় এ অনুসন্ধানের ব্যাখ্যা দেন, এ প্রতিক্রিয়ার সত্যতা এই যে, এখানে দুটো সিদ্ধান্ত সূত্র রয়েছে : এদের একটি এই যে, আমার একটি মত আছে। দ্বিতীয়টি এই যে, এ মতামতকে অনুসরণ করার ভিত্তি হিসেবে সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য রয়েছে। অতএব, প্রথম সিদ্ধান্ত সূত্র হচ্ছে বিবেকবুদ্ধিপূর্ণ যেখানে দ্বিতীয়টি অবরোহমূলক পদ্ধতি[৮৬]।

তিনি বিরোধিতামূলক ও সমর্থনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি সহকারে প্রত্যক্ষ প্রমাণাদির পক্ষাবলম্বী যাহিরী এবং যাহিরী ব্যতীত অন্যদের অন্যান্য দৃষ্টান্তের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গির সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেছেন। তিনি তার *আল-ফুরকান বাইনা আল-হাক্ক ওয়া*

---

৮৪ আল-গাজ্জালী আবু হামিদ, আল-মুসতাসফা মিন 'ইলম আশ-উসূল, খণ্ড ২, সম্পাদনা : মুহাম্মদ আবদ আল-সালাম আবদ আল-শাফী, ১ম সংস্করণ (বৈরূত : দার আল-কুতুব আল-'ইলমিইয়াহ, ১৪১৩ হি.) পৃষ্ঠা ৩৫০।

৮৫ আল রাযী ফখর আল-দীন, আল-মাহসূল মিন'ইলম আল-উসূল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৮-৯৯।

৮৬ ইবনে তাইমিয়াহ মুহাম্মাদ আবদ আল-হালীম, Al-Furqan Bayna Al-Haqq wa Batil সম্পাদনায় : খলীল আল-মিস (বৈরুত : দার আল-কালাম, n.d.) পৃষ্ঠা ৯৫।

www.pathagar.com

আল-বাতিল গ্রন্থে ফিক্‌হ কি এমন ধরনের মতামত যেখানে দ্ব্যর্থতা প্রত্যক্ষ ও অনুমানমূলক (প্রমাণ) কে ঘিরে রয়েছে, যেকোনো বিষয়ে যার সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা রয়েছে? তিনি শিরোনামযুক্ত প্রবন্ধে এর ব্যাখ্যা দেন। তিনি এই বলে প্রশ্নটির জবাব দেন, বিশুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তাই যা আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি এরূপ করেছেন পূর্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে। অতএব, মুজতাহিদের নিকট লুক্কায়িত বিষয়ে তাকে প্রমাণ খুঁজতে হবে এবং এর প্রভাব পরিমাপ করতে হবে। প্রভাবশীল সাক্ষ্য প্রমাণ মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত-সহায়ক। যদি তিনি আগেই বোঝতে পারেন যে, এক প্রমাণের ওপর অন্য প্রমাণের প্রভাব তার মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি করবে তাহলে তার উচিত হবে না সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা। পূর্ব হতে বিবেচিত কোনো মতামত অধিকতর প্রভাবশীল বলে সপ্রমাণিত। এখানে প্রভাবশীলতার সিদ্ধান্ত এবং প্রভাবশীলতাসম্পন্ন সিদ্ধান্ত-এ দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে প্রথমটি পূর্ব জ্ঞানের ভিত্তিতে এবং এর প্রভাবশীলতা না জানা পর্যন্ত বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। তবে, যদি এ প্রভাবশীলতা মত ভিত্তিক হয়, তাহলে মুজতাহিদের কাছে এমন প্রমাণাদি থাকতে হবে যা হাতে-থাকা অন্য বিকল্পগুলোর চেয়ে প্রভাবশীল।

এটা একান্ত প্রয়োজন যে, মুজতাহিদ-এর বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে তিনি যা জানেন তা অন্যদের ওপর প্রভাবশীল। তিনি পরস্পরবিরোধী প্রমাণাদির মধ্যে প্রভাবশীলগুলোর ওপর কাজ করবেন, তারপর জ্ঞানের ভিত্তিতে কাজ করবেন। হাসান আল-বাসরী, উবাই এবং অন্যান্যদের এটাই অভিমত[৮৭]।

অন্যান্য দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে, ইবনে তাইমিয়াহ প্রভাবশীলতার সিদ্ধান্ত এবং প্রভাবশীলতাসম্পন্ন সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য করেন। তিনি বলেন, আমরা প্রভাবশীলতার সিদ্ধান্ত এবং প্রভাবশীলতাসম্পন্ন সিদ্ধান্তের মধ্যকার পার্থক্য উল্লেখ করেছি যেখানে প্রথমটি হলো জ্ঞান। মুজতাহিদ ঐ জ্ঞানের ভিত্তি ব্যতীত কাজ করে না, একটির ওপর অন্য প্রভাবশীলতাকে বিচার করে। এর মধ্যে, একটির ওপর অন্য সিদ্ধান্তের প্রভাবশীলতা হচ্ছে একটি মত (যন্ন), যা কদাচিৎ ঘটে। আল্লাহ তায়ালা এমন একটি অবস্থাকে এভাবে বর্ণনা করেছেন,

> ... তারা অনুমান (যন্) ব্যতীত (অন্য) কিছুরই অনুসরণ করে না (সুরা আন'আম ৬ : ১১৬)।

এখানে 'যন্' এর অর্থ হলো, এক মতের ওপর আরেক মতের অধিক প্রভাব, পরিশেষে যে একটির ওপর সিদ্ধান্ত হবে সেটিই প্রভাবশীল বলে চিহ্নিত হবে।

---

[৮৭] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯৬-৯৭।

www.pathagar.com

এভাবে এটা একটি জানা প্রভাবশীল মত ও সাক্ষ্যের ভিত্তিতে নির্দেশে পরিণত হবে যা সাধারণ অনুমানের বিপরীত। চিকিৎসা, বাণিজ্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে এ ধরনের উপস্থাপনা দেখতে পাওয়া যায়[৮৮]। যারা ইজতিহাদ ও সৃজনশীলতার সাথে সংশ্লিষ্ট তাদের জন্য এগুলো বিপুল মূল্য সংযুক্ত করে।

ইবনে তাইমিয়াহ'র পূর্বে শিহাব আল-দীন আল-কারাফী ইজতিহাদ সম্বন্ধে আল-গাজালীর সংজ্ঞার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে এবং জ্ঞান সম্পর্কে পরবর্তীটির অবস্থা একীভূত করতে গিয়ে বলতে বাধ্য হন যে, আমি বলেছি, যদি জ্ঞান তার ইজতিহাদের মাধ্যমে ঐকমত্য দ্বারা অর্জিত হয় তাহলে তা তার (মুজতাহিদের) পক্ষে এবং তার অনুসারীদের পক্ষে আল্লাহ তায়ালার আদেশে পরিণত হয়। যদি দুটোর পক্ষেই যুক্তি থাকে তাহলে প্রথমটির অনুকূলে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এভাবে এ জাতীয় জ্ঞানকে প্রত্যেক মুজতাহিদের জন্য শরীআতে অনুমোদন করা হয়েছে যার অনুসন্ধান তার সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত নয়[৮৯]।

এ প্রশ্নে যে, অধিকাংশ ফিকহী নির্দেশনা মতামত মাত্র এবং জ্ঞানভিত্তিক নয়, কারণ ফিকহ অনুসিদ্ধান্ত (কিয়াস) হতে উদ্ভূত এবং তা একক হাদিস ও সাধারণ সূত্রের ভিত্তিতে হয় বিধায় অধিকাংশ ফিকহ আল-ফিকহ (যা নির্দেশনার বিজ্ঞান) এর পরিমাপকের মধ্যে গণ্য হয় না। আল-কারাফী শারহ তানকীহ আল-ফুসূল বিষয়ে প্রতিক্রিয়ায় বলেন যে, প্রথম প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে নির্দেশগুলো জানা কারণ শরিয়াহর প্রতিটি নির্দেশই ঐকমত্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। তাই যা কিছু ঐকমত্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তা-ই জানা। আমরা উল্লেখ করেছি যে, শরিয়াহর প্রতিটি নির্দেশ ঐকমত্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। কারণ নির্দেশগুলো দু'ধরনের। কতকগুলো আছে যা সর্বসম্মতভাবে স্বীকৃত এবং তাই ঐকমত্য (ইজমা) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে এমন কতকগুলো রয়েছে যে ব্যাপারে পরস্পর-বিপরীত মত পাওয়া যায়। এ ঐকমত্যে পৌছানো গেছে যে, যেসব মুজতাহিদের মতামত শরিয়াহর নির্দেশের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ এবং যারা তাকে অনুসরণ করে তারা দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে। এভাবে, যেসব নির্দেশের ব্যাপারে ভিন্নমত রয়েছে সেগুলো ঐকমত্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ শরিয়াহর সব নির্দেশ ঐকমত্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে[৯০]।

---

[৮৮] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯৮।

[৮৯] আল-কারাফী শিহাব আল-দীন, Nafis al-Usul Fi Sharh al-Mahmul খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৩৭৯১।

[৯০] আল-কারাফী, শারহ তানকীহ আল-ফুসূল ফী ইখতিসার আল-মাহসূল, ১ম সংস্করণ (মিসর : আল-মাতবাইআহ আল-খাইরিইআহ, ১৩০৬ হি.) পৃষ্ঠা ৯-১০।

www.pathagar.com

নিঃসন্দেহে, যে জ্ঞানের কথা বলা হলো তা আপাত যদিও এর দ্বারা বিপরীতও বুঝতে পারে, যেমন- আল্লাহ তায়ালার ভাষায়,

> যদি তোমরা নিশ্চিত করতে পার যে তারা মুমিন (সুরা মুমতাহিনা ৬০ : ১০)।

এটাই ছিল আবু আল-খাত্তাব আবু বকর আল জাস্‌সাস এবং অন্যদের অভিমত[৯১]।

ফখরুদ্দিন আল-রাযী (মৃত্যু ৬০৬ হিজরি)

তিনি ইজতিহাদের সংজ্ঞা এরূপে দেন যা, কারো সামর্থ্যকে ব্যয় করা এমন গবেষণায় যাতে সামর্থ্য ব্যয় করে অভিযুক্ত হতে হয় না[৯২]। এই সংজ্ঞায় দেখা যাচ্ছে যে, মুজতাহিদ কোনো প্রকার অভিযোগ হতে মুক্তিপ্রাপ্ত যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তার ইজতিহাদের পদ্ধতিকে সীমাবদ্ধ না করেন। এটা উম্মাতের মঙ্গল ও কল্যাণের প্রতি উদ্যোগের জন্য উৎসাহ। বিপরীতভাবে ভুল করার ভয়ে পিছু হটা ও দূরে থাকার জন্য এটা উৎসাহ দেয় না।

আবু ইসহাক আল-শা'তিবী (মৃত্যু ৭৯০ হিজরি)

আল-ইজতিহাদ দু'প্রকার : এর একটি শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত স্থায়ীভাবে বিদ্যমান থাকে। দ্বিতীয় প্রকার ইজতিহাদ অস্থায়ী এবং পৃথিবীর সমাপ্তি পর্যন্ত বিদ্যমান থাকে না।

প্রথম ধরনের ইজতিহাদ কোনো নির্দেশের ত্রুটিযুক্ত কারণ পরীক্ষা করে। এটা সেই প্রকার যা উম্মাহ অবিসংবাদিতভাবে সমর্থন করেছে। নির্দেশের উৎস নির্ধারণকল্পে অনুসন্ধান স্থগিত রেখে শরিয়াহর যুক্তির ভিত্তিতে নির্দেশনা প্রতিষ্ঠার কথা বলে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> এবং সাক্ষী হিসেবে তোমাদের মধ্য হতে দু'ব্যক্তিকে নাও যারা ন্যায়পরায়ন (সুরা তালাক ৬৫ : ০২)।

মূল গ্রন্থে আমাদের নিকট ন্যায়ের অর্থ শরিয়াহ সরবরাহ করেছে। এখন তাই আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে ন্যায়পরায়নতার গুণাবলী রয়েছে এমন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা, একথা মনে রেখে যে, ন্যায়পরায়নতার সাথে সম্পর্কিত একই গুণাবলী সব লোকের মধ্যে নেই, ... ইত্যাদি।

---

[৯১] দেখুন আল-জাস্‌সাস আবু বকর সংক্রান্ত অধ্যায় আল-ইজতিহাদ ও আল কিয়াস প্রসঙ্গে al-Fusul Fi al-Usul গ্রন্থের খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ৩০।

[৯২] ফখর আল-দীন আল-রাযী Mahsul Min Ilm al-Usul, Vol.-6 পৃষ্ঠা ৬।

www.pathagar.com

অন্যদিকে, দ্বিতীয় প্রকার ইজতিহাদ অনুযায়ী এটা তিন প্রকার : প্রথমটি হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ কারণসমূহের সংশোধন সম্পর্কিত। একই মূলগ্রন্থে কাঙ্খিত কয়েকটি যখন অন্যান্য কারণের সাথে উল্লেখ করা হয় তখন এটা ঘটে। এভাবে কাঙ্খিত কারণ বের করার জন্য ইজতিহাদের মাধ্যমে সংশোধন করা হয়। দ্বিতীয় ধারণাটিকে ত্রুটিযুক্ত কারণ উদঘাটন করা বলে। এটা সেই অবস্থার দিকে নির্দেশ করে যেখানে মূল নির্দেশনায় কারণটি দৃশ্যমান নয়। কারণটিকে উদঘাটন বা বের করতে হবে গবেষণা করে। এটা হচ্ছে অনুসিদ্ধান্ত দ্বারা ইজতিহাদের বিখ্যাত ঘটনা।

তৃতীয় প্রকার হচ্ছে তাই যা কোনো নির্দেশের ত্রুটিপূর্ণ কারণ পরীক্ষার সাথে সম্পর্কিত, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এটাকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম ভাগ কারণের প্রকারের সাথে সম্পর্কিত, ব্যক্তির সাথে নয়। উদাহরণস্বরূপ শিকারের জন্য পুরস্কারের সমতা নির্ধারণ করা, দাস মুক্ত করা, ধর্মীয় প্রায়শ্চিত্ত, আঘাত করা ইত্যাদি। দ্বিতীয় ভাগ এইসব কারণ নির্দেশের জন্য উৎস পরীক্ষার সাথে সম্পর্কযুক্ত[৯৩]।

ওপরে প্রদত্ত সংজ্ঞা এর পদ্ধতিগত প্রক্রিয়াকে জটিল করেও ইজতিহাদকে একটি জটিল মাত্রা প্রদান করে যেখানে বিবৃতি বা সাধারণীকরণ এবং বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক নির্দেশনা অপর্যাপ্ত। এই পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া নির্দেশনার কারণ দাবি করবে, যা নিজেই নির্দেশনার উৎস সম্পর্কীয় গবেষণা। এর অর্থ হলো ইজতিহাদ বা সৃজনশীলতার প্রক্রিয়ায় একট তাত্ত্বিক মীমাংসায় উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে এটা অপর্যাপ্ত। বরং উৎকৃষ্টতর প্রয়োগকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে কেবল তাত্ত্বিকীকরণই প্রয়োজন। এটি (তাত্ত্বিকীকরণ) দ্বিতীয় প্রকার ইজতিহাদ সম্পর্কে অধ্যয়নের পরেই কেবল আসে যা নিম্নলিখিত বিষয়ে কাজ করে :

ক. বাতিলকৃত হতে কাঙ্খিত কারণকে পৃথককরণের দ্বারা কারণ সংশোধন;

খ. কারণ আহরণ, যা অনুসিদ্ধান্ত দ্বারা প্রাপ্ত এক প্রকার ইজতিহাদ; এবং

গ. কারণ পরীক্ষণ, যা নির্দেশনাসমূহ প্রয়োগক্ষেত্রে একটি অধ্যয়ন (গবেষণা)।

ইজতিহাদ সম্পর্কিত ইবাদতের মাত্রা

একজন মুসলিমের জীবনে ইসলামি সভ্যতার অগ্রগতির দৃষ্টিকোণ হতে সৃজনশীলতা ও ইজতিহাদ এই বাস্তবতার কারণে গুরুত্বপূর্ণ যে, এ দুটিই আল্লাহ তায়ালার

---

৯৩ আল-শাতিবী : আল-মুওয়াফফকাত ফী-উসূল আল-শারীআহ সম্পাদনা আবদ আল্লাহ দারায, খণ্ড ৪ (বৈরুত : দার আল-মা'রিফাহ, n.d.) পৃষ্ঠা ৮৯-৯৮।

www.pathagar.com

ইবাদতের অংশ। ইবনে তাইমিয়াহ বলেন যে, ...শরিয়াহর আয়াতসমূহ এসেছে ইজতিহাদ ও সৃজনশীলতার প্রতি আহ্বান জানাতে এবং এ প্রক্রিয়াসমূহকে উপায়ে পরিণত করতে, ব্যক্তি মানুষকে আল্লাহ তায়ালার নিকটতর করতে এবং পুরস্কার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে। এক্ষেত্রে কুরআনের আয়াত,

> যারা মনোযোগ সহকারে শোনে এবং এর মধ্যে যা উত্তম তা অনুসরণ করে (সুরা যুমার ৩৯ : ১৮)।

সর্বোত্তম বিষয়াদি অনুসরণে ইজতিহাদকে উৎসাহিত করে। এটি নবি সা.-এর হাদিসেও বর্ণিত হয়েছে যে, সবল বিশ্বাসী উত্তম এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট অধিক প্রিয় দুর্বল বিশ্বাসীর চেয়ে যদিও উভয়েরই রয়েছে উত্তম বৈশিষ্ট্য। ইসলাম সর্বদা পূর্ণাঙ্গ সমাধান এবং সর্বোত্তম ফলাফল অন্বেষণের জন্য আহ্বান জানায়। তাছাড়া এই হাদিস, আল্লাহ তায়ালা অনুগ্রহ করেন সেই ব্যক্তিকে যে আমার কথা শোনে এবং তা (সেইমত) আমার কাছে যেভাবে শুনল সেভাবেই পৌঁছে দেয়। বিভিন্ন দৃষ্টান্তে সংবাদবাহক শ্রোতার চেয়ে বেশি সচেতন। রসুলের সা. এই প্রভাববিস্তারকারী দূরদৃষ্টি উম্মাতের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য ইজতিহাদ ও সৃজনশীলতার প্রশস্ত দরজা খুলে দেয়। এগুলোই ঐসব আয়াতের উদাহরণ যা পরোক্ষভাবে ইজতিহাদ ও সৃজনশীলতার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

সরাসরি সম্পর্কযুক্ত বিষয়সমূহের ক্ষেত্রে আমরা মু'আয রা. এর প্রতি নবি সা.-এর হাদিস দেখতে পারি যখন তিনি সা. তাকে ইয়েমেনে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছিলেন। রসুল (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কিভাবে লোকদের মধ্যে বিচার করবে মু'আয? উত্তরে তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালার কিতাব অনুযায়ী। যদি তা (তোমার উৎস) আল্লাহ তায়ালার কিতাবে না থাকে? মু'আয রা. বললেন, আল্লাহর রসুল সা.-এর সুন্নাহ অনুযায়ী। তিনি সা. বললেন, যদি তা (মীমাংসা) আল্লাহর রসুল-এর সুন্নাহয় না পাও? তিনি বললেন, আমি ইজতিহাদ করব আমার বিবেকের ভিত্তিতে এবং কোনো প্রচেষ্টা বাকি রাখব না। নবি সা. বললেন, প্রশংসা সেই আল্লাহ তায়ালার যিনি আল্লাহর নবি সা. কে তেমনি বাণীবাহক দান করেছেন যেমনটি আল্লাহর নবি সা. পছন্দ করেন[৯৪]। এটিই

---

[৯৪] আল-মুসনাদ গ্রন্থে আহমদ কর্তৃক বর্ণিত হাদিস নম্বর-২২০৬০; তিরমিযী তাঁর সুনানে কিভাবে বিচারক বিচার করে শীর্ষক অধ্যায়ে ১৩২৮ নম্বর হাদিসে বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদ, সুলায়মান ইবনে আল-আসহাব, আল-সুনান, সম্পাদনা-মুহাম্মদ মুহ'য়ী আল-দীন আবদ

www.pathagar.com

ইজতিহাদকে আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের সাথে সাথে তার দীনের সেবার উপকরণ সাব্যস্ত করেছে।

নিম্নে প্রদত্ত দ্বিতীয় হাদিসটি কেবল মুজতাহিদের ইবাদতের বৈশিষ্ট্যকেই উৎকর্ষমণ্ডিত করে না, বরং তার ইজতিহাদকে তার সমুদয় পুরস্কারের অবিচ্ছেদ্য অংশ গণ্য করে। নবি (তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলেন, যদি বিচারক তার রায় প্রদানে ইজতিহাদ করে এবং সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয় তবে তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ পুরস্কার। (অন্যদিকে) যদি সে ইজতিহাদের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয়, কিন্তু তাতে ভুল হয় তবুও তার জন্য একটি পুরস্কার।

আল-ইজতিহাদ ও মতামত (আল-রা'ঈ)-এর মধ্যে পার্থক্য

মুয়ায রা. কে নবি সা. কর্তৃক ইয়েমেনে বিচারক নিযুক্ত করে প্রেরণ সংক্রান্ত হাদিসটি দেখায় যে, একটি আন্দোলন হিসেবে ইসলাম সমগ্র ইতিহাসব্যাপী এমন কোনো যান্ত্রিক ধর্ম বা অনড় ধর্মীয় প্রথা দ্বারা প্রভাবিত নয়, যা জীবনের চলমানতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। এর পরিবর্তে ইসলাম এর মহান উৎপত্তির সাথে সাথে একটি জাগ্রত আন্দোলন, যাতে একজন মুসলিম ইজতিহাদে তার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে এবং তার মত কে পুরাপুরি প্রয়োগ করে ঘটনার বিচার বিশ্লেষণ করে সৃজনশীল সমাধানের উদ্দেশ্যে। সৃষ্টিধর্মী উপায়ে জটিল সমস্যার সমাধানে এর মহান সূচনা ও যৌক্তিক বাস্তবতার সমাহার ঘটায়। এর লক্ষ্য হলো অতি অগ্রগামী এবং পূর্ণতম কোনো একটির তুলনায় সর্বোত্তম সমাধানে উপনীত হওয়া। এভাবে আল্লাহর নবি সা. এর কথাকে দৃঢ়করণ করেছেন, আল্লাহ তায়ালা ভালোবাসেন যখন তোমাদের একজন কাজ করে, সে তা করে পূর্ণাঙ্গরূপে। ইজতিহাদাত

আল-হামীদ (বৈরুত: দার আল-ফিকর, n.a)' বিচারে আইনী মতামত শীর্ষক অধ্যায়ে হাদিস নম্বর-৩৫৯২।

আল-বাইহাকী, আল-সুনান আল-কুবরা 'বিচারক তার রায়ে কিসের ওপর নির্ভর করেন এবং মুফতী তার ফতোয়ায় কিসের উপর নির্ভর করেন' শীর্ষক অধ্যায়ে; হাদিস নম্বর-২০১২৬। এই হাদিসের মান সম্পর্কে বিদ্বানগণের মধ্যে মতোভেদ রয়েছে। উসূলপন্থীদের বেশিরভাগ হাদিসবেত্তা এ হাদিসটিকে বিশুদ্ধ মনে করেন কারণ এই হাদিসে মুয়াযের সমসাময়িকদের অজ্ঞতা এর বিশুদ্ধতাকে খর্ব করে না। বিশদ দেখুন ইবনে হাযম কৃত আল-ইহকাম ফী উসূল আল-আহকাম, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৪১৭; ইবনে আল-জাওযীর আ-'ইলাল আল-মুতানাহিয়্যাহ, খণ্ড ২, সম্পাদনা খলীল আল-মিস (বৈরুত : দার উল-কুতুব আল-ইলমিয়্যাহ, ১৪১৫ হি.) পৃষ্ঠা ৭৫৮।

www.pathagar.com

(ইজতিহাদের বহুবচন) সম্পর্কে নবি সা. ও রসুল আ. গণের অন্যান্য বক্তব্য রয়েছে এবং রয়েছে তাঁর নিজ ইজতিহাদ। এর পাশাপাশি রয়েছে তাঁর সাহাবিগণের রা. অন্যান্য বক্তব্য যা ইসলামের গতিশীলতার সর্বোত্তম উদাহরণ হতে পারে।

আমাদের নবি সা. এবং তাঁর পূর্ববর্তী নবি ও রসুল আ. গণের ইজতিহাদসমূহ

কুরআনের প্রসিদ্ধ আয়াতসমূহের মধ্যে নিম্নবর্ণিত আয়াতসমূহকে, বেশিরভাগ ব্যাখ্যাতা (মুফাসসির) নবি আ. গণের ইজতিহাদ বলে গণ্য করেন।

ক. মুসা যখন পর্বতের ওপর দণ্ডায়মান, আল্লাহ তায়ালা বললেন,

> হে মুসা! তোমার সম্প্রদায়কে পেছনে রেখে তোমাকে ত্বরা করতে বাধ্য করল কিসে? সে বলল, এই তো ওরা আমার পেছনে এবং হে আমার প্রতিপালক! আমি শীঘ্রই তোমার নিকট এলাম তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য[৯৫] (সুরা ত্বহা ২০ : ৮৩-৮৪)।

খ. (মুসা) বলল, হে হারুন! তুমি যখন দেখলে ওরা আমার অনুসরণ হতে পথভ্রষ্টতায় ফিরে যাচ্ছে তখন কিসে তোমাকে নিবৃত্ত করল? তুমি কি আমার আদেশ অমান্য করলে? (হারুন) বলল, হে আমার সহোদর! আমার শ্মশ্রু ও মাথার চুল ধরে টানাটানি করো না (ছেড়ে দাও)। সত্যই আমি আশংকা করেছিলাম যে, তুমি বলবে, তুমি বনী ইসরাঈলদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ এবং তুমি আমার বাক্য সম্বন্ধে সতর্ক হওনি[৯৬] (সুরা ত্বহা ২০ : ৯২-৯৪)।

গ. এবং স্মরণ করো দাউদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তারা বিচার করছিল শস্যক্ষেত্র সম্পর্কে যেখানে রাত্রিকালে প্রবেশ করেছিল কোন সম্প্রদায়ের মেষ, আমি দেখছিলাম তাদের বিচার। এবং আমরা সুলায়মানকে এ বিষয়ের (সঠিক) মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। তাদের (প্রত্যেক) কে আমি দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান[৯৭] (সুরা আম্বিয়া ২১ : ৭৮-৭৯)।

ঘ. এবং নূহ তার প্রতিপালককে সম্বোধন করে বলল, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমার পুত্র আমার পরিবারভুক্ত ও আপনার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং

---

৯৫ সুরা ত্বহা ২০ : ৮৩-৮৪।

৯৬ সুরা ত্বহা ২০ : ৯২-৯৪।

৯৭ সুরা আম্বিয়া ২১: ৭৮-৭৯।

www.pathagar.com

আপনি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক। তিনি বললেন, হে নূহ! সে তোমার পরিবারভুক্ত নয়, সে অসৎকর্ম পরায়ন। সুতরাং যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই সে বিষয়ে আমাকে অনুরোধ করো না! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি তুমি যেন অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হও[৯৮] (সুরা হূদ ১১ : ৪৫-৪৬)।

ঙ. তোমার নিকট বিবদমান লোকদের বৃত্তান্ত পৌঁছিয়েছে কি? যখন ওরা পাঁচিল ডিঙিয়ে এলো ইবাদতখানায় এবং দাউদের কাছে পৌছাল তখন তাদের কারণে সে ভীত হয়ে পড়ল। তারা বলল, ভীত হবেন না, আমরা দুটি বিবদমান পক্ষ- যারা একে অন্যের ওপর জুলুম করেছি এবং আমাদের সঠিক পথ নির্দেশ করুন। এ আমার ভাই, এর রয়েছে নিরানব্বইটি এবং আমার মাত্র একটি। তবুও সে বলে, আমার জিম্মায় এটি দিয়ে দাও; এবং কথায় সে আমাকে ছাড়িয়ে গেছে। (দাউদ) বলল, তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বার (পালের সাথে) সাথে যুক্ত করার দাবি করে সে তোমার প্রতি জুলুম করেছে। সত্য যে অনেক শরীক এমন আছে যারা (ব্যবসায়ে) অন্যের ওপর অবিচার করে থাকে। করে না কেবল মুমিন ও সৎকর্মপরায়ন ব্যক্তিগণ এবং তারা সংখ্যায় স্বল্প। দাউদ বোঝতে পারল যে, আমরা তাকে পরীক্ষা করলাম। অতঃপর সে তার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং নত হয়ে (সেজদায়) লুটিয়ে পড়ল এবং (আল্লাহ তায়ালার) অভিমুখী হলো[৯৯] (সুরা সাদ ৩৮ : ২১-২৪)।

চ. তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে ইসরাঈল নিজের জন্য যা হারাম করেছিল তা ব্যতীত বনী ইসরাঈলের জন্য যাবতীয় খাদ্যই হালাল ছিল। বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাওরাত আনো এবং পাঠ করো[১০০] (সুরা আলে ইমরান
৩ : ৯৩)।

প্রথমত সুরা আম্বিয়ায় আল্লাহ তায়ালা যখন বলেন,

এবং স্মরণ করো দাউদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তারা শস্যক্ষেত্র সম্বন্ধে বিচার করছিল যেখানে রাত্রে প্রবেশ করেছিল কোন সম্প্রদায়ের মেষ; আমরা তাদের

---

৯৮ সুরা হূদ ১১: ৪৫-৪৬।

৯৯ সুরা সাদ ৩৮ : ২১-২৪।

১০০ সুরা আলে ইমরান ৩ : ৯৩।

www.pathagar.com

বিচার দেখছিলাম। আমরা সুলায়মানকে এ বিষয়ের সঠিক মীমাংসা বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। (তাদের) প্রত্যেককে আমরা দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান (সুরা আম্বিয়া ২১ : ৭৮-৭৯)। জমি আবাদ সম্পর্কে দাউদ ও সুলায়মানের আ. বিচারকার্য সম্পর্কে সুরা আল-আম্বিয়ার আয়াত অন্যতম প্রসিদ্ধ আয়াত হিসেবে পরিগণিত হয়েছে যা দ্বারা আইনবিশারদগণ (উসূলিয়্যান) রসুল আ. গণের ইজতিহাদ করার অনুমতির দলিল উপস্থাপন করে থাকেন, এবং তাঁদের কিছু ইজতিহাদে ভুলভ্রান্তি হয়েছিল তা-ও ভুল অনুমানের ভিত্তিতে নয় বলে মনে করেন।

ওপরের আয়াতে ব্যাখ্যা ও আইনবিদদের অভিমত সম্পর্কে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নির্বাচিত করেছি।

আল-উম্ম' গ্রন্থে আল-শাফিঈ বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> এবং স্মরণ করো দাউদ ও সুলায়মানের কথা, যখন তারা বিচার করছিল ঐ শস্যক্ষেত্র বিষয়ে যাতে রাত্রিবেলা প্রবেশ করেছিল কোন সম্প্রদায়ের মেষপাল, আমরা তাদের বিচার দেখছিলাম। আমরা সুলায়মানকে (সঠিক) বিষয়টি সম্বন্ধে জ্ঞান দান করলাম। আমরা (তাদের) প্রত্যেককে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান (সুরা আম্বিয়া ২১ : ৭৮-৭৯)।

আল-শাফি'ঈ এবং আল-হাসান ইবনে আবী আল-হাসান বলেন, যদি এটা এ আয়াতের জন্য না হতো, তাহলে আমি দেখতাম শাসকরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা এই নবিকে তাঁর ন্যায়পরায়নতার জন্য এবং অন্যজনকে তাঁর ইজতিহাদের জন্য প্রশংসা করেছেন[১০১]।

মুজতাহিদগণের প্রমাণাদি সংশোধন প্রসঙ্গে আবু বাকর আল জাসসাস তাঁর *আহকাম আল-কুরআন* গ্রন্থে বলেন, কোনো এক ঘটনায় একজন মুজতাহিদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে দুটি ভিন্ন গোষ্ঠী মতভেদ করেছিল। একদল ছিল এমন যে তারা দাবি করত যে সত্য কেবল এক এবং একটিই। এমতাবস্থায় অন্য গোষ্ঠী বলল যে, ইজতিহাদের বিভিন্ন অভিমতের সাথেই সত্যের সম্পর্ক রয়েছে।

প্রত্যেক গোষ্ঠী তাদের বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ পেশ করে। যারা বলেছিল যে সত্য কেবল একটিই তারা দাবি করল যখন আল্লাহ তায়ালা বলেন,

---

[১০১] আল-শাফি'ঈ মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস, কিতাব আল-উম্ম, খণ্ড ২ (বৈরুত : দার আল-মা'রিফাহ, ১৩৯৩ হিজরি), পৃষ্ঠা ১২৩।

www.pathagar.com

আমরা সুলায়মানকে (সঠিক) বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞান দান করলাম (সুরা আম্বিয়া ২১ : ৭৮-৭৯)।

তিনি সুলায়মান আ. কে (সঠিক) জ্ঞান দান করে পৃথক করলেন। এটা প্রমাণ করে যে একমাত্র সুলায়মান আ. সরাসরি আল্লাহ তায়ালার নিকট সত্য জানতে পেরেছিলেন দাউদ আ. কে ছাড়া। যদি তাদের ব্যক্তিগত মতামতের মধ্যে সত্য অবধারিত থাকত, তাহলে আল্লাহ তায়ালা সুলায়মানকে (সঠিক) জ্ঞান দান করে দাউদ হতে পৃথক করতেন না। এক্ষেত্রে যারা উভয় মুজতাহিদকে সঠিক দাবি করেন তারা বলেন যে, যেহেতু দাউদকে তাঁর বক্তব্যের জন্য তিরস্কার করা হয়নি কিংবা সেটাকে ভুলও বলা হয়নি, সেহেতু তাঁদের নিজ নিজ ধারায় উভয়েই সঠিক ছিলেন। সুলায়মান আ. কে (সঠিক) বোঝ দ্বারা পৃথক করাতে এটা প্রমাণিত হয় না যে, দাউদ আ. সঠিকভাবে বোঝতে এবং যা সত্যিকারভাবে দাবি করা হচ্ছিল তার নির্যাস অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিলেন[১০২]।

বিদ্বানগণের বক্তব্যের ওপর মন্তব্য : উপরে বর্ণিত দুটি আয়াত সম্পর্কে ব্যাখ্যা ও আইনবিশারদদের মন্তব্য বাহ্যত দেখায় যে, দাউদ আ. ও সুলায়মান আ.-এর কাহিনী যা প্রখ্যাত সাহাবিগণ ও তাঁদের পরবর্তীগণ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে তা সুলায়মান ও দাউদ আ.-এর ইজতিহাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যার মধ্যে রয়েছে দেওয়া-নেওয়া বা দুই নবির মধ্যে বিতর্ক। দেওয়া-নেওয়ার উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, আল্লাহ তায়ালার হস্তক্ষেপ অনুপস্থিত। যদি হস্তক্ষেপ হতো তাহলে দুই নবির মধ্যে আপোষের প্রসঙ্গটি উঠত না। হস্তক্ষেপের প্রথম অবস্থাতেই বিষয়টির মীমাংসা হয়ে যেত, কারণ এটা তখন আল্লাহর ওহির সাথে সম্পর্কযুক্ত হতো, যাতে কোনো বিতর্ক নেই।

আয়াতের দ্বিতীয় মাত্রা প্রথমটির চেয়ে কম জোরাল, তা এই যে, নবি দাউদ ইজতিহাদ প্রয়োগ করলেন যখন নবি সুলায়মান (সঠিক) জ্ঞান ব্যবহার করলেন যা এ আয়াতে নিশ্চিত করে,

আমরা সুলায়মানকে (সঠিক) জ্ঞান দান করলাম (সুরা আম্বিয়া ২১ : ৭৯)

---

[১০২] আল-জাস্‌সাস, আবু বকর আল-রাযী : আহকাম আল-কুরআন, ৫ম খণ্ড, সম্পাদনা : মুহাম্মদ আল-সাদিক কামহাবী (বৈরুত : দা-র ইহয়া আল তুরাত আল 'আরাবী, ১৪০৫ হিজরি) পৃষ্ঠা ৫৫।

www.pathagar.com

এটা প্রমাণে একথা যথেষ্ট যে ইসলামি শরিয়াহ দৃঢ়ভাবে ইজতিহাদকে ঐ সীমানা পর্যন্ত সুরক্ষিত রেখেছে যা নবি-রসুলদের নির্দেশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত, এভাবে ইজতিহাদকে দেওয়া হয়েছে ইবাদতের মাত্রা।

অন্য একটি কাহিনী যা আল-বুখারির হাদিসে সংকলিত হয়েছে তাতে বর্ণনা রয়েছে আবু আল-জানাদ এবং আবদ আল-রাহমান আল-আরাজ হতে। আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, নবি (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলেন, একদা দুই মহিলা তাদের দুই পুত্র সন্তান সমভিব্যাহারে থাকা অবস্থায় নেকড়ে বাঘ এসে তাদের একজনের পুত্রকে নিয়ে যায়। মহিলাদের একজন তার বান্ধবীকে বলে এটা (নেকড়ে বাঘ) তোমার পুত্রকে নিয়ে গেছে। অন্য মহিলাও বলে, বরং সে তোমার ছেলেকে নিয়ে গেছে। তারা দাউদ আ.-এর নিকট বিচারপ্রার্থী হলে তিনি জ্যেষ্ঠ মহিলার পক্ষে রায় দিলেন। তখন তারা দুজনেই দাউদ আ.-এর পুত্র সুলায়মান আ.-এর নিকট যাওয়ার মনস্থ করল। তারা তাঁকে (ঘটনাটি) শুনাল। তিনি বলেন, অবশিষ্ট ছেলেটিকে দুজন মহিলার মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার জন্য আমাকে একখানা ছুরি এনে দাও। কনিষ্ঠ মহিলাটি বলল, এটা করবেন না! আল্লাহ তায়ালা আপনাকে অনুগ্রহ করুন। সে ওর ছেলে। তখন তিনি (সুলায়মান) কনিষ্ঠ মহিলার পক্ষে সিদ্ধান্ত প্রদান করলেন। আবু হুরায়রা রা. বলেন, 'আল্লাহ তায়ালার কসম! আমি সিক্কীন (ছুরি) কেবল ঐ দিনই শুনেছি। আমরা আল-মাদিয়্যাহ ব্যতীত আর কারো নিকট এটা বলতাম না'[১০৩]।

এই বর্ণনা প্রমাণ করে যে, দাউদ-এর সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধভাবে ইজতিহাদের ভিত্তিতে ছিল কারণ যদি তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রন্থভিত্তিক হতো তবে সুলায়মান আ.-এর জন্য তাঁকে ডিঙিয়ে ভিন্ন ফয়সালা দেওয়ার অধিকার থাকত না।

দ্বিতীয়ত মুসা ও হারুনের কাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াত

ক. আল্লাহ তায়ালার ভাষায় প্রথম আয়াত, [যখন মুসা পর্বতের ওপর দণ্ডায়মান, আল্লাহ তায়ালা বললেন,

> মুসা! তোমার সম্প্রদায়কে পেছনে রেখে তোমাকে ত্বরা করতে কিসে উদ্বুদ্ধ করল? সে (মুসা) বলল, এই তো ওরা আমার পেছনে এবং হে আমার প্রতিপালক! আমি শীঘ্র করে তোমার নিকট এসেছি তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য (সুরা ত্বহা ২০ : ৮৩-৮৪)।

---

[১০৩] আল-বুখারি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, আল-সহীহ, সম্পাদনা : মুস্তাফা দীব আল-বাঘা, ৩য় সংস্করণ (বৈরুত : দার ইবনে কাসীর এবং দার আল-ইয়ামামাহ, ১৯৮৭), হাদিস নং-৬৩৮৭।

www.pathagar.com

আপাতদৃষ্টিতে এই আয়াতে দেখা যায় যে, একটি বিষয়ে মুসা ত্বরাপ্রবণ হয়েছিলেন। যাতে তার ধৈর্য্য ধরা কাম্য ছিল। তাঁর তাড়াহুড়া করা ছিল অপ্রয়োজনীয়। তিনি যে ভুল করেছিলেন তার প্রেক্ষিতেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। তাঁর অভিব্যক্তি দ্বারা বোঝা যায় যে, তিনি তাঁর জন্য উত্তম বিবেচনা করে একটি বিষয়ে ইজতিহাদ করেছিলেন।

ওয়াহিদ আল-দীন এ আয়াতের অনুবাদ করতে গিয়ে বলেন, যখন মুসা পর্বতে আরোহণ করলেন, আল্লাহ তায়ালা বললেন,

> হে মুসা! তোমার সম্প্রদায়কে রেখে তাড়াহুড়া করে এখানে আসতে কিসে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করল? সে (মুসা) বলল, এই তো ওরা আমার পেছনে হে আমার প্রতিপালক (সুরা ত্বহা ২০ : ৮৩)!

এটি হচ্ছে একটি ঘটনার বর্ণনা যা আল্লাহ তায়ালা ও মুসা আ.-এর মাঝে ঘটেছিল যখন তিনি নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই হাজির হয়েছিলেন। যদিও এ প্রশ্ন আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত, এটা তথ্য পাওয়ার জন্য ছিল না, বরং অন্য পক্ষকে জানাবার জন্য কিংবা তাঁকে তিরস্কার বা সাবধান করার জন্য ছিল, যেমনটা ব্যাখ্যা করেছেন আল-রাগীব আল-ইসফাহানী। তখন মুসা আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক জিজ্ঞাসিত কারণের ব্যাখ্যায় বললেন,

> হে প্রভু! আমি তোমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য ত্বরা করেছি (সুরা ত্বহা ২০ : ৮৪)।

আমি তোমার নির্দেশ পালনের জন্য ত্বরা করেছি যাতে আমি এরূপ কাজে আরো বেশি করে তোমার আনুকূল্য পাই। এই (বক্তব্য)টি ইজতিহাদের অনুমতি প্রমাণ করে, অর্থাৎ আমি তোমার নির্দেশিত স্থানে যাওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করেছি যাতে তুমি আমার ওপর সন্তুষ্ট হও[১০৪]।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল-তাহির ইবনে আশূর বলেন, ত্বরা করা হচ্ছে কোনো কিছু তাড়াতাড়ি করা। (এই আয়াতে) ব্যবহৃত প্রশ্নবোধক উপাদান দোষারোপকে বোঝাচ্ছে। তাই ব্যাখ্যকারীদের বক্তব্য এবং আয়াতের অর্থ হতে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় তা হচ্ছে, মুসা তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদের থেকে ত্বরিত পৃথক

---

[১০৪] ওয়াহিদ আল-দীন খান, ফাতহ আল-বাইয়ান ফী মাকাসিদ আল-কুরআন (বৈরুত : দার আল-ফিকর আল-আরাবী, হ.ফ.), পৃষ্ঠা ১০৪-১০৫।

www.pathagar.com

হয়ে যান আল্লাহ তায়ালার নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই গোপনে পৌঁছায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে। তিনি এটাকে তাঁর নিজস্ব ইজতিহাদের দৃষ্টিতে দেখেছিলেন শরিয়াহর সুবিধা লাভের আকাঙ্ক্ষায় যা তাঁর সাথে কৃত আল্লাহ তায়ালার ওয়াদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, বনীইসরাঈল সিনাই পর্বতের চারদিকে জড়ো হওয়ার পূর্বেই। তাঁর জন্য এবং তাঁর কওমের জন্য কল্যাণ ব্যতীত অন্য কিছুর ব্যাপারে তিনি সাবধান ছিলেন না। আল্লাহ তায়ালা এখানে তাই তাঁকে এই বিষয়ে অমনোযোগী থাকার জন্য তিরস্কার করছেন যে, তিনি নিজেকে তাঁর লোকদের থেকে দূরে নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে চুক্তি রক্ষায় উপদেশ প্রদান এবং ধূর্তদের ধূর্তামির ব্যাপারে সতর্ক করার পূর্বেই। তিনি (মুসা) আবু বকরের মত একটি অবস্থার শিকার হয়েছিলেন যিনি মসজিদে প্রবেশ করে নবি সা. কে রুকূ (প্রার্থনাকালে ঝুঁকানো অবস্থা) অবস্থায় দেখেন, নবি সা. তাঁকে বললেন, আল্লাহ তায়ালা তোমার ধার্মিকতা বাড়িয়ে দিন এবং যেন পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরিয়ে না নেন[১০৫]।

ওয়াহিদ আল-দীন এবং আল-তাহির ইব্ন 'আশূর প্রদত্ত ব্যাখ্যা (তাফসীর) এর অধিকাংশ হচ্ছে তাফসীরের সব কিতাবে প্রাপ্ত তাফসীরের প্রতিনিধিত্বকারী[১০৬]। এ বক্তব্য হতে যা উদ্ভূত হয় এবং মুসার আচরণ হতে কমপক্ষে যা অনুমান করা যায় তা হলো, এটা ছিল তাঁর ইজতিহাদ যার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ভৎর্সনা করেছেন, কারণ আল্লাহ তায়ালা তাঁর কোনো বান্দাকে তাঁর নির্দেশ পালনের জন্য ভৎর্সনা করেন না। এর পরিবর্তে তিনি তাঁর আদেশের অন্যথা করা কিংবা কর্তৃত্ব (ফাযিল) থাকা সত্ত্বেও কমপক্ষে অননুমোদিত কিছু করার জন্য ভৎর্সনা করেছেন। এটাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে ইজতিহাদের একটি দিকের প্রতিনিধিত্ব করা।

খ. দ্বিতীয় আয়াত,

> [মুসা] বলেন, হে হারুন! তারা আমাকে অনুসরণ হতে বিমুখ হয়ে ভুলপথে চলা সত্ত্বেও তোমাকে নিবৃত্ত করল কিসে? তুমি কি আমার আদেশ অমান্য করলে? (হারুন) উত্তরে বলল, হে আমার সহোদর! আমার দাড়ি ও চুল

---

[১০৫] আল-তাহির ইবনে 'আশূর Al-Tahir Wa al-Tanwir, খণ্ড ১৬, (তিউনিসিয়া : আল-দার আল-তিউনিউসিইয়াহ লি আল-নাশর), পৃষ্ঠা ২৭৭।

[১০৬] দেখুন আল-কুরতুবী, al-Jami Li Ahkam al-Quran, Al-Fakher al-Razi, মাফাতীহ আল-গাইব; Al-Raghib Al- Al-Asfahani, Gharib Al-Quran এবং জার আল্লাহ আল-যামাখশারী, তাফসীর আল-কাশ্‌শাফ, সূরা সুরা ত্বহা ২০: ৮৩-৮৪।

www.pathagar.com

> ছেড়ে দিন, এ নিয়ে টানাটানি করবেন না। সত্যই আমি আপনি একথা বলবেন বলে ভয় করেছিলাম, তুমি বনীইসরাঈলের মধ্যে বিভক্তির কারণ ঘটালে এবং তুমি আমার বাক্য সম্বন্ধে সতর্ক হওনি (সুরা ত্বহা ২০ : ৯২-৯৪)।

আল-শাওকানী ফাতহ আল-কাদীর গ্রন্থে বলেন যে, এ আয়াত সত্যই আপনি এ কথা বলবেন বলে ভয় করেছিলাম যে, তুমি বনীইসরাঈলের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করলে-এর অর্থ এই যে আমি ভয় করেছিলাম যদি আমি বিছিন্ন হয়ে পড়ি এবং তাদের বিভক্ত হওয়ার কারণ ঘটাই, তাহলে আপনি বলবেন আমি গোষ্ঠীতে বিভক্তি সৃষ্টি করেছি। এর কারণ এই যে, যদি হারুন তাদেরকে ত্যাগ করতেন তাহলে কিছু গোষ্ঠী তাঁকে অনুসরণ করত এবং অন্যরা তাঁকে অমান্য করে বাছুরটিকে দেখে সামিরীর সাথে থেকে যেত। সম্ভবত এটা তাদের পরস্পরের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করত, যার মানে দাঁড়াত তুমি (হারুন) আমার কথার সম্মান দাওনি, না গোষ্ঠী সম্পর্কে আমার নির্দেশ বাস্তবায়ন করেছ বা তার পক্ষাবলম্বন করেছ। তাঁর (হারুনের) প্রতি মুসার নির্দেশের অর্থ হলো :

> আমার পক্ষ হতে আমার লোকদের মধ্যে কাজ করবে এবং যথাযথ করবে (সুরা আ'রাফ ৭ : ১৪২)।

আবু উবাইদ বলেন, এই আয়াতের এবং তুমি আমার কথার সম্মান দাওনি (সুরা ত্বহা ২০ : ৯৪) অর্থ হচ্ছে যে, তুমি আমার কথার বা প্রত্যাবর্তনের জন্য অপেক্ষা করোনি। কারণ তুমি আমাকে তাদের সাথে থাকার নির্দেশ দিয়েছিলে। সুতরাং হারুন মুসার কাছে তৎক্ষণাৎ ক্ষমা চাইলেন যেমন- আল-আরাফের ১৫০ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, লোকেরা তো আমাকে দুর্বল মনে করেছিল এবং আমাকে প্রায় হত্যা করেই ফেলেছিল[১০৭]।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল-তাহির ইবনে আশূর বলেন, হারুন লোকদের সাথে থেকে যাওয়ার জন্য ক্ষমা চেয়েছিলেন। এটা তাঁর বক্তব্য দ্বারাই প্রমাণিত হয়, ...আমি ভীত ছিলাম যে আপনি বলবেন আমি বিভক্তি সৃষ্টি করেছি (সুরা ত্বহা ২০ : ৯৪)। এর অর্থ হচ্ছে, আপনার (মুসা) পক্ষে আমার সম্পর্কে এভাবে চিন্তা করা ও দোষারোপ করা, আমাকে বিভক্তির জন্য দায়ী করা ছিল অবশ্যম্ভাবী। তিনি (হারুন)

---

[১০৭] আল-শাওকানী মুহাম্মদ ইব্ন আলী Fath al-Qadir, খণ্ড ৩ (বৈরুত : দার আল-ফিকর, n.a.) পৃষ্ঠা ৩৮৩।

www.pathagar.com

গোষ্ঠীগুলোর প্রতি তাঁর ক্রোধ ব্যক্ত করেছিলেন। ওদের মধ্যে তারা ছিল যারা তাদের বিশ্বাসে ছিল দৃঢ় এবং তাঁকে অনুসরণ করতে চাইত, অথচ অধিকাংশ ছিল তাঁর বিপক্ষে। তাই হারুন বিশ্বাসীদেরকে পরিচালনা করেছেন যারা তাঁর সাথে অবিচল ছিল। তিনি এই বক্তব্যকে তাঁর প্রতি মুসার কথা অনুধাবনের উপায় হিসেবে দেখেছিলেন ঠিকমতো করবে এবং অপরাধকারীদের পথ অনুসরণ করবেনা (সুরা আ'রাফ ৭ : ১৪২)। এটাই তাই যা এখানে মুসার বক্তব্য হিসেবে উদ্ধৃত হয়েছে, তুমি আমার কথার সম্মান করোনি (সুরা ত্বহা ২০ : ৯৪)। তাই এটাই হচ্ছে মুসার সমগ্র কাহিনী, যা হারুন মূল্যায়ন করেছিলেন তাঁর মত অনুযায়ী। এটা ছিল উম্মাহর পরিচালন ব্যবস্থায় তাঁর ইজতিহাদ। তিনি দুটি বিবদমান জনস্বার্থের মুখোমুখি হয়েছিলেন (মুসলাহা); একটা ছিল ইমান (আকীদাহ) সংরক্ষণ সংক্রান্ত এবং অন্যটি ছিল বিচ্ছিন্নতা হতে কাওমকে রক্ষা করা। শেষ পর্যন্ত হারুন উম্মাহর আকীদা রক্ষার চেয়ে তাদের জীবন, সম্পদ ও ভ্রাতৃত্ব রক্ষার স্বার্থকেই প্রভাবশীল বিবেচনা করলেন এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী যে তা হবে অধিকতর স্থায়ী। কারণ আকীদা সংরক্ষণের স্বার্থে ঘাটতি মুসার প্রত্যাবর্তনের পর সংশোধন করা সম্ভব এবং মুসার প্রত্যাবর্তনের পর বাছুর পূজা নিষিদ্ধ করলে এর প্রতি একাগ্রতারও অবসান ঘটবে। এটা ছিল জীবন, সম্পদ ও ঐকমত্য রক্ষার বিপরীত যা পরিশুদ্ধকরণ কঠিন। যা তাঁর কথায় প্রকাশ পেয়েছে সত্যই আমি আপনার এই কথার জন্য ভয় পেয়েছিলাম তুমি ইসরাঈলের সন্তানদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করেছ এবং আমার কথার মূল্য দাওনি (সুরা ত্বহা ২০ : ৯৪)।

আল-তাহির ইবনে আশূর হারুনের ইজতিহাদ সম্পর্কিত ধারণার প্রতিবাদ করেন যা তিনি বিসদৃশ মনে করেন। কিন্তু মুসার উপদেশকে প্রভাবশীল এবং অবশ্য অনুসরণীয় গণ্য করেন, এই বলে তাঁর অর্থাৎ হারুনের ইজতিহাদ বিসদৃশ ছিল। কারণ মূল (বিশ্বাস) কে সংরক্ষণ করা শরীআতে অধিকতর মৌলিক বিষয় ছিল এর থেকে উদ্ভূত নীতি রক্ষার চেয়ে। কারণ বিশ্বাস হচ্ছে মূল যা হতে সামাজিক স্বার্থ উৎসারিত হয়। এটাই তাই যা আমরা ইসলামি সামাজিক শৃঙ্খলা গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছি। তাই, মুসা এ বাস্তবতা সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন না যে হারুনের পক্ষে তাদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পরিত্যাগ করে তাঁরই ভাইকে অনুসরণ করাই কাম্য ছিল এটা জেনে কিভাবে তা তাদের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করবে। শরিয়াহর বিশুদ্ধতা কোনো প্রকার আপোষ ছাড়াই এর নীতিমালা সংরক্ষণের মধ্যে নিহিত। এর বিশুদ্ধতাসহ শরিয়াহর প্রভাব উম্মতের মধ্যে বিরাজমান থাকবে, যারা তা আমল

www.pathagar.com

করবে, যা আমি ইতোমধ্যেই 'মাকাসিদ আল-শরিয়াহ (শরিয়ার লক্ষ্যসমূহ) গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছি[১০৮]।

বাহ্যত, হারুনের আচরণ বিষয়ে আল-তাহির ইবনে আশূর'র যুক্তি প্রমাণ ছিল যথাযথ এবং এমনকি মুসার অবস্থার প্রভাবশীলতায় তার চেয়েও বেশি, কারণ শরিয়াহর বিশুদ্ধতা কোনো আপোষ ছাড়াই এর সংরক্ষণের মধ্যে নিহিত, যা ইতোমধ্যেই গ্রন্থকার কর্তৃক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। হারুনের প্রতি মুসার নির্দেশের পূর্ণতা ও সঠিকত্ব নিম্নবর্ণিত আয়াতে পূর্ববর্তীজনের বক্তব্য দ্বারা সমর্থিত।

> মুসা বলল, হে আমাদের প্রভু! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করো এবং আমাদেরকে তোমার দয়ায় আশ্রয় দাও আর তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু (সুরা আ'রাফ ৭ : ১৫১)।

তাঁর প্রতি দয়ার জন্য মুসার এই প্রার্থনা ছিল তার লোকদের রেখে তাড়াহুড়ো করার কারণে এবং ভাই হারুনের প্রতি দয়ার জন্য প্রার্থনা ছিল পরের জন কর্তৃক প্রথম জনের নির্দেশ ও পরামর্শ অমান্য করার কারণে। যাই হোক, এ আয়াত থেকে হারুন আ.-এর আচরণ স্পষ্ট যা নির্ভুলভাবে প্রকাশিত হয়েছে আল্লাহ তায়ালার বাণীতে,

> এবং আমাদের অনুগ্রহ স্বরূপ আমরা তাকে তার ভাই হারুন (কেও) একজন নবি হিসেবে দিয়েছি (সুরা মারইয়াম ১৯ : ৫৩)।

এটা তাঁর পক্ষ হতে একটি ইজতিহাদ। মুসার বক্তব্যেও এর প্রতি সমর্থন মেলে, এ ইঙ্গিতসহ যে জনস্বার্থের প্রভাবশীলতা বিবেচনা করে হারুন বাহ্যত মুসার নির্দেশের বিপরীত কাজ করেছিলেন। মুসার বক্তব্য নিম্নের আয়াতে উঠে এসেছে,

তবে কি তুমি আমার নির্দেশ অমান্য করলে (সুরা ত্বহা ২০ : ৯৩)? এবং হে আমার প্রভু! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করো (সুরা আ'রাফ ৭ : ১৫১)।

এসব দৃষ্টান্ত সমস্যা সমাধানে ইজতিহাদের বৈধতার প্রমাণ দেয়, এমনকি নবিদের ক্ষেত্রেও। এটা আল্লাহ তায়ালার প্রজ্ঞা যে তিনি ইজতিহাদকে জনস্বার্থের সাথে সম্পর্কিত করেছেন এর ফলাফল কাম্য বা ভ্রমাত্মক যা-ই হোক না কেন, এতে করে ইজতিহাদ সভ্য উম্মাহর জন্য অন্যতম ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছে, যা অবিরামভাবে এর (উম্মাহর) পূর্ণতাকে শিখরবর্তী করতে অবদান রেখে চলেছে।

---

[১০৮] Muhammad Al-tahir Ibn 'Ashar, Al-Tahrir Wa al-tanwir, ১৬শ খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৭৭।

www.pathagar.com

ইসরাঈলদের সম্পর্কে আয়াত যারা হালালকে হারাম করেছিল

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে বনী ইসরাঈল নিজের জন্য যা হারাম করেছিল তাছাড়া ইসরাঈলের সন্তানদের জন্য যাবতীয় খাদ্যই হালাল ছিল। বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে তাওরাত আন এবং পাঠ করো (সুরা আলে ইমরান ৩ : ৯৩)।

ইবনে আল-জাওযী যাদ আল-মানসূর গ্রন্থে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তাদের দুটো ভিন্ন মত ছিল : তারা এগুলোকে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে হারাম করেছিল অথবা তাঁর ইজতিহাদের ভিত্তিতে করেছিল[১০৯]।

আবু আল-হুসাইন আল-বাসরী বলেন, ইবাদতের সাথে সম্পর্কিত আয়াতে অনেক প্রমাণ রয়েছে [অর্থাৎ দায়িত্বশীলের নিকট অর্পণ করা (মুকাল্লাফ) তার ইজতিহাদভিত্তিক নির্দেশের কর্তৃত্ব]। এর এক প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বাণী,

> ইসরাঈলের সন্তানদের কাছে সব খাদ্যই হালাল ছিল, ইসরাঈল নিজের জন্য যা হারাম করেছে তা ব্যতীত (সুরা আলে ইমরান ৩ : ৯৩)।

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, তার সন্তানদের নিকট খাদ্য হালাল ছিল এবং ইসরাঈলকে তার সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এটা সম্ভব যে, ইসরাঈল (খাদ্যকে) ইজতিহাদের মাধ্যমে বা শপথপূর্বক ব্রত গ্রহণ দ্বারা নিজের জন্য হারাম করেছে। সম্ভবত তাদের শরিয়াহতে, ব্রতের শপথের মধ্য দিয়ে হারাম সাব্যস্ত হয়েছিল একইভাবে যেমন আমাদের শরীআতে হয়েছে দান হিসেবে[১১০]।

ইরশাদ আল-ফুহুল গ্রন্থে নবি ও মুজতাহিদগণকে ইজতিহাদের ক্ষমতা অর্পণ প্রসঙ্গে এ আয়াত উল্লেখ করে আল-শাওকানী বলেন, ইসরাঈলের সন্তানদের জন্য সব খাদ্যই বৈধ ছিল তিনি তা নিজের জন্য অবৈধ করার পূর্বে (বিষয়াদির) ক্ষমতা আল্লাহর নবিদের মধ্যে এক নবিকে অর্পণ করা হয়। নবিগণ নিষ্পাপ এবং যদি কখনও তাঁরা কোনো ভুল করে থাকেন তা কদাচিৎ এবং তাঁরা সাধারণত তা

---

১০৯ ইবনে আল-জাওযী আবদ আল-রাহমান ইবনে মুহাম্মদ, Zad al-Masir খণ্ড ১, ৩য় সংস্করণ (বৈরুত : আল-মাকতাব আল ইসলামি, ১৪১৪ হি.) পৃষ্ঠা ৪২৩।

১১০ আবু আল-হুসাইন আল-বাসরী, Al-Mu'tamad Fi Usul al-Fikh খণ্ড ২, সম্পাদনা-খলিল আল-মীস (বৈরুত : দার-আল কুতুব আল ইলমিইয়াহ) [১৪০৩ হিজরি] পৃষ্ঠা ৩৩৪।

www.pathagar.com

অনুমোদন করেন না। তাঁদের সব কথা ও বক্তব্য আল্লাহ তায়ালার ওহি, যিনি সর্বশক্তিমান। আমাদের নবি সা. হতেও ইজতিহাদ বিষয়ে এমনটা বলা যেতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসেবে, নবি সা.-এর কথা, যদি আমি জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হই, আমি পিছু হটি না[১১১]।

এবং তাঁর সা. উক্তি যখন তিনি কুতিলা বিন্ত আল-হারিস'র কথা শুনলেন, যদি এরা আমার নিকট আসত, আমি তাদের প্রতি ক্ষমাশীল হতাম, অর্থাৎ তাদের ভাই আল-নয্‌র ইবনে আল-হারিসের প্রতি, যে ছিল বদরযুদ্ধের একজন যুদ্ধবন্দী। উভয় গল্প ও কবিতাই বিখ্যাত ... আমি জানি নবি ও মুজতাহিদগণের জন্য ইজতিহাদের ক্ষমতার্পণের ও নির্দেশনার বৈধতা নিয়ে কোনো মতপার্থক্য নেই। এটা মতপার্থক্যের কোনো বিষয় নয়। তবে, তাদের আবেগ দ্বারা বিদ্বানদেরকে নির্দেশনার ক্ষমতার্পণ স্পষ্ট করতে যে, যারা তা প্রণয়ন করেন তার অধিকাংশই হবে মূর্খতার ওপর মূর্খতা এবং অন্ধকারের ওপর অন্ধকার[১১২]।

সাধারণ পর্যবেক্ষণ

আমাদের নবি সা. সহ অন্যান্য নবি এবং রসুলগণের ইজতিহাদ সম্পর্কে পূর্ববর্তী আয়াতসমূহ তাঁদের সকলের প্রতি অতিশয় মহিমামণ্ডিত প্রশংসা ও প্রার্থনা হতে পারে। এগুলো এ সংকেত দেয় তাঁদের ইজতিহাদে কমবেশি হয়, ঐ মুজতাহিদদ্বয়ের মধ্যে যাদের একজন মূলপাঠ ব্যাখ্যা করতে ও বোঝতে পারেন। এবং অন্যজন দুটি মূলপাঠের মধ্যে প্রভাবশীলতা নির্ণয় করতে পারেন ও বোঝতে পারেন এবং যিনি দুটি মূলপাঠের উপস্থিত মুজতাহিদের সাথে মূলপাঠে অনুপস্থিত মুজতাহিদের। তাই বলা যায়, এসব ইজতিহাদ ফকীহদের নিকট পরিচিত আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ফিকহী বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায়নি।

---

[১১১] মুসলিম ইবনে আল-হাজ্জাজ, সহিহ মুসলিম, সম্পাদনা-মুহাম্মদ ফু'য়াদ আবদ আল-বাকী, (বৈরুত : দার ইহয়া আল-কিতাব আল-আরাবী n.a.) হাদিস নম্বর-১২১১।

[১১২] মুহাম্মদ ইবনে আলী আল-শাওকানী, Irshad al-Fuhul পৃষ্ঠা ৪৪২, এ ব্যাপারে বিস্তারিত দেখুন ইবনে আল-সামানী Qawati al-Adillah Fi al-Usul, ২য় খণ্ড, সম্পাদনা -মুহাম্মদ হাসান ইবনে ইসমাঈল, ১ম সংস্করণ (বৈরুত : দার আল-কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১৯৯৭), পৃষ্ঠা ৩৩৮, আল-রাযী, ফখর আল-দীন, Al-Mahsul Min Ilm al-Usul খণ্ড ৬, সম্পাদনা : ত্বা-হা জাবির আল-আলওয়ানী, ২য় সংস্করণ (বৈরুত : মুআসসাসাহ আল-রিসালাহ, ১৯৯২) পৃষ্ঠা ২০০; আল-আমিদী সাঈফ আল-দীন, Al-Ihkam Min al-Ahkam খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২১৬।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যাকারদের অধিকাংশই মুসার ইজতিহাদকে মূলপাঠে বিদ্যমান ইজতিহাদ বলে বিবেচনা করেছেন। আল্লাহ তায়ালা মুসাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর সম্প্রদায়কে নিয়ে নির্ধারিত সময়ে অগ্রসর হতে। এটাই হচ্ছে প্রয়োজনীয় মূলপাঠ। এতদসত্ত্বেও মুসা তাঁর সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে ত্বরা করেছিলেন এবং তাই তাদের পূর্বনির্ধারিত নির্ঘন্ট অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। তিনি আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ বাস্তবায়নে বিলম্ব এবং তার তাড়াহুড়ো সম্পর্কে মাফ চেয়েছেন এই বলে,

> তোমাকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে হে আমার প্রভু! আমি তাড়াহুড়ো করেছি (সুরা ত্বহা ২০ : ৮৪)।

মুসা আ. কর্তৃক আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ অমান্য করার ক্ষেত্রে এটি অনিচ্ছাকৃত উদ্দেশ্য প্রমাণ করে। আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাৎ করার প্রতি তাঁর অচিন্তনীয় ভালোবাসার সাথে সাথে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই পৌছাতে যা মুসাকে উৎসাহিত করেছিল তা গ্রন্থকারের দৃষ্টিতে ছিল তাঁর ভাই হারুনের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা, তাঁর উত্তম স্থলাভিষিক্ত হওয়ার ব্যাপারে বিশ্বাস এবং এই নিশ্চয়তা যে নির্ধারিত সময়ে তিনি (হারুন) সম্প্রদায়কে নিয়ে আসবেন। যেহেতু লোকেরা তাঁর হেফাজতে ছিল যাঁকে মুসা তাঁর নবুওতির বিষয়াদির ব্যাপারে অংশীদার বিবেচনায় আস্থায় নিয়েছিলেন এ উক্তি দ্বারা

> এবং তাকে আমার কাজের অংশীদার করো (সুরা ত্বহা ২০ : ৩২)।

তাঁর সম্বন্ধে তিনি এভাবে বর্ণনা দিয়েছিলেন,

> এবং আমার ভাই হারুন, সে বাগ্মিতায় আমার চেয়ে পটু। সুতরাং আমার সাথে তাকে সাহায্যকারী করে প্রেরণ করো, আমাকে দৃঢ় (ও শক্তিশালী) করার জন্য (সুরা কাসাস ২৮ : ৩৪)।

যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর ভাই সব বিষয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রশংসনীয় অবস্থানে আছেন ততক্ষণ তিনি কেন দুটি উত্তম ফল অর্জন করবেন না। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাতের জন্য দ্রুত অগ্রসর হওয়া এবং আল্লাহ তায়ালার সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তাঁর ভাই হারুনের সহায়তায় লোকদেরকে আনয়ন করা? এই দৃষ্টিকোণ তাঁর ভাই-এর প্রতি মুসার আচরণ দ্বারা পুনরায় সমর্থিত হয়েছে। মুসা দেখলেন যে, তিনি যে বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন অবস্থা তার বিপরীত। তাই তিনি তাঁর ভাই-এর দাড়ি ও চুল ধরে টানলেন। এসবের প্রত্যয়ন এটাই যে, সেখানে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ ছিল

www.pathagar.com

এবং মুসা তাঁর ইজতিহাদের কারণেই তা বাস্তবায়ন করেননি। অন্য বিষয়টি হলো, হারুন তাঁর ইজতিহাদ ও সৎ উদ্দেশ্যের কারণেই মুসার নির্দেশ অনুসরণ করেননি। এটা হারুনের সাথে মুসার কথোপকথনেই স্পষ্ট হয়েছে ... তাহলে কি তুমি আমার আদেশ অমান্য করলে (সুরা ত্বহা ২০ : ৯৩)?

সকল ব্যাখ্যা ও আইনবিদের উপলব্ধির ভিত্তিতে আল্লাহর নবি ইয়াকুবের কাহিনী মুজতাহিদকে নির্দেশনা প্রদানের ক্ষমতার্পণের বৈধতা প্রমাণ করে, সাধারণ লোকের জন্য নয়। কারণ মুজতাহিদ ইজতিহাদের নীতিসমূহ জানেন, যা মুজতাহিদগণের শুদ্ধতা প্রমাণ করতে পারে। কিছু বিদ্বান নির্দেশদানের ক্ষমতাকে নবি বা শাসকদের জন্য ব্যতিক্রমধর্মী মনে করেন। এ ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে কিছু হালাল বিষয়কে শাসক কর্তৃক জনস্বার্থে নিষিদ্ধ বা অবৈধ করতে পারা।

সংক্ষিপ্ত করলে যা দাঁড়ায় তা এই যে, এসব আয়াত এবং তৎসংশ্লিষ্ট হাদিস ইজতিহাদের প্রশস্ত প্রকরণের প্রতিনিধিত্ব করে। এগুলো ইজতিহাদের বিভিন্ন পদ্ধতিও তুলে ধরে, যা মূলপাঠের অন্তর্ভুক্ত ও মূলপাঠ বহির্ভূত ইজতিহাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণায়ক, কুরআন সুন্নাহ-বহির্ভূত ও ইজতিহাদের কথাও বলে যা ইসলামি কল্যাণ অর্জনে এবং এর মূর্ছনা নিশ্চিতকরণে সহায়ক।

নবি মুহাম্মাদ সা.-এর ইজতিহাদ

আমাদের নবি মুহাম্মাদ (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) এর ইজতিহাদ একাধিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ তায়ালা তাঁর জন্য কিছু ইজতিহাদ অনুমোদন করেছেন এবং কিছু ইজতিহাদ রয়েছে যার জন্য তাঁকে ভৎর্সনা করা হয়েছে। নিম্নে এরকম গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় উল্লেখ করা হলো।

১. নবি সা.-এর ইজতিহাদ বদরের যুদ্ধে ধৃত যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে। যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে কী করা হবে তা স্থির করার জন্য তিনি তাঁর কয়েকজন সাহাবিকে দায়িত্ব দেন। আবু বকর সিদ্দীক রা. এর মতো ছিল যুদ্ধবন্দীদের ক্ষমা করে দেওয়া, ওমর রা. ও আলী রা. সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তাদের শিরশ্ছেদ করা হোক। আল-বাগাভি ঘটনার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন এভাবে : তিনি বলেন যখন বদর যুদ্ধের যুদ্ধবন্দীদের আনা হলো, নবি (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) জিজ্ঞাসা করলেন, এদের (যুদ্ধবন্দীদের) সম্পর্কে তোমাদের কি মতো? আবু বকর রা. বললেন, হে আল্লাহর রসুল সা.! আপনার পরিবার ও লোকেরা

www.pathagar.com

তাদের সাথে সম্মুখে রয়েছে এবং তাদের সঙ্গে আছে রোগী। সম্ভবত আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে ক্ষমা করবেন। তাদের কাছ থেকে মুক্তিপণ নিন, এটা কাফেরদের ওপর আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করবে। ওমর রা. বললেন, হে আল্লাহর রসুল সা.! তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলেছে, বিতাড়িত করেছে। তাদেরকে দিন আমরা শিরশ্ছেদ করি। আলী আকীলের গর্দান উড়িয়ে দিক; হামযা আল-আব্বাসের; আমি ওমর অমুক এবং অমুকের গর্দান উড়াই। এরা সবাই কাফিরদের নেতা। আবদুল্লাহ ইব্ন রাওয়াহা বললেন, হে আল্লাহর রসুল সা.! কাষ্ঠভর্তি উপত্যকা দেখুন, এদেরকে তার মধ্যে রাখুন এবং কাঠে আগুন জ্বালিয়ে দিন। আল-আব্বাস তাঁকে (রসুলকে) বললেন, আপনি আপনার পারিবারিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন। নবি সা. নীরব রইলেন এবং তাদের কারো কথার জবাব দিলেন না। তারপর তিনি আলোচনায় অংশ নিলেন এবং বললেন, (সেখানে) লোকেরা রয়েছে (যারা) আবু বকরের মতো সমর্থন করবে, (সেখানে) এমন লোক রয়েছে (যারা) সমর্থন করবে উমারের মতো এবং (সেখানে) এমন লোকও রয়েছে (যারা) ইব্ন রাওয়াহার মতো সমর্থন করবে, অতঃপর নবি সা. বের হয়ে এলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মানুষের অন্তর কোমল করবেন যতক্ষণ না তা কোমলতার চেয়ে কোমল হয় এবং মানুষের অন্তর কঠোর করবেন যতক্ষণ না তা পাথরের চেয়ে শক্ত হয়। হে আবু বকর! তোমার দৃষ্টান্ত ইবরাহীমের অনুরূপ যিনি বলতেন, যারা আমার অনুসরণ করে তারা আমার (অন্তর্ভুক্ত) এবং যারা প্রত্যাখ্যান করে তুমি (হে আল্লাহ) অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। এবং তোমার দৃষ্টান্ত হে আবু বকর! ঈসার অনুরূপ যিনি বলেছিলেন, যদি তুমি (আল্লাহ) তাদেরকে শাস্তি দাও তারা তোমার বান্দা এবং যদি তুমি তাদের ক্ষমা করো তবে তুমিতো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তোমার দৃষ্টান্ত হে ওমর! নূহের মতো, যিনি বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! কোনো অবিশ্বাসীকে এই ধরণীতে রাখবেন না। হে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা! তোমার উপমা মুসার ন্যায় যিনি বলেছিলেন, আমাদের প্রতিপালক তাদের ধনসম্পদের উপকরণাদি বিনষ্ট করবেন এবং তাদের অন্তরে কাঠিন্য প্রবিষ্ট করাবেন যাতে তারা কঠিন শাস্তি পাওয়ার পূর্বে বিশ্বাস না করে। অতঃপর নবি সা. বললেন, আজ তোমাদের নিকট রয়েছে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক পরিবার এবং তাদের কেউই মুক্তিপণ কিংবা শিরশ্ছেদ ছাড়া পালাতে পারবে না। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ সাড়া দিয়ে বললেন, সুহাইল ইবনে বাইদা ব্যতীত। আমি তাকে ইসলাম সম্পর্কে বলতে শুনেছি (ইতিবাচকভাবে)। নবি

www.pathagar.com

সা. নীরব রইলেন। তিনি (ইবনে মাসউদ) বললেন, আজকের দিনের মতো এত ভীত আপনি আমাকে দেখেননি, যেন আকাশ হতে পাথর পতিত হবে, সেইদিনের চেয়ে যা সম্পর্কে নবি সা. বলেছেন, সুহাইল ইবনে বাইদা ব্যতীত। ইবনে আব্বাস এবং 'ওমর ইবনে আল-খাত্তাব বলেন নবি সা. আবু বকরের মতের প্রতি ঝুঁকলেন, আমি যা বলেছিলাম তার প্রতি নয়। তিনি তাদের (যুদ্ধবন্দীদের) কাছ থেকে মুক্তিপণ গ্রহণ করলেন। পরদিন যখন নবি সা. এবং আবু বকর বসে বসে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছিলেন তখন আমি (ওমর) বললাম, হে আল্লাহর রসুল সা.! আমি কি আপনার ও আপনার সাথীর কান্নার কারণ জানতে পারি? যদি দেখি আমারও কান্নার প্রয়োজন তাহলে আমিও কাঁদব এবং যদি কোনো কারণ না দেখি তাহলে আপনাদের উভয়ের স্বার্থে কাঁদার ভান করব। নবি সা. বললেন, আমি তোমার সঙ্গীদের জন্য কাঁদছি কারণ তারা মুক্তিপণ নিয়েছে।

মন্তব্য

বদর যুদ্ধের সময় হস্তগত বন্দীদের সম্পর্কে নবি সা.-এর ইজতিহাদের তিনটি মাত্রা রয়েছে। প্রথম আল-কুরআন, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সমর্থন করেছে উমারের মতো। কারণ যুদ্ধবন্দীরা নবি সা. এবং তাঁর অনুসারীদের সাথে নৃশংস ব্যবহার করেছিল। তারা নির্দয়ভাবে তাঁকে মক্কা হতে বিতাড়িত করেছিল, তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল এবং এখন মদিনায় এসেছিল তাঁকে ও তাঁর সাথীদেরকে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে। দ্বিতীয়, এই অমনুষ্যোচিত ব্যবহারের পরেও মানুষের প্রতি শান্তি ও ক্ষমার নবি সা. বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে পরম উদারতা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেছিলেন। তৃতীয়ত, আল্লাহ তায়ালা তাঁর রসুলের সা. ইজতিহাদকে অনুমোদন করেছিলেন যদিও তাদেরকে হত্যা করাই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্ত ও ইজতিহাদ তাঁর নির্দেশনা ছিল একই রেখায় যেখানে বিকল্পসমূহ সমানভাবে প্রশংসনীয়।

২. রসুল সা.-এর ইজতিহাদের দ্বিতীয় উদাহরণ হলো তাবুক যুদ্ধের সময় কিছু সংখ্যক মুনাফিককে পেছনে থেকে যাওয়ার অনুমতি প্রদান। আল্লাহ তায়ালা নিম্নের ভাষায় তাঁকে এই অনুমতি প্রদানের জন্য ভৎর্সনা করেছেন,

আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ক্ষমা করেছেন। কারা সত্যবাদী তা তোমার নিকট স্পষ্ট না হওয়া এবং কারা মিথ্যাবাদী তা না জানা পর্যন্ত তুমি ওদেরকে অব্যাহতি দিলে (সুরা তাওবা ৯ : ৪৩)।

www.pathagar.com

আবদ্ আল-রায্যাক আমরু ইবনে মাইমুন আল-আওযী হতে বর্ণনা করেন যে, রসুল সা. দুটো কাজ করেছিলেন যার জন্য তাঁকে আদেশ দেওয়া হয়নি : মুনাফিকদেরকে অব্যাহতি প্রদান এবং যুদ্ধবন্দীদের নিকট হতে (মুক্তিপণ) গ্রহণ। এ উপলক্ষে আল্লাহ তায়ালা (সুরা আত্ তাওবা ৯ : ৪৩) অবতীর্ণ করেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাকে ক্ষমা করেছেন! কেন তুমি তাদেরকে অব্যাহতি দিলে? (আউন আল-মা'বুদ, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২৫)

৩. অন্য আরেকটি ঘটনায় আল্লাহ তায়ালা নবি সা.-কে তিরস্কার করেন, আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুমকে অবহেলা করে তাঁর মুখ ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য, যা এই আয়াতে প্রকাশ পেয়েছে,

> (নবি) ভ্রুকুঞ্চিত করলো এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন, কারণ তাঁর কাছে এলো অন্ধ লোকটি (কথার মাঝখানে বাধা হয়ে)। তুমি কেমন করে জানবে সে (আধ্যাত্মিকভাবে) পরিশুদ্ধ হতো (সুরা আবাসা ৮০ : ১-৩)!

রসুল সা.-এর হাদিস এবং অন্য কিছু তাঁর ইজতিহাদ এবং তাঁর ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা থাকার পরেও ওহির বিদ্যমানতা কিংবা তা অবতীর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা সত্ত্বেও ভুল করে ফেলা, এটাই প্রদর্শন করে যে সৃজনশীল ইজতিহাদ এমনকিছু যা প্রাথমিকভাবে প্রশংসাযোগ্য। সৃজনশীল ইজতিহাদের পথে অপরাধ বাধা হতে পারে না। এসব ঘটনার দ্বারা এটা প্রমাণিত যে শরীআতে ঘটনার নির্দেশনায় ইজতিহাদ উৎকীর্ণ রয়েছে এবং ইজতিহাদের ফলে সংঘটিত কোনো ভুল ইজতিহাদ ও সৃজনশীলতার সুবিধাকে নিম্নগামী করে না। বরং বিভিন্ন ঘটনায় কৃত ভুল পূর্ণতার উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ একজন বিশ্বাসী একই গর্ত হতে দু'বার দংশিত হয় না।

সাহাবা আজমাঈন-এর যুগে ইজতিহাদ

সাহাবি রা. দের নিকট হতে প্রাপ্ত হাদিসসমূহ, বিদ্বানগণ যার শ্রেণিবিভাগ করেছেন ও বর্ণনা দিয়েছেন ইজতিহাদ প্রণয়নের সাক্ষ্য ও প্রমাণ হিসেবে, তা অনেক। এমন কতকগুলো আছে যা নবি সা.-এর অনুমোদন লাভ করেছে, এবং তার প্রেক্ষিতে ইজতিহাদের পদ্ধতি বিকাশ লাভ করেছে। এরপরেও এমন কতকগুলো রয়েছে যা পেয়েছে সাহাবিগণের সমর্থন, এর মধ্যে ঐগুলোও রয়েছে যা রসুল সা. এর জ্ঞান ও পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এসব হাদিসের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংখ্যক উল্লেখ করা হলো :

www.pathagar.com

ক) মুয়ায ইবনে জাবাল রা. কে ইয়েমেনে বিচারক করে বিদায় দেওয়ার প্রাক্কালে রসুল সা.-এর হাদিস। তিনি (নবি) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, হে মুয়ায! তুমি কিভাবে বিচার করবে? তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালার কিতাবের সাহায্যে। (বলা হলো), যদি তা আল্লাহ তায়ালার কিতাবে পাওয়া না যায়? তিনি বললেন, আল্লাহর রসুল সা.-এর সুন্নাহর সাহায্যে, যদি তা আল্লাহর রসুলের সুন্নাতে পাওয়া না যায়? তিনি বললেন, আমি আমার মতামত দ্বারা ইজতিহাদ করব এবং কোনোরূপ কার্পণ্য করব না, তিনি সা. বললেন, প্রশংসা সেই আল্লাহ তায়ালার যিনি তাঁর নবির সেই বাণীবাহককে গ্রহণ করেছেন যাকে আল্লাহর নবি ভালোবাসেন[১১৩]।

এই হাদিসটি ইজতিহাদের পক্ষে প্রসিদ্ধতম হাদিসসমূহের অন্যতম। তাছাড়া সৃজনশীলতার দায়িত্বে রত, অর্থাৎ মুজতাহিদের জন্য এটা এতটাই মূল্যবান যাতে তাকে অবলীলায় তার যুক্তিবুদ্ধি ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এটা, নবি সা. এর অনুমোদন গোড়াতেই পাওয়ায় আল্লাহ তায়ালার অনুমোদন পাওয়ার দৃষ্টান্ত হয়েছে।

খ) ইবনে উমারের বর্ণনা, তিনি বলেন, আল-আহযাব যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের দিন রসুল সা. ঘোষণা করেন যে, তোমরা বনী কুরায়যায় না পৌঁছানো পর্যন্ত আসরের সালাত আদায় কোরো না। কিছু লোক সালাতের ওয়াক্ত অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার আশংকায় (আসর) সালাত আদায় করল বনী কুরায়যায় পৌঁছানোর পূর্বেই। অন্যরা বলল, আমরা আল্লাহর রসুল সা.-এর নির্দেশিত স্থানে না পৌঁছানো পর্যন্ত সময় চলে গেলেও সালাত আদায় করব না। সুতরাং তারা বনী কুরায়যায় না পৌঁছানো পর্যন্ত (আসরের) সালাত বিলম্বিত করল

---

[১১৩] আহমদ কর্তৃক আল-মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণিত : হাদিস নম্বর - ২২০৬০; আল-তিরমিযী তাঁর সুনান গ্রন্থে 'বিচারকগণ কিভাবে বিচার করেন' শীর্ষক অধ্যায়ে' হাদিস নম্বর-১৩২৮; আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনে আল-আশ'আব, সুনান আবু দাউদ; সম্পাদনা : মুহাম্মদ মুহয়ী আল-দীন 'আবদ আল-হামীদ, (বেরুত : দার আল-ফিক্‌র) বিচারকার্যে আইনী মতামত নামক অধ্যায়, হাদিস নম্বর - ৩৫৯২। আল-বাইহাকী, আল-সুনান আল-কুবরা; বিচারক তাঁর রায়ে কিসের ওপর নির্ভর করেন এবং মুফতী তাঁর ফাতওয়ায় কিসের ওপর নির্ভর করেন; শীর্ষক অধ্যায়, হাদিস নম্বর - ২০১২৬।

www.pathagar.com

এবং সেখানে পৌঁছে রাত্রে সালাত পড়ল। তিনি বলেন, তিনি (নবি সা.) দুই দলের কোনোটিকেই ভৎর্সনা করেননি[১১৪]।

এ হাদিসে স্পষ্ট যে, ঘটনাবিষয়ক নির্দেশনায় ইজতিহাদ কিংবা উত্তম বিশ্লেষণ কিছুটা বৈধভাপূর্ণ এবং এর মধ্যে কোনো পার্থক্যকারী মতামত ইজতিহাদের গুরুত্বকে হ্রাস করে না। বরং নবি (তার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) এ রকম কারো ত্রুটিকে নিন্দা করেননি, যা পদ্ধতিবিদদেরকে উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠাতায় পরিণত করেছে।

গ) বনী কুরায়যায় সা'দ ইবনে মুয়ায-এর বিষয়ে (নির্দেশনার ক্ষেত্রে) নবি সা.-এর সিদ্ধান্ত। তিনি (সাদ) তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন এবং শিশুদেরকে কয়েদ করার নির্দেশ দেন। রসুল সা. তাঁর নির্দেশনা অনুমোদন করেন এই বলে, তুমি সপ্ত আসমানের উপর হতে আল্লাহ তায়ালার নির্দেশের ভিত্তিতে তাদের ব্যাপারে রায় দিয়েছ[১১৫]।

অতএব যেখানে ইজতিহাদভিত্তিক তাঁর কোনো সাহাবির সিদ্ধান্তকে নবি সা. তাদের মধ্যে থাকা অবস্থাতেই সমর্থন করেছেন, সেখানে ইজতিহাদ ও সৃজনশীলতার গুরুত্ব বিষয়ে অধিক সাক্ষ্য পেশ করার প্রয়োজন হয় না। ঘটনার নির্দেশনার ক্ষেত্রে সৃজনশীলতা ও ইজতিহাদের পদ্ধতির তাত্ত্বিক ভিত্তির এটাই নির্যাস।

আরো অসংখ্য হাদিস রয়েছে, যা ইজতিহাদ করা ও সৃজনশীলতাকে দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করে। সেগুলোর মধ্যে নিম্নবর্ণিতগুলো উল্লেখযোগ্য :

১. শু'আইব হতে বর্ণিত যে, আবু বকর সিদ্দীককে আল-কালা লাহ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল এবং তিনি জবাবে বলেছিলেন, আমি আমার নিজস্ব মতামতের ভিত্তিতে এ ব্যাপারে বলব। যদি আমার মতো সঠিক হয় তবে তা হবে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে। কিন্তু যদি তা ভুল হয়, তা আমার ও শয়তানের পক্ষ হতে। এর (আল-কালালাহ) দ্বারা আমি এমন ব্যক্তিকে বুঝি যার মাতাপিতা বা সন্তান নেই। ওমর যখন খলীফা হলেন, তিনি বললেন, আবু বকর যা বলেছেন

---

১১৪ আল-বুখারি, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল, সহীহ আল-বুখারি; সম্পাদনা : মুস্তাফা দীব আল-বাঘা, ২য় সংস্করণ (বৈরুত : দার ইবনে কাসীর এবং দার আল-ইয়ামামা, ১৯৮৭), হাদিস নম্বর-৯০৪।

১১৫ আল-বুখারি, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, সহিহ আল-বুখারি, হাদিস নম্বর-২৮৭৮ এবং মুসলিম ইবনে আল-হাজ্জাজ, সহিহ মুসলিম, হাদিস নম্বর-১৭৭৬৮।

www.pathagar.com

তার কিছু বিপরীত বললেও আমি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে লজ্জা বোধ করি না[১১৬]।

২. শারীহ্ আল-কাদীর হতে আমির কর্তৃক বর্ণিত তিনি বলেন, ওমর ইবনুল খাত্তাব আমাকে বললেন যে, তোমার নিকট আল্লাহ তায়ালার কিতাব হতে যা সত্য বলে প্রতীয়মান হচ্ছে তা দিয়ে বিচার করবে। যদি তোমার (কোনো সাক্ষ্য) জানা না থাকে আল্লাহ তায়ালার কিতাব হতে, তাহলে আল্লাহ তায়ালার দূত সা. হতে তোমার রায় দিয়ে দেবে। আল্লাহ তায়ালার দূত সা.-এর কাছ থেকে কোনো নির্দেশের পক্ষে সমর্থন না পাওয়া গেলে, তুমি বিশ্বাসীদের নেতা হিসেবে তোমার নিকট যা প্রমাণিত তা দ্বারা বিচার করবে। ইজতিহাদ করো (তোমার মতামতের ভিত্তিতে) এবং জ্ঞানী ও সৎ লোকদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে[১১৭]।

৩. ওমর হতে বর্ণিত যে তিনি আবু মুসা আল-আশ'আরীকে লিখলেন, তোমার নিকট আল-কুরআন বা সুন্নাহর বাইরে যা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় তা উপলব্ধিতে চাই প্রগাঢ় বোধশক্তি। তারপর এর ভিত্তিতে বিষয়াবলী ওজন করবে, বৈসাদৃশ্য ও সাদৃশ্য জানবে, অতপর আল্লাহ তায়ালা যা পছন্দ করেন তা দিয়ে সেগুলোকে নির্ণয় করবে এবং এর সাথে সত্যের তুলনা করবে[১১৮]।

৪. যখন আল্লাহ তায়ালার রসুলের সা. সেনাপতি জা'ফর ইবনে আবু তালিব, যায়িদ ইবনে হারিসা এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুম) মু'তার যুদ্ধে শহীদ হলেন এবং সেনাবাহিনী সেনাপতিবিহীন রইল।

---

১১৬ দেখুন আল-তাবারী, আবু জারীর, তাফসীর আল-তাবারী, খণ্ড ৪, পৃ-২৮৩; ম আল-দারিমী, আবদুল্লাহ ইবনে আবদ আল-রাহমান, সুনান আল-দারিমী, সম্পাদনা : ফাওয়ায আহমাদ যামরালী এবং খালিদ আল-সাব'উ আল-'আলামী, ১ম সংস্করণ (বৈরুত : দার আল-কিতাব আল-আরাবী; ১৪০৭ হি.), হাদিস নম্বর-২৯৭২।

১১৭ আল-বাইহাকী, আবু বকর, আল-সুনান আল-কুবরা; সম্পাদনা : আবদ আল-কাদীর মুহাম্মদ 'আতা, (মক্কা : মাকতাবাহ দার আল-বা-য, ১৯৯৪), হাদিস নম্বর-২০০৯৯।

১১৮ আল-বাইহাকী, আবু বকর, আল-সুনান আল-কুবরা, হাদিস নম্বর-২১৩৪; আল-দারকুতনী, আলী ইবনে হাসান, সুনান আল-দারকুতনী, খণ্ড ৪, সম্পাদনা : আবদুল্লাহ হাশিম ইয়ামানী আল-মাদানী (বৈরুত : দার আল-মা'রিফা, ১৯৬৬), পৃষ্ঠা ২০৬, আল-শায়বানী মুহাম্মদ ইবনে আল-হাসান, কিতাব আল-হুজজাহ, খণ্ড ২; সম্পাদনা : মাহদী হাসান আল-কায়লনানী, ৩য় সংস্করণ (বৈরুত : আলম আল-কুতুব, ১৪০৩ হি.), পৃষ্ঠা ৫৭০; ইবনে হাযম 'আলী ইবনে আহমদ, আল-ইহকাম, খণ্ড ৭, ১ম সংস্করণ (কায়রো : দার আল-হাদিস, ১৪০৪ হি.), পৃষ্ঠা ৪২৪।

www.pathagar.com

তারা সম্মত হলো খালিদ ইবনে আল-ওয়ালীদকে সেনাপতি করতে এবং তাঁকে তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করা হলো। তিনি (খালিদ) তাদের সিদ্ধান্তে সম্মতি জানালেন। অতঃপর নবি সা. তা অনুমোদন করেছিলেন।

৫. আমর ইবনে আল-আস এর হাদিস- যিনি একের পর এক যুদ্ধের সময় কোনো এক খুব ঠাণ্ডা রাত্রে অপবিত্র (জুনুব) অবস্থায় পতিত হয়েছিলেন। তিনি পানি ব্যবহারে ক্ষতির আশংকা করলেন। সুতরাং তিনি তায়াম্মুম করলেন এবং সালাতে লোকদের ইমামতি করলেন। যখন লোকেরা নবি সা.-এর নিকট এলো তখন বলল, হে আল্লাহর নবি! তিনি আমাদের সালাতে ইমামতি করেছেন অথচ তখন তিনি নাপাক অবস্থায় ছিলেন। তিনি সা. বললেন :

হে আমরু! তুমি কি জুনুবী (অপবিত্র) অবস্থায় লোকদের সালাতে ইমামতি করেছ? তিনি রা. উত্তর দিলেন, আমি ভেবেছিলাম যদি আমি গোসল করি তাহলে ধ্বংস হয়ে যাব এবং আমি সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালাকে বলতে শুনেছি, এবং নিজেদেরকে হত্যা কোরো না (সুরা নিসা ৪ : ২৯)।

তখন নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেসে ফেললেন।

৬. সা'দ আল-কারহ্ এবং সা'ঈদ ইবনে আল-মুসাইয়িব হতে বর্ণিত যে, বিলাল রসুল সা.-এর নিকট এলেন ফজর সালাতের (ইমামতের) অনুমতির জন্য। তিনি এই সালাতের জন্য আহ্বান জানাবার (আযান দেওয়ার) পর। তারা বলেন, আল্লাহর রসুল সা. ঘুমিয়ে ছিলেন। বিলাল তখন উচ্চস্বরে আযান দিলেন, নিদ্রা অপেক্ষা সালাত উত্তম। তিনি [নবি সা.] এই নতুন শব্দাবলী ফজরের সালাতে অন্তর্ভুক্ত করার অনুমতি দিলেন।

৭. আলী যখন ইয়েমেনে ছিলেন, তিন ব্যক্তি একটি বালককে কেন্দ্র করে মতবিরোধ করে তাঁর কাছে এলো। তাদের প্রত্যেকেই দাবি করল, সে আমার ছেলে। সুতরাং আলী তাদের মধ্যে লটারি করলেন বালকটির ব্যাপারে এবং লটারিতে বিজয়ীর কাছে বালকটিকে হস্তান্তর করলেন। তারপর অন্য দুজনের নিকট হতে পণের দু-তৃতীয়াংশ দাবি করলেন। (এই কাহিনী) রসুল সা.-এর নিকট পৌঁছালে তিনি আলীর দেওয়া রায়ের বিষয়ে হেসে উঠলেন, এতে তাঁর দাঁত দেখা গেল[১১৯]।

---

[১১৯] দেখুন আল-হাকিম, মুহাম্মদ ইবনে 'আবদুল্লাহ, আল-মুস্তাদরাক 'আল-সহীহাইন, সম্পাদনা : মুস্তাফা 'আবদ আল-কাসীর 'আতা, ১ম সংস্করণ (বৈরুত : দার আল-কুতুব আল-ইলমিয়াহ,

www.pathagar.com

৮. দুই সাহাবি সংক্রান্ত হাদিস যাঁরা সফরে বের হয়েছিলেন। সালাতের সময় হয়ে গেল এবং তাঁরা (ওজুর জন্য) পানি সংগ্রহ করতে পারলেন না, তথাপি তারা সালাত আদায় করলেন। তারপর সালাতের সময় অতিবাহিত হওয়ার পূর্বেই তারা পানি দেখতে পেলেন। তাদের একজন পুনরায় সালাত পড়লেন এবং অন্যজন পড়লেন না। তিনি [নবি সা.] তাদের উভয়ের (কাজের) প্রতি সমর্থন জানালেন। যিনি সালাত পুনরায় পড়েননি তাকে তিনি সা. বললেন, তুমি সুন্নাতের অনুসরণ করেছ এবং আমি তোমার সালাতকে স্থানান্তরিত করেছি। অন্যজনকে তিনি রসুল স. বললেন, তুমি দু'বার করে পুরস্কার পেয়ে গিয়েছ[১২০]।

৯. 'আকরামাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্বাস কর্তৃক আমি যায়িদ ইবনে সাবিতের নিকট প্রেরিত হয়েছিলাম স্বামী-স্ত্রী এবং মাতাপিতার (অংশ) সম্পর্কে তাঁর কাছে থেকে জানার জন্য। তিনি (যায়িদ) বললেন, স্বামী-স্ত্রীর জন্য এক অর্ধাংশ, মায়ের জন্য পরিত্যক্ত সম্পদের এক-তৃতীয়াংশ এবং পিতার জন্য সম্পদের অবশিষ্ট। তিনি (আকরামাহ) বললেন, আপনি যে মীমাংসা করলেন (নির্দেশনা দিলেন) তা কি আল্লাহ তায়ালার কিতাবে দেখেছেন, নাকি এটা আপনার অভিমতের ভিত্তিতে? তিনি (যায়িদ) জবাবে বললেন, আমি আমার অভিমত হতে উদ্ধৃত করছি এবং আমি পিতাকে আনুকূল্য দেখাইনি[১২১]।

১০. আলী বলেন, ব্যবসায়ে মায়ের জড়িত হওয়া বিষয়ে ওমর প্রদত্ত নিষেধাজ্ঞায় আমি একমত পোষণ করলাম। তারপর আমি এই মতে উপনীত হলাম যে, তাদেরকে (ব্যবসায়) করতে দেওয়া উচিত। তাঁর কাযী উবাইদাহ আল-সালমান অতঃপর বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আমরা আপনার ব্যক্তিগত মতামতের চেয়ে উমারের সাথে ঐকমত্য পছন্দ করি।

১১. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ হতে বর্ণিত যে, তিনি একটি বিষয়ের মীমাংসায় জড়িত ছিলেন যাতে একজন লোক কোনো প্রকার মোহর নির্ধারণ না করেই

১৯৯০), হাদিস নম্বর-২৮২৯। আল-বাইহাকী, আল-সুনান আল-কুবরা, হাদিস নম্বর-২১০৭১; আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনে আল-আশ'আব, সুনান আবু দাউদ, সম্পাদনা : মুহাম্মদ মুহঈ আল-দীন আবদ্ আল-হামীদ, (বৈরুত : দার আল-ফিকর) হাদিস নম্বর-২২৬৯।

[১২০] আল-হাকিম, আল-মুস্তাদরাক আলা আল-সহীহাইন, হাদিস নম্বর-৬৩২।

[১২১] আল-বাইহাকী, আল-সুনান আল-কুবরা, হাদিস নম্বর-১২০৮৫; 'আবদ আল-রায্যাক আবু বকর, মুসান্নাফ 'আবদ আল-রাযযাক, হাদিস নম্বর-১৯০২০।

www.pathagar.com

এক মহিলাকে বিয়ে করেছিল। লোকটি পূর্ণতা সাধনের পূর্বেই (অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে যৌন মিলনের পূর্বেই) মারা গেল। তারা বিষয়টি ইবনে মাসউদের নিকট উত্থাপন করল। তিনি বললেন, তাকে (মহিলাটিকে) অবিলম্বে পরীক্ষা করো সেখানে তোমরা কোনো চিহ্ন পাবে। তারা ইবনে মাসউদের নিকট ফিরে এলো এবং বলল, আমরা পরীক্ষা করেছি এবং একটা ক্ষত দেখেছি। ইবনে মাসউদ বললেন, আমি আমার অভিমতের ভিত্তিতে বিচার করব এবং যদি তা সঠিক হয় তাহলে তা হবে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে। আমার মতে, সে নির্দিষ্ট সময় পরে মোহর পাবে এবং অপেক্ষমান কাল (আল-ইদ্দাহ) পালনের পর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবে। আবু সিনান আল-শাজা'ঈ উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, নবি সা. আমাদের মধ্যকার এক মহিলার ব্যাপারে এমনই মীমাংসা করেছিলেন আপনার মতো করে, তার নাম বুরু বিন্‌তি ওয়াশিক[১২২]।

ঐসব হাদিস উম্মাহর সর্বোচ্চ গৌরবের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো ইজতিহাদের প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পর্কযুক্ত যা মুসলিমকে পূর্ণতার পর্যায়ে উন্নীত করার লক্ষ্যে নিবেদিত। শরিয়াহতে আল-ইজতিহাদ বৈধ এবং আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের একটি পদ্ধতি। যে ব্যক্তি সৃজনশীল ইজতিহাদের প্রক্রিয়া অবলম্বন করে সে ততক্ষণ তা হতে সওয়াব পায় যতক্ষণ তা অভিজ্ঞদের দ্বারা উৎপত্তি লাভ করে এবং লক্ষ্য পূরণে সমর্থ হয়। এসব হাদিস অভিমতের বহুত্ব এবং সঠিক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে সমাধান নিশ্চিত করে। যেখানেই কারণ, নব উন্নয়ন এবং ঘটনা রয়েছে সেখানেই এগুলো ইজতিহাদের ও সৃজনশীলতার প্রয়োজনীয়তা প্রতিফলিত করে। পরিশেষে এগুলো হতে আল-ফিকহ্'র প্রায় সব বিষয়কে নিয়ে ইস্যুর ভিন্নতা প্রদর্শন করে।

উৎপত্তিগত উৎসের ভিত্তিতে এসব রীতিনীতি ঐতিহ্য (Traditions) কে নিম্নবর্ণিত প্রকরণে বিভক্ত করা যায় :

- মহামতি খলীফাগণের সময় হতে উদ্ভূত রীতিনীতি/ঐতিহ্য; তাদের প্রজা সাধারণ তাদের দ্বারা নিযুক্ত গভর্নরদের প্রদেশসমূহ ও এলাকার প্রশাসন

---

[১২২] আল-তাবারানী, সুলাইমান ইবনে আহমদ, আল-মু'জাম আল-আওসাত, হাদিস নম্বর-২১০৮; আল-দারকুতনী আলী-ইবনে উমার, সুনান আল-দারকুতনী, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ১৭৩; এবং 'আবদ আল-রাযাক আবু বকর, মুসান্নাদ আবদ আল-রাযযাক, খণ্ড ২, সম্পাদনা : হাবীব আল-রহমান আল-'আযামী, ২য় সংস্করণ (বৈরুত : আল-মাকতাব আল-ইসলামি, ১৪০৩ হি.), হাদিস নম্বর-১১৭৪৫।

www.pathagar.com

পরিচালনায় ইজতিহাদ ও সৃজনশীলতার জন্য উৎসাহিত করেছেন যাতে উদ্ভূত বিষয় ও সমস্যার সমাধান করা যায়। তাদের কর্তব্য কার্যকরভাবে পালনের ক্ষেত্রে এটা একপ্রকার প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণও ছিল।

- প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব উদ্যোগে ইজতিহাদের উদ্ভব ঘটেছে এমন ঐতিহ্য প্রদর্শন যা একটি সহায়ক ও উৎসাহমূলক পরিবেশের উপস্থিতির ইঙ্গিত দেয়। এটা এও দেখায় যে, ইসলাম হচ্ছে আল-দ্বীন (ধর্ম) যা এর দৃঢ় অনুসারীদেরকে তাদের হাতিয়ার ও দক্ষতাসাপেক্ষে প্রয়োজনমতো ইজতিহাদ ও সৃজনশীলতায় উদ্বুদ্ধ করে, এবং ইজতিহাদ ও সৃজনশীলতার সকল শর্ত পূরণ করে।

মুজতাহিদ এবং সৃজনশীলতায় তার ভূমিকা

আক্ষরিক ও প্রায়োগিক উভয় অর্থে ইজতিহাদের পূর্ববর্তী সংজ্ঞাসমূহ ইজতিহাদের গুরুত্ব এবং ইসলামে এর ভূমিকার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়েছে। এবং সেই সাথে সৃজনশীলতায় মুজতাহিদের মূল্য নিরূপণ করেছে। তবে, অতীতের বিদ্বানগণ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ইজতিহাদে জড়িত হওয়ার অবাধ অধিকার দেননি। তারা তার জন্য কিছু বিধি ও শর্ত প্রণয়ন করেছেন যা তার ইজতিহাদ প্রক্রিয়ায় মূল্য জোগাবে। তারা তার সামর্থের দিগন্তও উন্মোচিত করেছেন তার সামর্থ্য ও দক্ষতা উন্নয়নে, ইজতিহাদ করা ও সৃজনশীলতাকে ব্রতসহ প্রক্রিয়ায় পরিণত করার উদ্দেশ্যে।

ইসলামে সৃজনশীল ইজতিহাদের সাধারণ বিধিমালা

১. আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> বলো, আমি তো আদিষ্ট হয়েছি একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত করার জন্য (সুরা আয যুখরুফ ৪৩ : ১১)।

রসুল সা. বলেছেন, প্রত্যেক কাজের বিচার নিয়াতের ভিত্তিতে (আল-বুখারি ও মুসলিম এর ওপর সর্বসম্মতভাবে একমত)।

২. সত্য ও ন্যায় অন্বেষণে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> হে মুমিনগণ! আল্লাহ তায়ালার উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ তোমাদেরকে যেন কখনো সুবিচার

www.pathagar.com

বর্জনে প্ররোচিত না করে; সুবিচার করবে, এটা তাক্ওয়ার নিকটতর (সুরা মায়েদা ৫ : ৮)।

এছাড়াও আল্লাহ তায়ালা বলেন,

> হে ইমানদারগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহ তায়ালার সাক্ষীস্বরূপ, যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা তোমাদের মাতাপিতা এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক বা দরিদ্র হোক; আল্লাহ তায়ালা উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায় বিচার করতে (তোমাদের অন্তরের) কামনা-বাসনার অনুগামী হয়ো না (সুরা নিসা ৪ : ১৩৫)।
>
> এ বিষয়ে রসুল সা.-এর বাণী, বিচারকরা তিন ধরনের : এর মধ্যে দু'জন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে এবং একজনকে জান্নাতে নেওয়া হবে।

৩. চেষ্টা ও সামর্থে ত্রুটি না করা। আল্লাহ তায়ালা বলেন, যাতে তিনি দেখে নিতে পারেন তোমাদের মধ্যে আমলে কে শ্রেষ্ঠ (সুরা মুলক ৬৭ : ২)।

রসুল সা. বলেন, (আমরা যা করি) সবকিছুর জন্য আল্লাহ তায়ালা পূর্ণতার নির্দেশ দিয়েছেন ...।

৪. সাক্ষ্য প্রমাণ, প্রমাণাদির স্তর ও পর্যায়, শরিয়াহ'র নীতি এবং বিধি উদ্ভাবিতকরণের পদ্ধতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন।

৫. আল-কুরআন এবং আল-হাদিস ও সেই সাথে আরবি ভাষার বিজ্ঞান ও প্রয়োগ কৌশল সম্পর্কে গভীর জ্ঞান লাভ।

৬. শরিয়াহ'র লক্ষ্য, মানবকল্যাণ, উন্নয়ন এবং দুর্নীতি বা পাপ প্রতিরোধের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনে সংযুক্ত থাকা।

৭. কেবল সহজসাধ্য যে কোনো সমাধানের জন্য গবেষণা না চালিয়ে সর্বোত্তম সমাধানের জন্য মনোভাব প্রতিষ্ঠা করা, কারণ কতকগুলো বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সমাধান থাকতে পারে, কিন্তু তার কাছে যা কামনা করা হচ্ছে তা হলো সর্বোত্তম ও পূর্ণাঙ্গ সমাধান।

৮. নতুন, অনুমোদিত বা উন্নয়নকৃত বা সময়ে সময়ে ইজতিহাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার দরজা উন্মুক্তকরণ বলে অভিহিত সমাধানের দরজা বন্ধ করা হতে বিরত থাকা।

www.pathagar.com

এই সন্ধিক্ষণে তাই প্রখ্যাত ঘরানা (মাযহাব) সমূহের মধ্যে ইজতিহাদ পদ্ধতির চলমানতা এবং তাদের অনুগতদের মতামতের বৈচিত্র ব্যাখ্যা করা সম্ভব। আরো কিছু মাত্রাও রয়েছে, যেমন একজন ইমামের দুটি অভিমত থাকা : বিভিন্ন ফিকহী ইস্যুতে পরিবেশ, পরিস্থিতি এবং অবস্থার কারণে নতুন ও পুরাতন অভিমত, যেমন- ছিল ইমাম আল-শাফি'ঈর ক্ষেত্রে। একইভাবে, একটি ইস্যুতে অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন অভিমতও থাকতে পারে, যেমন ইমাম আহমাদ এবং ইমাম হাম্বলের ক্ষেত্রে ছিল।

৯. যেহেতু কিছু সংখ্যক ইস্যুর একাধিক অভিমত থাকতে পারে তাই অন্যদের সমাধানকে হেয় করা হতে বিরত থাকা। বিভিন্নমুখী সমাধান ও মতামতের ক্ষেত্রে রসুল সা.-এর অনুমোদনের মধ্যে এটা দেখা যায় যা তিনি ইজতিহাদকারী দুই দলের মধ্যে করেছিলেন যারা আসরের সালাত নিয়ে ইজতিহাদ করেছিল যখন রসুল সা. তাদেরকে বনুকুরায়যা প্রেরণ করেছিলেন। এই একই দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করা যায় উমারের রা. প্রতি রসুল সা.-এর উক্তি তোমরা উভয়েই সঠিক এর মধ্যে যখন তাঁরা দু'জন ইমামের তিলাওয়াত নিয়ে মতবিরোধ করেছিলেন, যিনি সাধারণভাবে পরিচিত তিলাওয়াতের বিপরীত পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন।

ইজতিহাদ পুনর্জীবিতকরণ

আল-জুওয়াইনি তাঁর গ্রন্থ আল-বুরহান-এ বলেন, যদি কোনো ঘটনা ঘটে এবং ব্যক্তি তা থেকে আইনী সহায়তা (ফাত্ওয়া) চায় এ বিষয়ে নির্দেশনার জন্য এবং সেই ঘটনা যদি পুনরায় ঘটে, তাহলে কি সে ব্যক্তির ঐ সহায়তা (ফাত্ওয়া) পর্যালোচনা করার প্রয়োজন আছে? এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন অভিমত রয়েছে। এমন কিছু লোক রয়েছেন যারা বলেন ইজতিহাদী পরিবর্তনের জন্য পর্যালোচনা প্রয়োজন; এবং যদি কর্তৃপক্ষকে দ্বিতীয়বারের মত জিজ্ঞাসা করা হয় (একই ইস্যু বিষয়ে), তাকে ইজতিহাদ নবায়ন করতে হবে, যা এর অধিকারের পক্ষে ওহির মতো যা বাতিল ধারণা করা হয়। আমি মনে করি যে, যদি প্রথম ফাতওয়া সুনির্দিষ্ট বা স্পষ্ট মূল পাঠের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে দ্বিতীয় ঘটনাকালে এর পর্যালোচনার প্রয়োজন নেই। কারণ এতে পরিবর্তনের সম্ভাবনা তেমন থাকে না। একই অবস্থা সেই বিষয়ে যা ইজতিহাদের অধীন এবং প্রতি মুহূর্তেই পর্যালোচনা করা কঠিন, যেমন- যখন তা নড়াচড়া বা ভ্রমণের দাবি করে। তাই, আমরা জানি যে, আল-

www.pathagar.com

ফায়াফীর লোকেরা সাহাবিদের আমলে ফতোয়া চাইত, মাত্র একবার, এবং যখন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতো তখন সমর্থন (ফতোয়া) নিত দিকনির্দেশ হিসেবে। একইভাবে, যদি বিষয়টি প্রতিদিন সংঘটিত ঘটনা, যেমন পরিচ্ছন্নতা (ইস্তিঞ্জা) ও প্রাত্যহিক সালাতের সাথে সম্পর্কিত হতো, তাহলে সময়ে সময়ে এর ইজতিহাদ নবায়ন করা অবশ্যই কষ্টকর হতো। অন্যদিকে, পূর্ববর্তীদের কথার ভিত্তিতে হলে, যা আমরা মাত্র সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তার প্রমাণের জন্য কষ্ট করার প্রয়োজন হয় না। বরং আমরা দেখাতে পছন্দ করব যে, অধিকাংশ পরিশ্রমের/কষ্টের ক্ষেত্রে সাহাবিগণ বিরত থাকতেন এবং নমনীয়তা দেখাতেন। আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন[১২৩]।

ইবনে আল-কাইয়িম তার ই'লাম আল-মুওয়াককিঈন, পয়ষট্টিতম সুবিধা পর্যায়ে বলেন, যদি কোনো ব্যক্তি কোনো ঘটনার বিষয়ে কোনো নির্দেশনার ওপর আইনগত সিদ্ধান্ত প্রার্থনা করে এবং, তিনি ফাত্ওয়া জারি করেন এবং ঐ ব্যক্তি তার (পরবর্তী ব্যক্তির) বক্তব্যের ভিত্তিতে কাজ করে, এবং তারপর, একই ঘটনা ব্যক্তির ব্যাপারে পুনরায় ঘটে, তাহলে কি ঐ ব্যক্তি একই ফাত্ওয়া ব্যবহার করবে কিংবা দ্বিতীয় বারের মতো অন্য ফাতওয়া খোঁজ করা প্রয়োজন হবে? হাম্বলী ও শাফে'ঈ বিদ্বানগণের এ ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে। এমন কিছু সংখ্যক রয়েছেন যারা ঐ ব্যক্তিকে দ্বিতীয় ফাতওয়ার পরামর্শ দেন না। তারা বলেন, নীতি হচ্ছে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। ব্যক্তিকে প্রথম ফাত্ওয়া মেনে চলতে হবে যদিও ইজতিহাদ পর্যালোচনার সম্ভাবনা রয়ে যায়। কিছু সময়ের জন্যও ব্যক্তি এই ফাত্ওয়া মেনে চলবে যতক্ষণ না পরবর্তীটি জারি হয়, যদিও তার ইজতিহাদ পর্যালোচনার অনুমতি রয়েছে। অন্যদিকে, এমন ব্যক্তিরা রয়েছেন যারা প্রথম ফাত্ওয়াকে বহাল রাখতে আগ্রহী ব্যক্তির সাথে একমত নন। তারা বলেন, আইনবেত্তা (মুফতি)-র জন্য প্রথম ইজতিহাদের নির্দেশনা নির্ভরযোগ্য নয়, হঠাৎ তিনি এটাকে প্রভাবশীল রাখতে পারেন, এ সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়ে যে, ব্যক্তি ভুল ফাত্ওয়া ব্যবহার করেছে তাদেরকেসহ যারা একইভাবে তার ফাত্ওয়া চেয়েছিল। তাই অন্যান্য বিদ্বানগণ এ অভিমতকে নীতিগর্ভ রূপক কাহিনী সহযোগে প্রভাবশীল করেছেন, যা মৃতের বক্তব্যকে জীবিতের ওপর প্রাধান্য দেয়। এটা ইবনে মাসউদের বক্তব্য দ্বারাও প্রমাণিত, তোমাদের (মহিলাদের) মধ্যে যে নেতা তার উচিত মৃতদের নিকট নেতৃত্ব চাওয়া, কারণ জীবিতরা প্রলোভন হতে নিরাপদ নয়[১২৪]।

---

[১২৩] খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৮৭৮-৮৭৯।

[১২৪] খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৬১।

www.pathagar.com

আল-ইসনাভী তার আল-তাহমীদ গ্রন্থে বলেন, যদি কোনো মুজতাহিদের সম্মুখে ঘটনা ঘটে এবং এতে তিনি ইজতিহাদ করেন ও ফাত্ওয়া জারি করেন; এবং তারপর তার সামনে এ ঘটনা দ্বিতীয়বার ঘটে, তাহলে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে তিনি ইজতিহাদ পুনর্মূল্যায়ন করবেন কিনা। এ বিষয়ে তিনটি অভিমত রয়েছে। আমাদী ব্যাখ্যা করেন যে, ইজতিহাদের অতীত পদ্ধতি হতে উদ্ধৃত সঠিক অভিমত হচ্ছে এটা অপ্রয়োজনীয়, যদিও ইজতিহাদ পুনর্মূল্যায়ন করা প্রয়োজনীয় হতে পারে। একইভাবে ইবনে আল-হাজিব এ অভিমত পোষণ করেন যে, ইজতিহাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নেই। যদিও তিনি যা উল্লেখ করা হয়েছে এবং যা উল্লেখ করা হয়নি এমন কিছুর মধ্যে আপোষ করেননি। এ কথা বলে তিনি এগুলোর সমাধান করেছেন আল-মাহসূল'র মধ্যে যে, যদি তার ইজতিহাদে পরিবর্তন ঘটে, তাহলে পরিবর্তন সম্পর্কে ব্যক্তিকে অবহিত করা পছন্দনীয় যাতে সে পুরান ফাত্ওয়া ব্যবহার বন্ধ রাখতে পারে। তারপর, ইবনে আল-নাজিব পুনগবেষণা করেন যাতে তিনি ইজতিহাদ পুনর্মূল্যায়ন একেবারেই অপ্রয়োজনীয় বলে উপসংহার টানেন। তিনি বলেন, যদি কেউ বলেন যে, তিনি তার অভিমত দ্বারা আচ্ছাদিত এবং যে প্রথম পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তা ছিল শক্তিশালী। তাহলে তিনি তার অভিমত প্রদানে এই বিশ্বাসে চালিত হবেন যে এর পরবর্তীতে জারিকৃত ফাত্ওয়া সত্যতাপূর্ণ ছিল, এবং জ্ঞানগতভাবে অভিমতের ভিত্তিতে কাজ করা প্রয়োজনীয়। একই বিষয়ের শাখাবদ্ধকরণ দুটি পাত্রের উদাহরণ যার একটি অপবিত্রতা (নাজাসাহ) দ্বারা বিষাক্ত। এ ব্যক্তি ইজতিহাদ করল এবং পাত্র হতে ওজু করল, যা তার অভিমত নির্দ্বিধায় পবিত্র বলে স্থির করেছে। তারপর, সালাতের আরেকটি ওয়াক্ত এলো এবং তখনো দুটো পাত্র ছিল ঐ অবস্থাতেই। তার জন্য কাম্য হচ্ছে সঠিক পাত্র বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তার ইজতিহাদ পর্যালোচনা করা। তার ব্যাপারটি দ্বিতীয় বারের মতো কিবলার দিক নিশ্চিতকরণে মুজতাহিদের সম্পর্কের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ যদি সালাতের সময়কালে তিনি নিজেকে কোনো নতুন অবস্থানে পান। সালাতের ওয়াক্ত ইত্যাদি নির্ধারণে কিয়াসের ব্যবহার প্রসঙ্গেও একই কথা বলা যায়। এমনকি মরুভূমির মধ্যে মানুষ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিলেও কিয়াস ইজতিহাদের আশ্রয় নেবে[১২৫]।

---

[১২৫] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫২৯।

www.pathagar.com

ওপরের বক্তব্য ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিপরীত মতামতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এগুলো বিদ্বানগণের অভিমতও উল্লেখ করে, যা একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও ইজতিহাদ পুনপ্রতিষ্ঠা প্রয়োজন গণ্য করে। এটা এই বাস্তবতার কারণে যে ইজতিহাদের বিষয়সমূহ অভিমত সংক্রান্ত। মুজতাহিদ পূর্বে লব্ধ অভিজ্ঞতার মতো একই অবস্থার মুখে পড়তে পারেন এবং সেখানে ইস্যুটির নতুন মাত্রা বিস্তৃত হতে পারে যা ইতোপূর্বে অবিদ্যমান ছিল। এর অর্থ হলো, ইজতিহাদের আকাঙ্ক্ষা সমর্থনযোগ্য, কারণ এর মধ্যে যে বিভিন্ন বিষয় উঠে আসে তাই ইজতিহাদ নবায়নকে প্রয়োজনীয় করে তোলে, ব্যক্তির কষ্টের কারণে (যে ফাত্ওয়া চায়) যা সে দূরবর্তী এলাকায় বসবাসের কারণে ভোগ করে এবং একই সমস্যাকে মোকাবেলা করতে হয়। এটাই মূলত সৃজনশীলতা, যা ঘটনার সমাধান নিয়ে আসে এবং সেগুলোর পর্যালোচনা ও নিরীক্ষা করা হয়। তাই, তারা বলেন, এটা সময়ের পরিবর্তনের ফলে নির্দেশের পরিবর্তনকে বাতিল করে না। তারা আরো বলেন, নির্দেশ এর কারণের সাথে চলে। এর অস্তিত্ব থাকলেও কিংবা না থাকলেও প্রথা হচ্ছে পরিত্যক্ত বস্তুর ধারক। ইস্যু নবায়ন সম্পর্কে মালিক বলেন, তাদের কুকর্ম অনুপাতে লোকদের কাছে নতুন ইস্যু দেখা দেয়[১২৬]।

এক মুজতাহিদ অন্য মুজতাহিদকে অনুকরণ

কোনো বিষয় বা ঘটনা মোকাবেলায় সমাধানে উপনীত হওয়ার জন্য ইসলাম মুজতাহিদকে তার ইজতিহাদে সর্বপ্রকার পরিশ্রম আবশ্যকীয় করেছে। নিজের ইজতিহাদ করার সামর্থ্য থাকা পর্যন্ত তার উচিত নয় অন্য মুজতাহিদের অনুকরণ করা। আল-শাফি'ঈ বলেন, মুজতাহিদের জন্য তার অভিমতের ওপর ইজতিহাদ করা বাধ্যতামূলক এবং অন্যের অভিমতের ওপর নয়। তিনি বলতে চান যে, কোনো ব্যক্তিরই (মুজতাহিদের) উচিত নয় তার সমসাময়িকদের মধ্যে কারো অনুকরণ করা[১২৭]।

আইনবেত্তাদের (আল-উসূলিইউন) বেশিরভাগই শরিয়াহর রায়ের ভিত্তিতে মুজতাহিদের সামর্থ্য বিবেচনা করে এক মুজতাহিদ কর্তৃক অন্য মুজতাহিদের অনুকরণ প্রতিরোধের ধারণাকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন। এমন দৃষ্টিভঙ্গি গভীর চিন্তা,

---

[১২৬] ফাতহ্ আল-বারী খণ্ড ১৩, পৃষ্ঠা ১৪৪।

[১২৭] আল-শাফি'ই : আল-উম্ম, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৯৩।

www.pathagar.com

সৃজনশীলতা ও একই বিষয়ে বিচিত্র অভিমতের মাধ্যমে সম্ভব অনেক ইজতিহাদ ও সৃজনশীলতার জন্য চরমভাবে উদ্বুদ্ধ করে। এটা অনুকরণের বিস্তারকেও বাধাদান করে, যা সীমিত ইজতিহাদের ক্ষেত্রে ফিক্‌হকে সীমাবদ্ধ করে এবং তৎপরবর্তী মুজতাহিদগণের সৃজনশীলতার চেতনা এই বক্তব্যের অজুহাতে বিনষ্ট করে, যেমন, প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় জনের জন্য কিছু ছেড়ে যাননি। এই বক্তব্যের ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে ইবনে আবদ আল-বার তার পূর্বসূরী হতে বর্ণনা করেন যে, জ্ঞানের পথে এই মনোভাবের চেয়ে ক্ষতিকর আর কিছু নেই। আরো মন্তব্য রয়েছে, যেমন- এটা যেমন তার চেয়ে অধিক সৃজনশীল কিছু থাকতে পারে না। যারা একজন মুজতাহিদের অনুকরণকারী মুজতাহিদকে অনুমোদন করেছেন তারা এর ন্যায্যতা সমর্থন করেছেন। প্রথমত সময়ের অভাবের ভিত্তিতে এবং দ্বিতীয়ত একই ইস্যুতে প্রথম মুজতাহিদের প্রযুক্তি ও পদ্ধতি দ্বিতীয় মুজতাহিদ কর্তৃক ব্যবহৃত হওয়ার ব্যাপারে প্রত্যয়ের ভিত্তিতে।

আল-ইজতিহাদ এবং মানবিয় কাজের ফলাফল

মানবিয় কাজ ও কথার ব্যাখ্যায় কিংবা ঘটনার ফলাফল সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে (ঋণাত্মক বা ধনাত্মক) এগুলোর ব্যাপারে ইতিবাচক বা নেতিবাচক নির্দেশনা প্রদানের পূর্বে রয়েছে শরিয়াহ'র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দরজাসমূহ। যার মধ্যে সৃজনশীলতা কর্ম ও গবেষণার জগতে প্রবেশ করে। আল-নাযার ফী আল-মা'আলাত গ্রন্থে আল-ইমাম আল-শাতিবী বলেন, শরিয়াহ'র ভিত্তিতে কাজ হচ্ছে মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ, সে কাজ সমর্থনযোগ্য বা প্রতিবাদযোগ্য যাই হোক না কেন। একজন প্রাপ্তবয়স্কের কাজের ওপর কোনো মুজতাহিদ নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন না ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক, ঐ কাজের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য জরিপ করার পূর্বে সেই কাজ কল্যাণ লাভের জন্য আইনসঙ্গত হোক বা অকল্যাণের পথে পরিচালিত হোক। তবে, কাজের ফলাফল তার উদ্দেশ্যের বিপরীত হতে পারে। এটা তার অন্তর্নিহিত খারাবী বা আত্মস্বার্থের অভিপ্রায়ের জন্য কিছুটা বেআইনী হতে পারে। যদি প্রথম দৃষ্টান্তে তার কাজ বৈধ মনে হয় কল্যাণ আনয়নের ফলে, আনুপাতিকভাবে মন্দ কাজ তার অধিক কিছুর দিকে নিয়ে যেতে পারে। এটা বৈধ বলে অভিহিত কাজকে অবৈধ গণ্য করবে। অন্যদিকে, যদি দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে তার কাজ অবৈধ বলে অভিহিত হয়, মন্দকে প্রতিহতকরণ আনুপাতিক কল্যাণ বা তার অধিক কিছু বয়ে আনবে। তাই এ ধরনের কাজকে অবৈধ বলা যথার্থ হবে না। এটা মুজতাহিদের নিকট জটিল উৎসের একটা

www.pathagar.com

ক্ষেত্র যদিও এর রয়েছে আনন্দদায়ক স্বাদ এবং প্রশংসনীয় ফলাফল, যা শরিয়াহ'র লক্ষ্য অভিমুখী। এর বৈধতার পক্ষে বিভিন্ন সাক্ষ্য রয়েছে। প্রথমত : যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সৃষ্টির কল্যাণার্থে আইনসম্মত দায়িত্বের বিধান। এই কল্যাণ হয় পার্থিব লাভের জন্য কিংবা পরকালীন পুরস্কারের জন্য। যারা পরকালের পক্ষে তারা দায়িত্বশীলের (মুকাল্লাফ) পুরস্কারকে পরকালের সাথে সংশ্লিষ্ট করে যাতে সে জাহান্নামের আগুনের নয় বরং জান্নাতের বাসিন্দা হতে পারে। পার্থিব কল্যাণ বিষয়ে যদি কোনো কাজের সূচনা ফলাফলের ইঙ্গিত নির্দেশ করে, তাহলে তা হবে কারকদের কারণ, যা আইনপ্রদাতার অভিপ্রায়। কারকগণ হচ্ছে কারণের ফল। কারণগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রথমটিকে বিবেচনা করা প্রয়োজন। যা (কাজের) ফলাফলের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপের মতোই। শরিয়াহর সাক্ষ্য এবং অবরোহ পদ্ধতি এই ফলাফলকে নিশ্চিত করে, তা শরিয়াহর বিধি প্রণয়নের মৌলিক বিষয় বলে বিবেচিত। উদাহরণ হিসেবে, কুরআনের আয়াত,

> হে মানুষ! তোমরা সেই রবের ইবাদত করো যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার (সুরা বাকারা ২ : ২১)।

এ আয়াতটিও,

> সিয়ামকে তোমাদের জন্য ফরজ করা হলো, যেমন ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীগণের প্রতি, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো (সুরা বাকারা ২ : ১৮৩)। এবং
>
> এবং তাদেরকে তোমরা গালি দিও না যারা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্যের ইবাদত করে, কারণ তারা ভুলবশত কোনোরূপ জ্ঞান ছাড়াই আল্লাহ তায়ালাকে গালি দেবে (সুরা আন'আম ৬ : ১৮)। এবং,
>
> কিসাসের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন (-এর নিরাপত্তা) ... (সুরা বাকারা ২ : ১৭৯)।

এ আয়াতগুলোর মধ্যে নির্ধারিত কাজের ফলাফল উল্লেখ করা হয়েছে। এরকম অসংখ্য বিষয় রয়েছে যেখানে ফলাফল সুনির্দিষ্ট। হাদিসে বলা হয়েছে, মুনাফিকদের ষড়যন্ত্র প্রকাশ পাওয়ার পর রসুল সা.কে অনুরোধ করা হলো তাদেরকে হত্যা করার জন্য। তখন তিনি বললেন, আমি এমন ভয় করি যে, লোকেরা বলবে মুহাম্মদ তার সঙ্গীদেরকে হত্যা করছেন। এবং তাঁর (যা) উক্তি, তোমাদের লোকেরা

www.pathagar.com

অবিশ্বাসপ্রসূত কথা বলবে (এ ভয় না থাকলে) আমি এই গৃহ (কাবা) কে ইবরাহীম আ.-এর ভিত্তির ওপর নির্মাণ করতাম। এ উক্তির কারণে (খলিফা) মালিক ইবরাহীম আ.-এর ভিত্তির ওপর কাবা পুনর্নির্মাণ করার ইচ্ছায় তাঁর আমীর-এর ফাত্ওয়া চেয়েছিলেন। আমীর তাঁকে এটা করতে নিষেধ করেন কারণ আল্লাহ তায়ালার ঘর নিয়ে লোকদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দিতে পারে। আরেকটি হাদিস রয়েছে যাতে আযাবের ভয়ে ইবাদতের ন্যায্যতা প্রতিপাদনে নিজেকে কষ্ট দেওয়া রহিত করা হয়েছে। নীতিগতভাবে ইবাদত বৈধ কিন্তু এ থেকে ক্ষতিকর ফলাফল অবৈধ। তা সত্ত্বেও এর কল্যাণের কারণে এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা ঘোষণা করা হয়নি।

উপকরণের প্রতিবন্ধকীকরণ (সাদ্দাল-যারাঈ) নীতির সকল সাক্ষ্যের সাথে এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। এদের অধিকাংশই বৈধ কাজকে বাধাগ্রস্ত করে। বৈধতা কেবলমাত্র নীতিকর্মের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় বরং এর বিস্তার ও ক্ষতি দূর করার সকল সাক্ষ্যের সাথেই সম্পর্কিত। অধিকাংশ এমনসব কাজ ও সাক্ষ্য আইনসম্মত উদারতায় পর্যবসিত হওয়ায় নীতিগতভাবে বৈধ বলে গৃহীত হয়েছে। প্রসিদ্ধতা ও অসংখ্য উদাহরণ থাকায় এই বিষয়কে অধিক ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। ইবনে আল-আরাবী এ বিষয়ে সিদ্ধান্তের সময় বলেন, লোকেরা এর ওপর মতভেদ করেছে এবং বিদ্বানদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে যারা এটা বুঝেছেন ও সংরক্ষণ করেছেন। সেজন্য, এই নীতি হতে অনেক সাধারণ নিয়মের উদ্ভব ঘটেছে। এর মধ্যে রয়েছে উপকরণের নিয়মাবলী (আল-যারাঈ) যা মালিক ফিক্হ'র অধিকাংশ অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করেছেন কারণ এটি কল্যাণ ও ক্ষতি সম্বন্ধে প্রয়োজনানুযায়ী যুক্তি উপস্থাপন করে[১২৮]।

কর্মের প্রতিফলন এবং ইজতিহাদ ও পাশাপাশি সৃজনশীলতার সাথে এসবের সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনা, মহাজ্ঞানী, কর্মবিধায়ক কর্তৃক কল্যাণ, অকল্যাণ এবং ভালো বা মন্দ ব্যাখ্যাসমূহের নির্দেশনাসঞ্জাত দৃষ্টিভঙ্গির অনুরূপ। আমরা যদি প্রেক্ষাপট বিবেচনা করি তাহলে আমরা প্রায় সব মাধ্যমিক উৎসসমূহ দেখব, যা ইজতিহাদভিত্তিক, মূল শরিয়াহ'র ওপর প্রতিষ্ঠিত। এ সত্যতা সম্বন্ধে কোনো সংশয় ও বিতর্ক নেই যে, এসবের সবকিছুই কর্মের ফলাফলের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত।

উদাহরণস্বরূপ, অনুসিদ্ধান্ত (কিয়াস) হচ্ছে একটি ইজতিহাদী প্রক্রিয়া যা অন্য কিছুর মধ্যে কিছু বিষয়ের অবৈধতার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এটি নতুন ঘটনাসংক্রান্ত

---

[১২৮] খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৯৪-২০২।

www.pathagar.com

নির্দেশনার আদ্যোপান্ত পরীক্ষণ দ্বারা শুরু হয় কর্মের পূর্ববর্তী অভিন্ন ত্রুটিপূর্ণ কারণ ও ফলাফল প্রয়োগের জন্য। উদাহরণস্বরূপ, নেশাগ্রস্ততা (ত্রুটিপূর্ণ কারণ)-র জন্য মদ হারাম করা হয়েছিল। যদি অন্য মাদকদ্রব্যের মধ্যে এমন ত্রুটিপূর্ণ কারণ ও ফলাফল দেখা যায়, তাহলে একই নির্দেশনা প্রয়োগ করতে হবে। জোরপূর্বক নয় বরং একই শরীআতী যুক্তির ভিত্তিতে যা এগুলোর ত্রুটিপূর্ণ কারণের ওপর নির্দেশ প্রতিষ্ঠা করে।

সেজন্যই আল-জুআইনী কিয়াস সম্পর্কে বলেন, এটা ইজতিহাদের উৎস এবং অভিমতের ভিত্তি। এটা ফিকহ এবং শরিয়াহ'র পদ্ধতিকে খণ্ড-বিখণ্ড করে। এটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসহ ঘটনার স্বাধীন বিশদ নির্দেশনা দেয়। আল-কুরআনের মূলপাঠ এবং সুন্নাহ সীমিত ও নিষিদ্ধ এবং ইজমা'র বিষয়বস্তু গণনাকৃত ও পরম্পরাগতভাবে প্রেরিত[১২৯]।

আল-ইসতিহ্সান (আইনগত অগ্রাধিকার), বিতর্কিত হলেও মালিকের মতে ইজতিহাদের সমকক্ষ। সেখানে ইবনে আল-কাসিম বলেছেন বলে জানা যায়, আল-ইসতিহসান অর্থাৎ ইজতিহাদ হচ্ছে জ্ঞানের নয়-দশমাংশ। হানাফি পণ্ডিতগণ বলেন, ইসতিহসান হচ্ছে কিছু কিছু অনুসিদ্ধান্তের (আল-আকীদাহ) ব্যতিক্রম অথবা দুর্বল কিয়াসের ওপর শক্তিশালী কিয়াসের প্রভাবশীলতা অথবা জনগণের নিকট নিম্নতর এমনকিছুর পক্ষে কিয়াস পরিত্যাগ করা। এগুলো সবই কাজের ফলাফলের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইবনে রুশদ ইসতিহসানকে এভাবে বর্ণনা করেন, আল-কিয়াস হতে এক প্রকার প্রস্থান যা নির্দেশনার যথাযথ সীমা অতিক্রম করে। আল-শাতিবী এভাবে এর সংজ্ঞা দান করেন, একটি সাধারণ সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে আংশিক কল্যাণ উদ্ভূতকরণ। যখন জনস্বার্থ (আল-মাসালিহ আল-মুরসালাহ) হচ্ছে সেই স্বার্থ যার বৈধতা ও নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে মূলপাঠ নেই। বরং এটা কাজের ফলাফলের ভিত্তিতে জনগণের কল্যাণ উপলব্ধি করে এবং এটাই এর গুণ। তদনুযায়ী ইবনে আকীল হাম্বলী শরিয়াহ নীতিকে (আল-সিয়াসা আল-শরিয়াহ) এভাবে সংজ্ঞায়িত করেন, যে কোনো কাজ যা জনগণকে জনস্বার্থের নিকটতর করে এবং তাদেরকে কুকর্ম হতে দূরে রাখে এমনকি এটা (কাজ) যদিও কুরআন বা সুন্নাহ কর্তৃক অনুমোদিত নয় (ইবনে আল-কাইয়িম, আল সিয়াসাহ আল-শারীআহ)।

---

[১২৯] আল-বুরহান, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৪৩-৭৪৪।

www.pathagar.com

অন্যদিকে, উপকরণকে বাধাপ্রদান (সাদ আল-যারাঈ') হচ্ছে এমন কিছু উপকরণকে প্রতিহতকরণ যা অবৈধকাজে চালিত করতে পারে, যদিও নীতির দিক থেকে ঐ কাজ বৈধ। এটি শরিয়াহ'র লক্ষ্যের দৃষ্টিকোণ হতে জনস্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখে, যেমন- প্রয়োজনাদি (যরূরিআত), পরিপূরকসমূহ (হাজিয়্যাত) এবং তাহসীনীইয়াত।

এসকল অগ্রগতি নিশ্চিত করে যে, ইসলাম অনেক আগে থেকেই মানবিয় কাজের ফলাফল পর্যবেক্ষণের নীতি গ্রহণ করেছে। এর ফলে ইসলামি ফিক্হ অনুপম অতুলনীয় পরিপূর্ণতা ও সৃজনশীলতা অর্জন করেছে আল-মাসালিহ, আল-মুরসালাহ, আল-ইসতিহসান, আল-ইজতিহাদ ও আল-কিয়াসের ক্ষেত্রে। সংক্ষেপে ইসলামি সৃজনশীলতা এর পরিবেষ্টনীর মধ্যে এর পূর্ণ ব্যবহার করেছে।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

মানবিয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলিম অবদান

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে উম্মাহর সূচনালগ্ন হতে ইসলামি বিজ্ঞান হতে প্রকৃতি বিজ্ঞান পর্যন্ত সকল প্রকারের বিজ্ঞানের বিকাশ ও উন্নয়নের পেছনে ইসলাম বরাবরই বৃহত্তর উপাদান হিসেবে কাজ করেছে। আরব সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল সাধারণ মানুষ ও সাধারণভাবে অশিক্ষিত বেদুঈনদের নিয়ে যারা তাঁবু ও উট নিয়ে সর্বদাই এমনসব স্থানে ঘোরাঘুরি করতে চাইত যেখানে ঘাস জন্মায় কিংবা পানির দেখা মেলে। যারা মক্কা বা মদিনা শহরে বাস করত তারা কখনো জ্ঞানের প্রতি মনোযোগ দেয়নি। উদাহরণস্বরূপ, মক্কাবাসীরা ছিল ব্যবসায় মনোভাবাপন্ন। ইসলাম-পূর্ব আরব সমাজে কোনো প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়াসের ঐতিহাসিক দলিলের সন্ধান মেলে না, কিছু সংখ্যক ব্যতীত যারা অংশীবাদী পরিবেশে আধ্যাত্মিকভাবে অস্বস্তিকর অবস্থায় ছিল এবং যারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সে সময়কার দুটি একত্ববাদী ধর্মের যে কোনো একটিতে : ইহুদিবাদ ও খ্রিস্টবাদ-এ দীক্ষিত হওয়ার। অবশিষ্ট অন্যরা ইব্রাহীম এর ঐতিহ্যের প্রতি অনুরক্ত ছিল। সেসব জাতি তাদের মানসগঠনকে পরিবর্তন করে তাদেরকে জ্ঞানভিত্তিক সমাজে রূপান্তরিত করতে পারত, সীমাহীন মরুভূমি তাদের সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির সেই পথকে রুদ্ধ করে রেখেছিল। ইসলাম-পূর্ব আরবরা কবিতায় উৎকর্ষ ব্যতীত জ্ঞানের ক্ষেত্রে অন্য কোনো কিছুতে বিজড়িত হয়েছিল এমন প্রমাণ মেলে না। ওমর ইবনে আল-খাত্তাব সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি বলেছিলেন যে, কবিতাই কেবল আরবদের নিকট একমাত্র বিজ্ঞান হিসেবে পরিচিত ছিল, অর্থাৎ যে মাধ্যমে তারা তাদের ইতিহাস, ধ্যান-ধারণা ও দর্শনকে সংরক্ষণ করেছিল তা হচ্ছে কবিতা।

এতদ্সত্ত্বেও প্রশ্ন হলো কিভাবে এমন একটি মূর্খ জাতি এক সময় হঠাৎ উল্লম্ফনের মাধ্যমে এর বিস্ময়কর জনসমষ্টি ও নতুন প্রাপ্ত সম্পদ নিয়ে বিশাল পারস্য সাম্রাজ্য এবং এর প্রতিদ্বন্দ্বী রোম সাম্রাজ্যের মতো সুপ্রতিষ্ঠিত সভ্যতাকে পরাজিত করে পৃথিবীর সম্মুখভাগে চলে এলো। স্বল্প সময়ের মধ্যে ব্যাকরণ, অলংকারশাস্ত্র, ফিকহ,

www.pathagar.com

উসূলে ফিকহ এবং এমনি অন্যান্য বিভিন্ন বিজ্ঞানের সূচনা করে কিভাবে এই জাতি তার নিজস্ব বিজ্ঞানের কাঠামো গড়ে তুলেছিল? কে তাদের গ্রিক বিজ্ঞান ও দর্শনকে পৌঁছায় দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন যাতে করে তারা নিজেদেরকে ও মানবজাতিকে সম্মুখে এগিয়ে নেওয়ার প্রয়াস অব্যাহত রাখতে পারে? এর উত্তর দ্ব্যর্থহীন : এটা হচ্ছে ইসলামের নতুন জীবন ব্যবস্থা যা এই প্রাথমিক সময়ের আরব মুসলিমদের প্রদর্শিত জ্ঞান ও পুণ্যের প্রদর্শনী এই হঠাৎ তৃষ্ণার জন্য অনুঘটকের ভূমিকা পালন করে। মুসলিমগণ নিঃসন্দেহে তাদের ধর্মের নিকট ঋণী, এর কারণেই তাদের অর্জন ও মানবতার উদ্দেশে তাদের অবদান। রবার্ট ব্রিফল্ট উল্লেখ করেছেন কিভাবে মুসলিম মানস জ্ঞানের অনুকূলে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল[১৩০]। মনে হয় বিদ্যা অর্জন মুসলিমদের একটা অন্তর্নিহিত অংশে পরিণত হয়েছিল।

মানবচিন্তায় মুসলিম চিন্তাবিদগণের অবদান

কুরআনের নির্দেশ নিয়ে গভীর চিন্তা করা, প্রতিফলন ঘটানো এবং নিবিষ্টভাবে অবলোকন করে ফল হিসেবে প্রাপ্ত তাফাককুর সম্পর্কে আমরা এখানে আলোচনা করব।

হুদভয়[১৩১] (Hoodbhoy) কর্তৃক তাঁর গ্রন্থ ইসলাম ও বিজ্ঞান-এ উত্থাপিত প্রশ্ন ইসলামি বিজ্ঞান কি হতে পারে[১৩২]? দিয়েই আমরা এ অংশের যাত্রা শুরু করতে চাই।

ঠিক প্রশ্নটিকে এই অধ্যায়ের শিরোনাম করায় সন্দেহ দেখা দিয়েছে। এমনটা করার দ্বারা গ্রন্থকার তার নিজের তৈরি করা প্রশ্নের উত্তর হিসেবে না পছন্দ করেছেন।

গ্রন্থকারের যুক্তি হলো ইসলামি বিজ্ঞানের অস্তিত্ব নেই এবং ইসলামি বিজ্ঞান বানানোর সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। তাছাড়া, তার ব্যক্তিগত অভিমত অনুযায়ী গ্রন্থকার জোর দিয়ে বলেন যে, ইসলামি বিজ্ঞানের[১৩৩] কোনো সংজ্ঞার অস্তিত্ব ছিল না, এখনো নেই, যা সব মুসলিমের নিকট গ্রহণযোগ্য।

---

১৩০ Robert Brifault, ১৯৭৭। Islam and the Scientific Spirit, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, বাংলাদেশ।

১৩১ পাকিস্তানের কায়েদ-ই-আযম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন তরুণ পদার্থবিদ।

১৩২ হুদভয়, পারভেজ : Islam and Science, Religions Orthrodoxy and the Battle for Rationality. জেড বুকস লিমিটেড, লন্ডন ও নিউ জার্সি, ১৯৯১, ৭ম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৭৭।

১৩৩ বিজ্ঞানের সংজ্ঞা সম্পর্কে দেখুন : Acikgenc, Alparslan; ইসলামিবিজ্ঞান : একটি সংজ্ঞার দিকে, ISTAC প্রকাশনা, K.L. ১৯৯৬।

www.pathagar.com

গ্রন্থকার একটি বাছাই করা কাঠামো বিষয়ে আরো মনোযোগআকর্ষণী প্রশ্ন করে আরো সন্দেহের জন্ম দিয়েছেন–যেটা পাশ্চাত্যের বিচারকার্যগত ঋণাত্মক যুক্তিবাদী চিন্তার বিখ্যাত পদ্ধতি, যাতে এসব প্রশ্নের উত্তর এসব শব্দায়ন ও গ্রন্থনা হতে সনাক্ত ও কল্পনা করা যায়।

- যেটা ইসলামি বিজ্ঞান নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্যতা দাবি করছে তা কি মুসলিমদের বিশেষত ইসলামি চরিত্রসম্পন্ন মুসলিমদের দ্বারা বিকাশপ্রাপ্ত? অথবা এটা কি সর্বজনীনতার প্রকৃতিসম্পন্ন এবং তাই অধিকতর যথার্থভাবে মুসলিম বিজ্ঞান বলা হতো?
- সোনালী যুগের বিজ্ঞান প্রাথমিকভাবে আরবদের হাতে বিকাশপ্রাপ্ত এই তত্ত্ব কি সঠিক? অমুসলিম ও অনারব পণ্ডিতদের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল?
- মধ্যযুগের মুসলিম সমাজের প্রধান প্রতিষ্ঠানসমূহ কি সত্যিকার অর্থে যৌক্তিক বিজ্ঞানকে সমর্থন করতে, অঙ্গীভূত করতে এবং অন্তস্থিত করতে পেরেছে?
- মধ্যযুগীয় সময়ে মুসলিমদের দ্বারা বিকাশপ্রাপ্ত বিজ্ঞান কি ইসলামি ধর্মতত্ত্ব ও বিশ্বাসের সাথে অনুপমভাবে যুক্ত হয়েছিল, অথবা এর অনুমান ও কৌশলসমূহ কি ঠিক অন্য মানবসভ্যতার মতোই ছিল?

গ্রন্থকার জোর দিয়ে বলেন যে, ধর্মীয় গোঁড়ামী মুসলিম বিজ্ঞানের পথে অন্তরায় হয়েছে[১৩৪]। ঐ অনুমানকে প্রমাণ করার জন্য গ্রন্থকার ইচ্ছাকৃতভাবে একদিকে দর্শন ও এর গবেষণা যুগের মুসলিম পণ্ডিতদের দৃষ্টিভঙ্গির, অন্যদিকে গবেষণা পদ্ধতির সরলতম নীতিসমূহের বিরোধের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। এছাড়া, তিনি তার পূর্বধারণা, সংস্কার ও একপেশে উপসংহারের উপযোগী মিথ্যা ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে বিভিন্ন ইসলামি উপদলের মতপার্থক্যকে কাজে লাগান।

একজন অতি পরিচিত সমসাময়িক দার্শনিক ও ধর্মতাত্ত্বিক ড. ইরফান আবদুল ফাত্তাহ'র মতে, বৈচিত্র্যপূর্ণ কারণের ফলে ইসলামি বিজ্ঞান ও মুসলিম সাংস্কৃতিক অর্জনসমূহের উৎপাদনমুখী ও উদ্ভাবনী দিকসংক্রান্ত ভুলবোঝাবুঝি এবং উপরিকাঠামোগত ভ্রমাত্মক ও পরিকল্পিত ধারণাসমূহের অনেকাংশই পাশ্চাত্য ঐতিহ্যের মধ্যে পুঞ্জিত হয়েছে। যেমন :

---

[১৩৪] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯৫।

www.pathagar.com

আধুনিক ইতিহাসে বিজ্ঞান শব্দটি যা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে, যা ইন্দ্রিয়জ পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষামূলক অধ্যয়ন দ্বারা আয়ত্তের উর্ধ্বে তা জ্ঞান নয় এবং তা বিজ্ঞান শব্দটির সংজ্ঞাকে অবজ্ঞা করে।

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে, গ্রিক দর্শনের প্রাথমিক দিনগুলোতে, পাশ্চাত্য চিন্তাধারা তত্ত্ববিদ্যাগত সামর্থ্য নিয়ে একটি ভাবধারা গড়ে তোলে যা অদৃশ্য ও পর্যবেক্ষণসক্ষম এ উভয় জগতকে আয়ত্ত করার জন্য বিস্তৃত হয়। পরবর্তীতে, খ্রিষ্টান ধর্মতত্ত্বে জ্ঞানের দ্বৈততার উদ্ভব হলে; ইহজাগতিক ও পবিত্র এবং এ দু'ধরনের মানবিয় বোঝাপড়ার মধ্যে অপূরণীয় ব্যবধান সৃষ্টি হয়। এ ধরনের দ্বৈততা স্থায়ীভাবে নির্ধারিত পাঠ্যক্রমে প্রতিফলিত হয়।

মানব সভ্যতা সম্বন্ধীয় ইউরোপ-কেন্দ্রিক বা পাশ্চাত্য-কেন্দ্রিক একমুখী তত্ত্বসমূহ, বিশ্বসভ্যতাকে পুরোপুরি পাশ্চাত্যের ফসল বলে উপস্থাপন করে। উদ্ভাবনী অভিজ্ঞতার সুবিধা পুরোপুরিভাবে অন্য সংস্কৃতিকে অস্বীকার করেছে। ইসলামি সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিষয়ে ইসলাম সংক্রান্ত গবেষণায় এই আত্মকেন্দ্রিক তত্ত্বসমূহ এখনো বিরাজমান। একটি প্রস্তরবৎ কঠিন অস্তিত্ব হিসেবে পরিবর্তন সাধন বা উন্নয়নে জন্মগতভাবে বৈধ সামর্থ্য তাদের দৃষ্টিসঞ্জাত ও প্রতিফলিত[১৩৫]। হুদভয় অনুভব করেন যে, অবতরণিকা'য় বর্ণিত কিছু না কিছু ভিন্ন অভিমতের সাথে তার গ্রন্থের ভারসাম্য প্রয়োজন।

রজার দ্যু পাসকুইর[১৩৬] (Roger Du Pasquier)-এর ইসলাম উন্মোচন গ্রন্থটিকে নির্দিষ্ট সীমানা পর্যন্ত নেওয়া যেতে পারে ঐ অভিপ্রায়ের পরিপূরক হিসেবে।

ড. পাসকুইর স্পষ্টভাষায় বলেন যে, ইসলামি সভ্যতার ভিত্তি হচ্ছে তাওহিদ : উৎস ও সরঞ্জামের এক বিশাল বৈচিত্র্য নিয়ে এটি (অর্থাৎ ইসলামি সভ্যতা) একটি অসাধারণ অঙ্গীভূতকারী শক্তি প্রত্যাদিষ্ট করেছে যা একে অনুমোদন করে, শতাব্দীর পর শতাব্দীব্যাপী, যেখানে এর উৎপত্তি ঘটেছে এলাকায়, একটি স্মরণযোগ্য মাত্রার সুসঙ্গতি ও সমরূপতা ধারণে, এবং ইসলাম হতে উদ্ভূত যে কোনো কিছুর মতো একত্বের নীতিতে কেন্দ্রীভূত[১৩৭]।

---

[১৩৫] এই পরিকল্পিত অভিযোগ সম্পর্কে পূর্ণ আলোচনার জন্য দেখুন : Said, Edward (১৯৭৮), Orientalism, London.

[১৩৬] Islamictext Society, Cambridge কর্তৃক ১৯৯২ সালে প্রকাশিত।

[১৩৭] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০২।

www.pathagar.com

হুদভয়ের ইচ্ছার অন্য পরিপূর্ণতা হচ্ছে ভারতীয় উপমহাদেশ হতে কুড়িজন পণ্ডিতের সমন্বিত কার্যক্রম– যেখানে হুদভয় বাস করেন– এর শিরোনাম হচ্ছে 'বিজ্ঞানে মুসলিম অবদান'[১৩৮]।

বিজ্ঞানের প্রতি ইসলামের মনোভাব সংক্রান্ত গবেষণাকর্মে ড. রাযী-উদ-দীন সিদ্দিকী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যা পেয়েছেন তা এই যে, ইসলামি প্রেক্ষাপট সাম্প্রতিক বিজ্ঞানের তিনটি প্রধান দিকের সাথে পূর্ব-সঙ্গতিপূর্ণ। সেগুলো হচ্ছে :

১. ইসলাম প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য জ্ঞান আহরণকে বাধ্যতামূলক করেছে। এই প্রক্ষিতে ইসলাম কর্তৃক মানবাত্মা ও মনের অনুবর্তী স্বাধীনতার সাথে জ্ঞানের গণতন্ত্রায়ন ছিল মানবিয় ঘটনাপঞ্জিতে মহত্তম বিপণ্ডব।

২. গ্রিক দর্শনের বিপরীতে আল কুরআন যুক্তি ও অভিজ্ঞতার নিকট অব্যাহত আবেদন জানিয়েছে এবং প্রথমবারের মতো এটি দেখিয়েছে যে, বিজ্ঞান তত্ত্বের পাশাপাশি পরীক্ষণের ওপরও নির্ভরশীল।

৩. ইসলামে কোনো কঠোর তপশ্চর্যা নেই। এই পৃথিবী এবং এর সমুদয় সম্পদ মানবজাতির বস্তুগত কল্যাণে ব্যবহৃত হবে, যদিও মানুষের জন্য উচিত নয় তাদের ব্যক্তিসত্তার একমাত্র বস্তুগত দিকের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করা। তাদের উচিত প্রকৃতির শক্তিসমূহকে জয় করা এবং সেগুলোকে তাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য অধীন করে রাখা।

এই সংকলন কর্মে ইসলামের ইতিহাস জুড়ে বিজ্ঞানের অগ্রগতির ক্ষেত্রে মুসলিম চিন্তাবিদদের অবদান উপস্থাপন এবং বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে, বিশেষত গণিত, রসায়ন, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ঔষধ, জ্যোতির্বিদ্যা, দেহতত্ত্ব, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান-এর ক্ষেত্রে।

মুসলিম পণ্ডিতগণের দীর্ঘ তালিকার মধ্যে নিম্নলিখিতগণ উল্লেখযোগ্য :

১. আল-বিরুনী, যাঁকে ইসলামে গভীরতম ও প্রকৃত পণ্ডিত ব্যক্তি ও গণিতবিদ বলে বিবেচনা করা হয়।

২. আল-ফারগানী, আল-বাত্তানী ও আল-খাওয়ারিযমী, জ্যোতির্বিদ্যায় মহান অগ্রদূত।

---

[১৩৮] মোহাম্মদ মির্জা ও মুহাম্মদ ইকবাল সিদ্দিকী কর্তৃক সম্পাদিত, কাযী পাবলিকেশন্স, লাহোর, (পাকিস্তান)-১৯৮৬; হুদভয়ের কাজের পাঁচ বছর পূর্বে।

www.pathagar.com

৩. জাবির ইবনে হাইয়্যান, আধুনিক রসায়নবিদ্যার জনক।

৪. আবু বকর আল-রাযী এবং ইবনে সীনা, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্ব[১৩৯]।

৫. ইবনে আল-হাইসাম, যিনি তাঁর সময়ে দৃষ্টি ও আলোকবিজ্ঞানকে উচ্চতম পর্যায়ে উন্নীত করেন।

৬. ইবনে আল-নাফীস আল-দিমাশ্‌কী, যাকারিয়্যা আল-কাযভিনী এবং হামাদ আল-মাস্তাউফী, দেহতত্ত্বে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব।

৭. ইবনে খালদুন, ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান-এ উভয়ক্ষেত্রে একটি সম্মানিত নাম।

এ সংকলনের আরেকটি ভালো দিক হচ্ছে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতিতে মুসলিম পণ্ডিতদের অবদান সম্বন্ধে পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের মূল্যবান উদ্ধৃতিসমূহ। সমস্ত উদ্ধৃতির মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান হচ্ছে জর্জ সার্টনের নিম্নবর্ণিত উদ্ধৃতি যাতে বলা হয়েছে, সবকিছুর মধ্যে সবচেয়ে দামি, সবচেয়ে মৌলিক এবং সবচেয়ে ফলপ্রসূ (কাজগুলো) আরবিতে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হতে একাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত আরবি ছিল মানবজাতির বিজ্ঞানসম্মত, প্রগতিশীল ভাষা। সেই সময় কেউ ভালো, উত্তম তথ্যসমৃদ্ধ ও হালনাগাদ হওয়ার ইচ্ছা করলে আরবি অধ্যয়ন করতে হতো। এখানে কিছুসংখ্যক গৌরবময় নাম উল্লেখ করা যথেষ্ট হবে পাশ্চাত্যে যাদের কোনো সমসাময়িক সমকক্ষ ছিলেন না : জাবির ইবনে হাইয়ান, আল-কিন্দী, আল-খাওয়ারিযমী, আল-ফারগানী, আল-রাযী, সাবিত ইবনে কুররাহ, আল-বাত্তানী, হুনাইন ইবনে ইসহাক, আল-ফারাবী, ইবরাহীম ইবনে সায়মান, আল-মাসা'উদী, আল-তাবারী, আবুল ওয়াফা, আলী ইবনে আব্বাস, আবুল কাসিম, ইবনে আল-জায্‌যার, আল-বিরুনী, ইবনে সীনা, ইবনে ইউনুস, আল-কারখী, ইবনে আল-হাইসাম, আলী ইবনে ঈসা, আল-গাজ্জালী, আল-যাকালী, ওমর খাইয়াম-ইত্যাকার নামসমূহের একটি অপূর্ব বিন্যাস। যদি কেউ আপনাকে বলে যে, মধ্যযুগ ছিল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিষ্ফলা, তাহলে তার নিকট ঠিক এই নামগুলো উদ্ধৃত করুন। এ বিজ্ঞানীদের সকলেই ৭৫০ হতে ১১০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ে উৎকর্ষ অর্জন করেন[১৪০]।

---

[১৩৯] এই অবদানের ওপর অধিকতর অন্তর্দৃষ্টির জন্য দেখুন : ফযলুর রহমানকৃত Health and Medicine in Islamictradion আবদুল মাজীদ এন্ড কোং; K.L. ১৯৯৩।

[১৪০] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩১-১৩২।

www.pathagar.com

ইসলামে বৈজ্ঞানিক প্রয়াসের স্থান

ইসলামকে দুটি প্রকরণে বিভক্ত করা যায় : একটি হলো কুরআন ও সুন্নাহ'য় সংরক্ষিত শিক্ষামূলক ইসলাম। অন্য ইসলাম রয়েছে বৃহত্তর পরিসরে মুসলিম ঐতিহ্যের মধ্যে। যেমন পণ্ডিত ও উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা, যারা ইসলামি উম্মাহর মধ্যে নির্দিষ্ট বিশ্বাসকে অর্জন করেছেন। নিজেদেরকে রোল মডেল বা অন্যদের জন্য উসওয়াহ হাসানাহ হিসেবে উপস্থাপনে সমর্থ হয়েছেন যারা সত্য পথে থাকতে চান। মুসলিম সমাজের জন্য আইনসম্মত ও নৈতিক বিধি প্রণয়নে কুরআন ও সুন্নাহ ছাড়াও রয়েছে ইজমা ও উরফ যা এই বাস্তবতার ইঙ্গিত দেয় যে, ইসলাম শিক্ষাদান ও পূর্ববর্তী মুসলিম সম্প্রদায় (সালাফ)-এ উভয়টির আদর্শিক সমন্বয়।

যে ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রশ্ন জড়িত, সেখানে ইসলামের আদর্শিক উৎস, অর্থাৎ কুরআন ও নবি সা.-এর হাদিস বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। তবে, বৈজ্ঞানিক প্রয়াসের এক বা অন্য কারণের বিরুদ্ধে এটা আপত্তি উত্থাপনে কিছু কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করেনি। দীর্ঘদিন যাবত কুরআনকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহরণের গ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করার পরিবর্তে ঐশী দিকনির্দেশনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। কিছু ইসলামি মহল হতে ভুল ধারণা অবলম্বন করা হয়েছে আধ্যাত্মিক ও প্রত্যক্ষ ধর্মীয় সংশ্লিষ্টতার নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই। প্রকৃতপক্ষে আমাদের উচিত এই সীমিত অবস্থানকে দিকনির্দেশের প্রশস্ত বোঝাপড়ার নিকট তুলে ধরা। সুরা আলে-ইমরানের একটি আয়াতের বক্তব্য এরূপ :

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ

কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা কিতাব, হিকমাত ও নবুওত দান করার পর সে মানুষকে বলবে, আল্লাহ তায়ালার পরিবর্তে তোমরা আমার ইবাদতকারী হয়ে যাও-এটা তার জন্য শোভন নয়; বরং সে বলবে, তোমরা তাঁর ইবাদতকারী হয়ে যাও যিনি সবকিছুর প্রতিপালক, যেহেতু তোমরা কিতাব শিক্ষাদান কর এবং যেহেতু তোমরা অধ্যয়ন করো (আলে-ইমরান ৩ : ৭৯)।

এ আয়াতের অর্থ আরো বোধগম্য করার উদ্দেশে কেউ বলতে পারে যে, এই বর্ণিত আয়াতটি অনুযায়ী, সত্যিকার ও আন্তরিক ইবাদতের পেছনে কারণ হলো অকৃত্রিম

www.pathagar.com

জ্ঞান। এই জ্ঞানের সাথে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে কিতাব (কুরআন)-এর সম্পর্ক থাকতে হবে, কারণ কেবল ধর্মীয় জ্ঞানই হিদায়াতের দিকে চালিত করে না। এ আয়াতের যে ইংরেজি অনুবাদ উল্লেখ করা হয়েছে, দুর্ভাগ্যক্রমে তা জ্ঞানের প্রকৃত বৈশিষ্ট্যকে ম্ণ্ডান করে দেবে যা আল্লাহ তায়ালার ইবাদতের জন্য আমরা প্রার্থনা করে থাকি। মূল আয়াতে যাদেরকে কিতাব ও জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল এমন লোকেরা কেন সত্যিকার ইলাহর ইবাদত হতে বিমুখকারী ব্যক্তিদের দ্বারা কিছুতেই বিভ্রান্ত না হওয়ার ন্যায্য কারণ হচ্ছে কিতাবের বিষয়ে তাদের জ্ঞান এবং সহজাত জ্ঞান থাকা। মূল পাঠে ক্রিয়াপদের কর্ম শিক্ষার্থী উহ্য রয়েছে। ক্রিয়ার কর্ম উহ্য থাকায় আরবি অলংকারশাস্ত্র অনুযায়ী ক্রিয়াপদের অর্থ হয়েছে সাধারণ। এ দুটো দৃষ্টান্ত বিবেচনা করুন :

১. আ'তানী আহমাদ আল-তুফ্ফাহাহা (আহমাদ আমাকে একটি আপেল দিয়েছে)- এখানে কর্ম হিসেবে আপেল ক্রিয়ার নির্দেশক অর্থাৎ আপেলকেই বোঝানো হচ্ছে অন্য কিছু নয়।

২. আল্লাহ আ'তানী (আল্লাহ তায়ালা আমাকে দিয়েছেন [যা আমি চেয়েছিলাম])। এখানে কর্ম উহ্য রয়েছে ফলে দিয়েছেন ক্রিয়া দ্বারা সাধারণ অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে বিশেষ অর্থ নয়।

পরিশেষে, যে জ্ঞান আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার নিকটতর করে তা নিশ্চিত জ্ঞান যা সত্যের জন্য আন্তরিক প্রয়াস এবং সঠিক পথ পাওয়ার জন্য কষ্টকর সাধনা হতে আসে।

যুক্তিবিদ্যায় মুসলিম অবদান

যুক্তিবিদ্যা সেই বিজ্ঞান যার দ্বারা আমরা কোনো প্রস্তাবনার যথার্থতা পরিমাপ করি, বক্তব্যের সত্যতা খুঁজি এবং এর সমর্থনে প্রদত্ত যুক্তির সারবত্তা যাচাই করি। আমার জানামতে, গ্রিক সভ্যতা হতে যুক্তিবিদ্যার সন্ধান পাওয়া যায়। অ্যারিস্টটল জ্ঞান মূল্যায়নের প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হিসেবে যুক্তিবিদ্যার উন্নয়নে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। অনেক মুসলিম গ্রিক যুক্তিবিদ্যাকে ইসলামি বৃত্তির প্রেক্ষিতে কোনো প্রকার সুবিধা প্রদানে দোলাচলে থাকা সত্ত্বেও অ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যা মুসলিম মহলে এর পথ খুঁজে পায়। উদাহরণস্বরূপ তা আসে দার্শনিক ও ধর্মততত্ত্ববিদ (মুতাকাল্লিম) গণের মাধ্যমে। তারা প্রাথমিকভাবে অ্যারিস্টটলের যুক্তিপূর্ণ সংকলন গবেষণা

www.pathagar.com

পদ্ধতি দ্বারা উৎসাহিত হন (যা পরবর্তী গ্রিক শ্রেণিবিন্যাস সূত্র অনুযায়ী অলংকারশাস্ত্র ও কাব্য সমালোচনাবিদ্যাকেও অন্তর্ভুক্ত করে)। তাদের যুক্তিগত উৎসের মধ্যে কেবল যে অ্যারিস্টটলের নিজস্ব রচনাসম্ভার রয়েছে তাই নয় বরং পরবর্তী গ্রিক অ্যারিস্টটলীয় শাস্ত্রবিদগণের গবেষণাকর্মও রয়েছে। যেমন- পরফিরি'র ইসাগগ। তবে যেসব অ্যারিস্টটলিয় যুক্তিবিদ্যার ঐতিহ্যের মধ্যে দার্শনিকের রচনাসম্ভার আত্মস্থ হয় তারা ছাড়া অন্য মুসলিম পণ্ডিতগণ (ফকীহগণ) এরিস্টটলের[১৪১] আরোহ তত্ত্ব গভীরভাবে গ্রহণ করেন এবং তাদের নিজস্ব যুক্তিবিদ্যা সৃষ্টি করেন। ঘটনাক্রমে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষা কঠোর প্রয়াসের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয় এবং গৌরবের সেই শিখরে পৌছায় যাকে আমরা ইসলামি যুক্তিবিদ্যা বলি।

অনেক প্রসিদ্ধ ধর্মীয় পণ্ডিতের মাধ্যমে যুক্তিবিদ্যা ইসলামি পরিবেশে পরিব্যাপ্ত হয় যারা গ্রিক বিজ্ঞান ইসলামি পরিমণ্ডলে রূপান্তরিত হওয়াকে ইচ্ছাকৃতভাবে সমর্থন করেন। আল-গাজ্জালীর এই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে, যুক্তিবিদ্যা ইতিবাচক বা নেতিবাচক কোনো ধর্মীয় মতবাদের সাথেই সম্পর্কিত নয়[১৪২]। এটি একটি পরিমাপক যা দ্বারা কোনো যুক্তির সত্যতা ও সিদ্ধান্তের সঙ্গতি মূল্যায়ন করা যায়। এই মনোভাব পরিশেষে যুক্তিবিদ্যাকে এমনকি উসূল আল-ফিকহ ও ভাষাতত্ত্বের মতো ইসলামি বিজ্ঞানের সাথে মিশ্রিত করে ফেলে। কিন্তু, অন্যান্য মুসলিম পণ্ডিতগণ বোঝতে পারেন যে, গ্রিক যুক্তিবিদ্যা গ্রিক বিশ্বদর্শনের ফসল এবং মুসলিমদের প্রয়োজন হচ্ছে গ্রিকদের যুক্তিবিদ্যাকে সমালোচনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করে তাদের যুক্তিবিদ্যা প্রতিষ্ঠিত করা।

অ্যারিস্টটলের বিপরীতে অনেক মুসলিম এই মত পোষণ করেন যে, যুক্তিবিদ্যা কেবল সিদ্ধান্তের আনুষ্ঠানিক নকশার অধ্যয়নই নয়। বরং এটা তার চেয়েও বেশিকিছু। অনেক পণ্ডিতের মতে, যুক্তিবিদ্যা ভাষার সাথে অন্তরঙ্গভাবে জড়িত এবং এ কারণেই ভাষাতত্ত্বভিত্তিক যুক্তিবিদ্যা কিংবা আনুষ্ঠানিক যুক্তিবিদ্যাও যুক্তিভিত্তিক অধ্যয়নের বিষয়বস্তু হওয়ার ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক যুক্তিবিদ্যার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। যৌক্তিক আপেক্ষিকতার ধারণার পথে এই ভাবধারা ছিল বৈপণ্চবিক, যার অর্থ হচ্ছে, যুক্তিবিদ্যা এর নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত প্রেক্ষিত দ্বারা সীমাবদ্ধ।

---

[১৪১] আন্নাশার সামী।

[১৪২] আল-গাজ্জালীর মি'য়ার আল-'ইলম; দার আল-আন্দালুস বৈরুত, পৃষ্ঠা ২৮।

www.pathagar.com

অ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যা যুক্তিবিচারের সার্বজনিন হাতিয়ার-এ ধারণার ওপর এ অভিমত শক্তিশালী আক্রমণ চালায়। অনেক মুসলিম পণ্ডিতের কাছেই গ্রিক যুক্তিবিদ্যা হচ্ছে গ্রিক ভাষার ধারণাগত ব্যাকরণ। সেক্ষেত্রে আরবি ব্যাকরণ যুক্তিবিদ্যা[১৪৩] ছাড়া কিছু নয়। একদিকে যুক্তিবিদ্যার সর্বজনীনতা এবং অন্যদিকে যুক্তিবিদ্যার আপেক্ষিকতার মধ্যকার বিবাদ ৯৩২ সালে বাগদাদে অনুষ্ঠিত বলে কথিত এক বিখ্যাত বিতর্কে প্রতিফলিত হয়। এটা হয়েছিল প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিদ আবু সাঈদ আল-সিরাফী এবং তৎকালীন নেতৃস্থানীয় খ্রিষ্টান দার্শনিক মাত্তা ইবনে ইউনুসের মধ্যে। আল-সিরাফী গ্রিক যুক্তিবিদ্যা আমদানীর জন্য দার্শনিকদের প্রতি নিন্দা প্রকাশ করেন, এটাকে তিনি বিদেশি ভাষার ঐতিহ্য বলে গ্রহণ করেন, যা আরবের পরিবেশ বিনষ্ট করে। তিনি বলেন যে, যেকোনো ভাষাব্যবস্থা এর নিজস্ব যুক্তিবিদ্যার উদ্ভব ঘটাতে পারে। তাই এমন মনে করার কোনো যুক্তি নেই যে, জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রিক যুক্তিবিদ্যা আরবদের প্রয়োজন। এর অর্থ এই নয় যে, আল-সিরাফী মানবজ্ঞানের নিরংকুশ আপেক্ষিকতাবাদে বিশ্বাসী। কারণ তার অভিমত এই ছিল যে, আবর্তিত পদ্ধতিতে যদি কোনো প্রস্তাবনা গঠন করা যায়, তাহলে তিনি ঐ প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত যেকোনো অর্থকেই মেনে নেবেন, যেমন ২+২=৪[১৪৪]। তবে, যুক্তিবিদ্যার দ্বারা মূল্যায়িত প্রায় সব প্রস্তাবনাই স্বাভাবিক ভাষায় গঠিত যা সেই ভাষায় আমাদের বুঝতে হবে যে ভাষায় প্রস্তাবনা উচ্চারিত বা লিখিত হয়েছে এবং তারপর এখান থেকে বিশুদ্ধ অর্থ বের করে নিতে হবে। এর অর্থ এই যে, যুক্তির গ্রাহ্যতা এবং প্রস্তাবনার নির্ভুলতার জন্য গভীরভাবে ভাষা অধ্যয়নের প্রয়োজন। এভাবে আল-সিরাফী পুরোপুরি সর্বজনীন জ্ঞানের অস্তিত্বের বিপক্ষে নন, ঠিক তেমনি তিনি যেকোনো প্রতিক্রিয়াশীল যুক্তিবিদ্যা অধ্যয়নের গুরুত্ব সম্পর্কেও সচেতন।

গ্রিক অবরোহ এবং ইসলামি আরোহ

এই অধ্যায়ে আমাদের বিষয়বস্তু হচ্ছে যুক্তিবিদ্যায় উল্লেখযোগ্য ইসলামি অবদানকে তুলে ধরা, যা আমাদের যুক্তিবিদ্যার প্রতি মুসলিমদের সাধারণ মনোভাব নিবৃত্তকরণে বাধ্য করবে। এর অর্থ এই যে, আমাদের লক্ষ্য এমন অবদানের ওপর

---

১৪৩ আবু হাইয়ান; আলমোকাবাসাত, সম্পাদনা : মোহাম্মদ তাওফীক হোসেন, দার আল-আদব ১৯৮২, পৃষ্ঠা ১০৮-১১১।

১৪৪ ইয়াকূত আল-হামাভী, মু'জাম আল-উদাবা, সম্পাদনা : ইহসান 'আব্বাস ১৯৯৩ বৈরুত। পৃষ্ঠা ৮৯৮-৮৯৯।

www.pathagar.com

জোর দেওয়া যা বিদ্যমান জ্ঞানে নতুন উপকরণ যোগ করেছে এবং যা স্বাধীন ও সৃজনশীল বৃত্তির ইসলামি দিককে উদঘাটন করে।

এই দিককে সংক্ষিপ্তকরণে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ মুসলিম পণ্ডিতদের অন্যতম হচ্ছেন ইবনে তাইমিয়াহ, যুক্তিবিদ্যার ওপরে যার অভিমত সম্পূর্ণভাবে মুসলিম চিন্তাবিদদের থেকে পৃথক ছিল। ইবনে তাইমিয়াহ যুক্তিবিদ্যার সর্বজনীনতার বিরোধিতা করেন। তিনি অ্যারিস্টটলের যুক্তিবিদ্যার দ্বারা যেকোনো মানবিয় সংস্কৃতির কোনো প্রকার মূল্যায়নের বৈধতার ধারণা সম্পর্কে নেতিবাচক অভিমত পোষণ করতেন। তিনি এমতও পোষণ করতেন যে, অবরোহমূলক যুক্তিবিচার নতুন ভাবধারা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ হলেও আমাদের বহির্জগত হতে আগত প্রকৃত জ্ঞানের পেছনে রেখে দেয়। এই অবস্থান তাকে আরোহ পদ্ধতির গুরুত্বের প্রতি প্রথম অন্তর্দৃষ্টি অর্জনের পথে চালিত করে। এই পরবর্তী পদ্ধতি বিমূর্ত ভাবধারার একটি হতে অন্যটিতে কেবল নড়াচড়ার চেয়ে পরীক্ষণের ওপর গড়ে উঠেছে।

এ ব্যাপারে সাধারণ ঐকমত্য রয়েছে যে, রজার বেকন- এর পূর্বে গ্রিক ও পাশ্চাত্য দর্শন অবরোহ পদ্ধতিকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছিল যার স্থূল অর্থ হচ্ছে চিন্তার যৌক্তিক আন্দোলন। এক জ্ঞাত ভাবধারা হতে (সাধারণত ক্ষেত্র বলা হয়) অন্য এক অজ্ঞাত ভাবধারায় (যাকে বলা হয় উপসংহার) যাওয়া। এ আন্দোলনকে প্রদর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত যুক্তিবিচার বলা হয়। প্রকৃতিগতভাবে অবরোহ পদ্ধতির নিশ্চয়তা প্রয়োজন। যেমন- গণিতের ক্ষেত্রে কোন প্রদত্ত সমীকরণ প্রমাণে আমরা এক ধাপ হতে অন্য ধাপে যাই। ফলাফল প্রায়শই অনিশ্চিত জ্ঞান হতে ব্যবস্থিত উপায়ে প্রাপ্ত নিশ্চিত জ্ঞান। তবে, নিশ্চয়তা সর্বদাই মানবিয় বুদ্ধিবৃত্তির নাগালে থাকে না, কারণ আমাদের জ্ঞান সময় ও স্থান দ্বারা সীমিত। আমরা আমাদের মনকে পরিবর্তনশীল রাখি। মানবিয় জ্ঞানে প্রত্যক্ষ পরিবর্তন ঘটে। এটা প্রায়ই বলা হয় যে, জীবনে কেবল পরিবর্তনই স্থায়ী[১৪৫]। আজ যা নিশ্চিত আগামীকাল তা অনিশ্চিত হতে পারে। আমরা যখন নিরংকুশ সত্যের দাবি পেশ করি তখন আমরা তার নাগাল পাই না, পরিবর্তে আমরা এর কিছু ফল নিয়ে ফিরে আসি।

প্রকৃত কথা হলো অ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যায় অনুসৃত অবরোহ পদ্ধতি হচ্ছে অপরীক্ষিত জ্ঞান। কোনোপ্রকার পর্যবেক্ষণ কিংবা পরীক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন ছাড়াই

---

[১৪৫] গ্রায়েম ডোনাল্ড স্নুকস, The Laws of History (লন্ডন : রুটলেজ, ১৯৯৮), পৃষ্ঠা ১।

www.pathagar.com

এটি অনুমান ও মানসিক ধারণা অনুসরণ করে। উদাহরণস্বরূপ, অ্যারিস্টটল পতনশীল বস্তুর ওজন ও গতির মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে একটি সূত্র নির্ধারণ করেন। তিনি এই অভিমত পোষণ করতেন যে, পতনের সময় বল যত ভারী হবে তত দ্রুত তা মাটিতে পৌঁছাবে। এই সত্যতা হতে তিনি এমন একটি সূত্র নির্ণয় করেন যে একটি পতনশীল পাথর সর্বদাই গাছ হতে ঝরে পড়া পাতার চেয়ে দ্রুততর। এই সূত্র ২০০০ বছরেরও অধিককালব্যাপী স্বীকৃত বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে এর অবস্থান ধরে রাখে। গ্যালিলিওই প্রথম ব্যক্তি যিনি এর সত্যতা গবেষণার মাধ্যমে পরীক্ষার চেষ্টা করে এই অনুমানের ওপর প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি পিসা টাওয়ারে ওঠেন এবং দুটো ভিন্ন ওজনের বল ফেলেন। বিস্ময়করভাবে দুটো বল একই সময়ে একযোগে শব্দ করে মাটিতে পৌঁছায়। এই পরীক্ষণ গ্রিক যুক্তিবিদদের অবরোহমূলক ধারণাকে বাতিল করে দেয়[১৪৬]। অ্যারিস্টটল তাঁর অবরোহের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য গ্যালিলিওর মত পরীক্ষণ পরিচালনা করতে পারতেন, কিন্তু অবরোহ পদ্ধতি তাকে এ ধরনের গবেষণামূলক পরীক্ষা কাজ হতে নিবৃত্ত করে। একটি বাস্তবধর্মী ও গবেষণামূলক প্রেক্ষিত হতে গ্রহণ করে মুসলিম পণ্ডিতগণ সর্বসম্মতভাবে নিশ্চয়তার ধারণার বিরুদ্ধাচরণ করেন। কারণ কেবল আল্লাহ তায়ালাই বিশেষ প্রক্রিয়ায় জানতে পারেন। মানুষ তার দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা ও নির্ভরশীলতার কারণে কেবল একধরনের জ্ঞানে উপনীত হতে পারে যা তাকে এর ফলাফল ব্যবহারে সমর্থ করে। সুতরাং কোনো ব্যক্তিই নিশ্চয়তার দাবি উপস্থাপনের সাহস দেখাতে পারে না।

মুসলিমরা জ্ঞানের জন্য আকুল কামনা করেছিল। তারা অন্যদের কাছ থেকে শিখে জ্ঞান অর্জনের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা দ্বারা চালিত হয়েছিল। এটা ইসলামি সভ্যতার একটি ইতিবাচক দিক। কারণ তারা অন্য সভ্যতার কাছ থেকে প্রাপ্ত অবদানের মূল্যকে স্বীকৃতি দিয়েছে। যখন আপনি দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ে মধ্যযুগের ইসলামি বইপুস্তক পড়বেন, তখন তাদের সূত্র হতে প্রাপ্ত ভাবধারা ও বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আসতে হবে। মুসলিমদের কখনই তাদের বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে অন্যান্য সভ্যতার প্রভাবের সাক্ষ্য নিশ্চিহ্ন করার ইচ্ছা ছিল না। তবে মুসলিমগণ অন্যদের জ্ঞান ধার

---

[১৪৬] হাফিজুর রহমান সিদ্দিকী : The Developemnt of Scientific Methodology by the Muslim Scientiss. MAAS জার্নাল অব ইসলামিক সায়েন্স, ১ম খণ্ড, নম্বর ১ জানুয়ারি, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা ৪৭।

www.pathagar.com

করার ব্যাপারেও পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল না। তারা কখনই অন্যদের নিকট হতে পাওয়া জিনিসে সুখী ও পরিতৃপ্ত হয়নি, কারণ তারা জানত যে ধার করার কাজটির কোনো শেষ নেই। যেহেতু তারা তাকলীদ (অনুকরণ)-এর দুর্বলতা ও সৃজনশীলতার সুবিধা সম্বন্ধে সচেতন ছিল, তাই তারা ধার-করা জ্ঞানের উর্ধ্বে চলে যায় এবং মানব প্রগতির নতুন লক্ষ্যের জন্য নতুন পদ্ধতি নির্ধারণ করে।

যেমনটা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, গ্রিক বিজ্ঞানীরা অবরোহ পদ্ধতির দ্বারা আচ্ছন্ন ছিলেন। মুসলিম পণ্ডিতগণ দেখতে পেলেন যে গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও এই পদ্ধতি উৎপাদনশীল নয়, বিশেষত বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে। এবং এটাই সেই কারণ যার জন্য মুসলিমগণ নতুন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পথে অগ্রসর হলেন। তা হলো আরোহ পদ্ধতি যা পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ, সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ এবং তারপর বিজ্ঞানভিত্তিক সূত্র গঠনের ভিত্তিতে গঠিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এটি পাশ্চাত্যের ঐসব বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদদের দ্বারা বিপুলভাবে সমর্থিত হয়েছিল, যেমন রজার ও ফ্রান্সিস বেকন। এরা ছিলেন নতুন পরীক্ষণমূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা। এতদ্‌সত্ত্বেও, পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক অর্জনের ওপর কোনো প্রকার ইসলামি প্রভাবের কোনো দলিল-প্রমাণ মুছে ফেলার ক্ষেত্রে এই দাবি ছিল একটা অংশ।

আরব সংস্কৃতির নিকট বিজ্ঞান প্রভূতভাবে ঋণী; এর অস্তিত্বও ঋণী। প্রাচীন বিশ্ব ছিল বৈজ্ঞানিক-পূর্ব, যেমন আমরা বলি। গ্রিকদের গণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা ছিল বিদেশি আমদানি। কখনও তা পুরোপুরিভাবে গ্রিক সভ্যতার সাথে অভ্যস্ত ছিল না। গ্রিকরা প্রণালীবদ্ধ করেছে, বিবৃতি বা সাধারণীকরণ করেছে এবং তত্ত্ববদ্ধ করেছে। কিন্তু অনুসন্ধানের সহিষ্ণু পদ্ধতি, ইতিবাচক জ্ঞানের একীকরণ, বিজ্ঞানের যথাযথ পদ্ধতি, বিশদ ও দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণগত অনুসন্ধান ছিল গ্রিক মেজাজের নিকট সর্বতোভাবে অপরিচিত[১৪৭]।

যুক্তিবিদ্যায় ইবনে তাইমিইয়ার অবদান

তাকী আল-দীন আহমাদ ইবনে তাইমিয়াহ হলেন ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিগণের অন্যতম। ধর্মীয় চিন্তাধারার সংস্কারে তার প্রতিশ্রুতি এবং তার সময়কালে ইসলামি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তার কষ্টসাধ্য সংগ্রাম তাকে আইনবেত্তা ও ধর্মতাত্ত্বিকসহ অনেক ইসলামি পণ্ডিতদের

[১৪৭] ব্রিফল্ট, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৮।

www.pathagar.com

বিরুদ্ধে বিতর্কমূলক যুক্তি উপস্থাপনে বাধ্য করে। তাঁর জীবন ছিল অতীব বর্ণাঢ্য এ হিসেবে যে নিজ পারিবারিক জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার মতো সময় তার ছিল না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার আগ্রহ পরিব্যাপ্ত ছিল : আইনশাস্ত্রীয়, দর্শনশাস্ত্রীয় ও রাজনৈতিক। তার জীবনে আমাদের জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ তা হলো সৃজনশীলতার জন্য তার উৎসর্গচিত্ততা। তিনি তার আইনশাস্ত্রীয় মতামতের ক্ষেত্রে তাকলীদবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করেন। হাম্বলী আইনঘরানার প্রতি সমর্থনের সাধারণ নীতির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি তার নিজ পথ প্রশস্ত করেন এবং ঐ ঘরানার অনেক অভিমতই বাতিল করে দেন। চার ফিকহী মাযহাবের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ইবনে তাইমিয়াহ চমকপ্রদ পুস্তকাদি প্রণয়ন করেন। উদ্দেশ্য ছিল শরিয়াহ সংক্রান্ত বিষয়ে ফিকহবিদদের প্রতি বিরোধিতার বিষয়ে মুসলিমদেরকে শিক্ষা দান। ইসলামি পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে তার অবদান উল্লেখযোগ্য এবং সৃজনশীলতার পক্ষে তার দৃঢ় অবস্থানের পরিচায়ক।

সৃজনশীলতার একজন বলিষ্ঠ প্রচারক হিসেবে ইবনে তাইমিয়াহ আল-ফারাবী ও ইবনে সীনার মতো মুসলিম দার্শনিকদের 'গ্রিক দর্শনের প্রতি তাদের অন্ধ আনুগত্যের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সমালোচনামুখর ছিলেন[১৪৮]।

সর্বজনীন বিষয়ে ইবনে তাইমিয়াহ

আমাদের এ গ্রন্থের প্রকৃতি অনুযায়ী আমরা যেকোনো দর্শনগত আলোচনা বা বিমূর্ত বিশ্লেষণ হতে নিজেদেরকে দূরে রাখব। যুক্তিবিদ্যায় সর্বজনীন হচ্ছে সেসব ধারণা যা সাধারণভাবে বিষয়াদি সম্পর্কে গড়ে ওঠে। এগুলো হচ্ছে সাধারণ ধ্যান-ধারণা যাতে ব্যক্তিকে সাধারণ পরিচয়ভুক্ত করা হয়। একদিকে, এই নাম অভিন্নতার (ব্যতিক্রমহীনতা) ঝোঁকপ্রবণ যা বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে থাকে, যার ফলে একটি একক ভাবধারার দ্বারা বিভিন্ন বস্তুকে প্রতিনিধিত্ব করা যায়; এবং অন্যদিকে এই একটি ভাবধারা যা বিভিন্ন বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।

বিষয়কে সহজ করতে আমরা বলতে পারি যে, শুভ্রতা হচ্ছে সাদাবস্তুর সর্বজনীনতা। সুতরাং এমন একটি ভাবধারা যা মৌলিকভাবে বিভিন্ন দ্রব্যকে আবেষ্টন করে কিন্তু একই সাদা রং সহকারে। এখানে একটি সাদা কুকুর, সাদা বাড়ি এবং সাদা

---

[১৪৮] মধ্যযুগীয় ইসলামি বাস্তবতা, সুন্নী আইন তাত্ত্বিকগণের মূল পাঠে যোগাযোগের মডেল, মোহামেদ ইউনুস আলী, কার্জন, ২০০০, ব্রিটেন, পৃষ্ঠা ৮৭।

www.pathagar.com

মানুষকে অভিন্ন ধারণার দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা যায়। গ্রিকদের অনুসরণে মুসলিম দার্শনিকগণ এই অভিমত পোষণ করেন যে, ব্যক্তির থেকে মুক্ত অবস্থায় সর্বজনীন ধারণার একটি বাহ্যিক অস্তিত্ব রয়েছে। এজন্যই বলতে হয় যে, শুভ্রতা সাদা বস্তু হতে স্বাধীনভাবে বিরাজ করে। এজন্যই তারা এমত পোষণ করেন যে, বিষয়টি জানার মাধ্যমে ব্যক্তি সর্বজনীনসমূহের নির্যাসকে উপলব্ধির ভেতর দিয়ে এর অর্থ সংজ্ঞায়িত করতে সমর্থ হয়।

অভিজ্ঞতালব্ধ ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি হতে ইবনে তাইমিয়াহ সাদা বস্তুকে উল্লেখ না করে শুভ্রতা বর্ণনার ক্ষেত্রে আমাদের সামর্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তার এই অভিমত ছিল যে, আমাদের চারপাশের একমাত্র বাস্তবতা হচ্ছে বস্তু কিংবা ভিন্ন ভিন্ন সত্তা। সুতরাং যদি আমরা সর্বজনীন ভাবধারা সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে পারি তাহলে আমাদের একক (ব্যক্তি পর্যন্ত)-এর আশ্রয় নিতে হবে। কারণ, তার মতে, সর্বজনীন বিষয়াদি বাহ্যিক বাস্তবতা সম্বন্ধে মানবমনের ধারণাকরণ ছাড়া কিছুই নয়। আমি মনে করি এই ভাবধারা হচ্ছে আরোহ পদ্ধতির পক্ষে ইবনে তাইমিয়াহ'র যুক্তির ফল। অথবা, প্রকৃতপক্ষে এই ভাবধারা তাকে সংক্ষিপ্ত অনুমানের/সিদ্ধান্তের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবে আরোহের পক্ষাবলম্বন করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। কারণ বিমূর্ত ভাবধারা গঠন করতে হলে আমাদের সেই বিশেষ বস্তু হতে শুরু করতে হবে যাতে এই ভাবধারা বিদ্যমান। সৌন্দর্য সম্বন্ধে ধারণা পেতে হলে আমাদেরকে সুন্দর দৃশ্যের সম্মুখীন হতে হবে। ইবনে তাইমিইয়াহ যা উপস্থাপন করতে চেয়েছেন তা বট্রান্ড রাসেল খুব সহজ প্রক্রিয়ায় ব্যাখ্যা করেন :

আসুন প্রথমে আমরা সর্বজনীনসমূহের জ্ঞানকে অবগতির দ্বারা বিবেচনা করি। শুরু করতে গেলে এটা নিশ্চিত যে, আমরা সাদা, নীল, কাল, মিষ্টি, তেতো, উচ্চ, শক্ত ইত্যাদি সর্বজনীনের সাথে অর্থাৎ এমন বৈশিষ্ট্যের সাথে পরিচিত হই যেগুলো অনুভবগত উপাত্ত দ্বারা প্রমাণ করা হয়। যখন আমরা একটি সাদা টুকরা দেখি, আমরা প্রথম দৃষ্টান্তেই বিশেষ টুকরার সাহায্যে সহজেই এদের সকলের যে সাধারণ শুভ্রতা রয়েছে তার সাথে পরিচিত হই। কিন্তু অনেক সাদা টুকরা দেখে আমরা সহজেই তাদের সকলের মধ্যকার সাধারণ শুভ্রতাকে পৃথক করতে শিখি এবং এমন করা শিখতে গিয়ে আমরা এর শুভ্রতার সাথে পরিচিত হতে শিখি। এই পদ্ধতি আমাদের একই ধরনের অন্য সর্বজনীন সম্পর্কে পরিচিতি লাভে সহায়তা করে। এই প্রকার সর্বজনীনকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। তাদেরকে বোঝা যেতে

www.pathagar.com

পারে অন্য কিছুর তুলনায় পৃথকীকরণের স্বল্প আয়াসে এবং তাদেরকে অন্য সর্বজনীনের চেয়ে বস্তু হতে কম বিচ্ছিন্ন মনে হয়।

আমরা পরবর্তীতে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আসি। উপলব্ধির যোগ্য সহজতম সম্পর্ক সেগুলো যা একটি একক অনুভূতি-তথ্যের ভেতরের অংশগুলোকে ধরে রাখে। উদাহরণস্বরূপ, যে পৃষ্ঠায় আমি লিখছি তার সমস্তটুকুই আমি এক পলকে দেখতে পারি; এভাবে পূর্ণ পৃষ্ঠাটি একটি অনুভূতি-তথ্যের অন্তর্ভুক্ত হলো। তা সত্ত্বেও, আমি ধারণা করি যে পৃষ্ঠাটির কিছু অংশ অন্য অংশের বামে রয়েছে এবং কিছু অংশ অন্য অংশগুলোর উপরে রয়েছে। এক্ষেত্রে বিমূর্তকরণের প্রক্রিয়া এরকম কিছুর দিকে ধাবিত মনে হয় : আমি পরপর কিছু সংখ্যক অনুভূতি-তথ্য দেখি যাতে এক অংশ অন্য অংশের বামে থাকে; আমি অনুমান করি, যেমন বিভিন্ন সাদা টুকরার ক্ষেত্রে, এসব অনুভূতি-তথ্যের মধ্যে সাধারণ কিছু রয়েছে এবং বিমূর্তকরণের দ্বারা আমি দেখি যে, তাদের মধ্যে যেগুলো সাধারণ সেগুলো হচ্ছে তাদের অংশসমূহের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক। উদাহরণস্বরূপ, সেই সম্পর্ক যাকে আমি বলি বামদিকেরই। এভাবে আমি সর্বজনীন সম্পর্কের সাথে পরিচিত হই[১৪৯]।

ইবনে তাইমিইয়ার মতে, কোনো ব্যক্তিরই এমন সামর্থ্য নেই যে, সর্বজনীন বস্তুসমূহের অস্তিত্বের ব্যাপারে দাবি উপস্থাপন করবে। সে এমনকি আরো অগ্রসর হয়ে সময়কে প্রমাণ করবে এবং পুনরায় : বহির্জগতে সর্বজনীন কখনই থাকতে পারে না। এগুলো কেবল মনেই অবস্থান করে এবং অন্য কোথাও নয়[১৫০]। বাস্তবে যা দেখা যায় অস্তিত্বশীল হিসেবে তা হচ্ছে পদার্থ বা প্রাণি। প্রত্যেক প্রাণি বা ব্যক্তির তার অস্তিত্বের নিজস্ব প্রেক্ষিত রয়েছে। পদার্থ বা বস্তু প্রকৃতিগতভাবে সুনির্দিষ্ট, অনুপম এবং তাই পদার্থ কখনও একরূপ হয় না। যদি তারা অভিন্ন হতো তাহলে আমরা এগুলোকে একই সর্বজনীন ধারণার অধীন বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করতে পারতাম যা অসম্ভব। তিনি স্বীকার করেন যে, বস্তুর মধ্যে সামঞ্জস্য হতে পারে, কিন্তু পুরোপুরি সমরূপ হওয়া একেবারে অসম্ভব। হাল্লাক এরকম অভিমতকে ইবনে তাইমিয়ার অন্যতম বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করেন[১৫১]।

---

[১৪৯] The Problems of Philosophy. Bertrand Russel.

[১৫০] Ibntaymiyah against Greek Logicians, অনুবাদ : Wael B. Hallak, ক্লারেনডন প্রেস, অক্সফোর্ড, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ২২।

[১৫১] প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

সংক্ষেপে বলতে গেলে, ইবনে তাইমিয়াহ অ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যার বিরুদ্ধে তার প্রচারণাকে এই পূর্ণতার যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন যে, আমাদের বুদ্ধিমত্তা যা গ্রহণ করতে পারে তা থেকে বাস্তবতা ভিন্ন হতে পারে। এমন ঘটে যখন বাস্তবতাকে ভাবধারা ও ধারণার আকারে গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ যদি আমরা আমাদের বাস্তবতার ওপর অগ্রাধিকার দিতেই থাকি তাহলে আমরা সত্যে উপনীত হতে পারি না। সত্যে উপনীত দার্শনিকগণ তাদের নিজ লক্ষ্য অর্জনে পিছিয়ে পড়েছেন এজন্যই যে তারা বাস্তবতাকে তাদের এসম্বন্ধীয় ধারণার ঠিক সমান্তরাল করেছেন। এভাবে ইবনে তাইমিয়াহকে এই অভিজ্ঞতা-নির্ভর অবস্থানের জন্য মূল্য দেওয়া উচিত যা অ্যারিস্টটলীয় অবরোহমূলক যুক্তিবিদ্যার অসারতা নির্দেশের দরজা খুলে দিয়েছে একটি প্রভাবক উদ্যোগের সাহায্যে, এক নতুন যুক্তিবিদ্যা উদ্ভাবনে, যা অবরোহী প্রথার পরিবর্তে আরোহী প্রথাভিত্তিক। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে দৃঢ়তর করেছেন ড্যানিয়েল জে. সুলিভান যখন তিনি দাবি করেন যে, যুক্তিবিদ্যার প্রবণতা হচ্ছে মানুষের মনের কম্পাসে মহাবিশ্বকে গুটিয়ে নেওয়া যা ইতিহাসের যাত্রাপথে তিক্ত ফল নিয়ে এসেছে।

সবগুলোও বারংবার এবং আমাদের নিজেদের সময়ে কম না হলেও সমগ্র মানবসমাজই বেপরোয়াভাবে ও সর্বনাশাভাবে পরিকল্পনা ও সংস্কারের অভ্যন্তরীণ যুক্তিবাদের অধীন আত্মসমর্পণ করেছে। অতি সংকীর্ণভাবে বা ভ্রান্তিপূর্ণভাবে ... বরং সত্য সঙ্গতির চেয়েও বেশিকিছু এবং এর আনুষ্ঠানিক যুক্তিবিদ্যা নিজে কোনো জিনিসের চূড়ান্ত সত্য উপহার দিতে অসমর্থ। এটি সেই নীতিকে যাচাই ও প্রতিরোধ করতে পারে না যার মধ্যে এর পরিণতি রয়ে গেছে। সেজন্য একে অন্যত্র দর্শন ও বিজ্ঞানের দিকে তাকাতেই হবে। আনুষ্ঠানিক যুক্তিবিদ্যা একটি হাতিয়ার এবং যেকোনো হাতিয়ারের মতো সেই ব্যক্তির ওপর নির্ভরশীল যে তা ব্যবহার করে। এটা ভালো বা খারাপ যেভাবেই ব্যবহৃত হোক না কেন... যুক্তিবিদ্যা চিন্তার কোনো বিকল্প নয়। এবং কোনো পরিমাণ যুক্তিই অসংবেদনশীল বোধশক্তির নিষ্প্রভতাকে একটি ধারাল অবস্থায় রূপান্তরিত করতে পারে না। তবে সত্য এই যে, যদি আমরা একবার ঠিকপথে এসে যাই তাহলে যুক্তিবিদ্যা আমাদের সেখানে থাকতে সাহায্য করতে পারে এবং প্রদত্ত সেই একই প্রকার সহজাতবৃত্তি যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞাত

www.pathagar.com

ব্যক্তিকে অধিকতর নির্ভুলভাবে তার চিন্তনের ক্ষেত্রে এমন ব্যক্তির চেয়ে সঠিকত্বে পৌছায় দেবে যে তা (চিন্তা) করে না[১৫২]।

ইসলামি আরোহ (Islamic Induction)

ইসলামি পরিবেশে আরোহ পদ্ধতি বিজ্ঞান ও ব্যবহার শাস্ত্রের প্রয়োজনীয় পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে। মানবিয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই বিশাল অবদান পরবর্তীতে পাশ্চাত্যের বৈজ্ঞানিক উন্নয়নে চালিকা শক্তিতে পরিণত হয়েছে। অ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যা সর্ম্পকে মুসলিম সমালোচনাকে অনেক ইউরোপীয় বিজ্ঞানী বিজ্ঞান অনুসন্ধানে নতুন ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

বিজ্ঞান ও ব্যবহারশাস্ত্রই হচ্ছে মূলত সেই দুটি ক্ষেত্র যেখানে আরোহমূলক যুক্তিবিদ্যাকে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

মুসলিমগণ তাদের সিদ্ধান্তের কার্যকর পদ্ধতির অনুসন্ধানে আরোহকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছেন। তারা আরোহ পদ্ধতিকে দু'ভাগে বিভক্ত করতে সম্মত। ১. পূর্ণাঙ্গ আরোহ এবং ২. অপূর্ণ আরোহ। প্রথমটি প্রকল্পিতভাবে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সরবরাহ করে (মা'রিফাহ ইয়াকীনিইয়াহ্)। একই সময়ে, দ্বিতীয়টি কেবল সম্ভাব্য জ্ঞান (মা'রিফা যান্‌নিইয়াহ্)-এর দিকে চালিত করে। আরোহ পদ্ধতির যৌক্তিক কাঠামো নিম্নরূপ :

মনে করুন যে এস্$_১$, এস্$_২$, এস্$_৩$, এস্$_৪$ ... এস$_{এন}$ হচ্ছে সার্বজনীন সত্তা S (এস)-এর ভিন্ন ভিন্ন অংশ

S_1 হচ্ছে Q

S_2 হচ্ছে Q

S_3 হচ্ছে Q

S_4 হচ্ছে Q

S_n হচ্ছে Q

অতএব, S হচ্ছে Q।

---

[১৫২] Fundamentals of Logic, পৃষ্ঠা ১৪।

www.pathagar.com

স্বাভাবিক ভাষায়, আমরা 'S' কে একটি মানুষ মনে করি এবং S_1, S_2, S_3, S_4, S_n কে পরপর : জামাল, ফাতিমা, জাওয়াদ, যয়নাব এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো ব্যক্তিকে S_n গণ্য করতে পারি। আমরা তাদের মরণশীলতার বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ Q আরোপ করলে দাঁড়ায়।

যেহেতু জামাল মরণশীল

ফাতিমা মরণশীল

জাওয়াদ মরণশীল

যয়নাব মরণশীল

এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো ব্যক্তিই মরণশীল

অতএব যেকোনো মানুষই মরণশীল।

মুসলিম পণ্ডিতগণ এ ধারণা প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রগামী রয়েছেন যে, আরোহ পদ্ধতি সম্ভাব্য অনুমিতির পথে চালিত করে। তবে, এ অবস্থান তাদেরকে কখনো আরোহমূলক চিন্তন প্রক্রিয়া গ্রহণ থেকে বিরত করতে পারেনি। কারণ এই যে, তারা মানবিয় জ্ঞানের নিশ্চয়তার অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। অনেক শতকের ঘটনাপ্রবাহ জ্ঞানের নিশ্চলতা কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। সৃজনশীলতার সাথে সংশ্লিষ্টতার ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতার ধারণা উৎপাদনশীল। কোনো ইজতিহাদ হতে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দাবির চিন্তা ইজতিহাদকে সমাধিস্থ করার মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

নির্ভরযোগ্য ফলাফল প্রদানের সারবত্তা সম্পর্কে গাজ্জালী আরোহ পদ্ধতির পক্ষে কিছু পূর্ণাঙ্গ যুক্তি উপস্থাপন করেন। তিনি নিম্নলিখিত উদাহরণ পেশ করেন :

মনে করুন আমরা একজন ব্যবসায়ীকে লাভ করার জন্য সফর করতে বললাম। ব্যবসায়ী আমাদেরকে প্রশ্ন করতে পারেন, আমরা কিভাবে জানলাম যে সফর করলেই তিনি লাভ করবেন। আমরা জবাব দিতে পারি যে, অনেক লোকই সফর করেছেন এবং লাভ করেছেন। এভাবে চিন্তার একটি আরোহ পদ্ধতি দেখা যায়। তা হচ্ছে, অনেক লোক সফর করে লাভ করেছেন অতএব আমরা যে ব্যক্তির সাথে কথা বলছি তিনিও সফর করলে লাভ করবেন। এখানে অনুমান করা হচ্ছে এক বিশেষ হতে সাধারণ পর্যন্ত। ঐ ব্যক্তি আমাদের চিন্তাধারা এই বলে বাতিল করতে পারেন যে, অনেক লোকই সফর করার পথে মারা গেছেন কিংবা কমপক্ষে তাদের সম্পদ হারিয়েছেন। জবাবে আমরা বলতে পারি যে, যারা হারিয়েছেন তাদের চেয়ে যারা

www.pathagar.com

লাভ করেছেন তাদের সংখ্যাই বেশি (এখানে পুনরায় অপূর্ণাঙ্গ আরোহ ব্যবহার করা হয়েছে), ঐ ব্যক্তি বলবেন : এবং কে আপনাদের বলেছে যে, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত নই? আল-গাজ্জালী এই বলে শেষ করেন যে, এখানে নিশ্চয়তা প্রদান করা অসম্ভব। যদি আপনি জানেন যে, অনেক লোক সফর করে এর মাধ্যমে অর্থ কামাই করেছেন, এটা সফরের জন্য একটা ভালো কারণ হতে পারে লোকসানের ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও। গাজ্জালী প্রদত্ত এই সুন্দর দৃষ্টান্ত একথাই বলে যে, আরোহমূলক যুক্তিবিদ্যার নির্ভরযোগ্যতা সম্ভাব্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত, নিশ্চয়তার ওপর নয়।

গণিত

গণিতের ক্ষেত্রে মুসলিমদের অবদান বিপুলভাবে উল্লেখযোগ্য। যদিও মুসলিম গণিতবিদগণ প্রাচীন গ্রিক ও ভারতীয় সভ্যতা হতে প্রভূত উপকৃত হয়েছেন। তা সত্ত্বেও ইসলামি গণিত কেবল এসব প্রাচীন ঐতিহ্যের চলমানতাই নয়। মুসলিমগণ এক্ষেত্রে একটি নবযুগের সূচনায় যথেষ্ট সৃজনশীল ছিলেন। তাদেরকে স্বীকৃতি এজন্যই দিতে হয় যে তারাই গাণিতিক শূন্য বা সিফর-এর আবিষ্কারক। এই নতুন উদ্ভাবনের ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার বিষয়ক দৈনন্দিন সমস্যা'র ক্ষেত্রে গণিতকে ব্যবহার করা তাদের জন্য সহজ হয়ে ওঠে[১৫৩]। ল্যাটিন ভাষায় শূন্য'র প্রতিশব্দ হচ্ছে সিফ্‌রা যা উদ্ভূত হয়েছে স্পষ্টতই আরবি ভাষা হতে। মুসলিমগণ গণিতের ক্ষেত্রে সংস্কৃত সংখ্যা ব্যবহার করেন এবং পরে এগুলোকে ব্যাপক সংশোধন করে পাশ্চাত্য জগতে স্থানান্তর করেন। এর ফলে এটা ইউরোপে আরবি সংখ্যা হিসেবে পরিচিত হয়[১৫৪]। আল-খাওয়ারিযমী'র গ্রন্থ কিতাব আল-হিসাব (গণিত বিষয়ক গ্রন্থ)-এর ল্যাটিন অনুবাদের মাধ্যমেই আরবি সংখ্যাতত্ত্ব ইউরোপে পরিচিতি লাভ করে।

ইসলামি পরিবেশের মধ্যে গণিত শাস্ত্র বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গড়ে ওঠে, যেমন : সংখ্যার বিজ্ঞান কিংবা পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা ও

---

১৫৩ Islam and the Evolution of Science, Muhammad Saud the Islamic Research Institute. No. 64. ইসলামাবাদ, ১৯৮৬; পৃ- ২৪।

১৫৪ A Young Muslim's Gguide to the Modern World, Sayyed Hussein Nasr, 1994। Mekar Publishers, Petaling Jaya, Malaysia, P- 89.

www.pathagar.com

সঙ্গীত[১৫৫]। বলবিদ্যা ও আলোকবিদ্যার মতো প্রকৃতি বিষয়ক অন্যান্য বিজ্ঞান শাস্ত্রও গাণিতিক সূত্রের ভিত্তিতে অধীত হয়[১৫৬]। সৈয়্যদ হুসেইন নাসের এ অভিমত পোষণ করেন যে, মুসলিমগণ এর বিমূর্ত প্রকৃতির জন্যই গণিত অধ্যয়নে ঝুঁকে পড়েন, যা, পরবর্তীতে কুরআনের ওহির বিমূর্ত রূপের অনুরূপ হয়ে ওঠে[১৫৭]। তবে আমরা এ রকমের কোনো ব্যাখ্যা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করি এ কারণে যে ইসলামি বিশ্বদর্শন আল্লাহ তায়ালার ওহি দ্বারা বিমূর্তের স্থলে বাস্তবতাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। অদৃশ্যে বিশ্বাস দুটি প্রকৃত কিন্তু অলৌকিক প্রপঞ্চের মধ্য দিয়ে বাস্তব সাক্ষ্য দ্বারা প্রতিফলিত হয়েছে : ১- নবি সা. এবং ২- আল-কুরআন।

পরেরটি মানুষকে জ্ঞান অর্জনে তাদের অনুভূতির সাথে যুক্তির মিলন ঘটানোর এক সমৃদ্ধ উত্তরণ পথে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা জুগিয়েছে। এটাই এক অবিস্মরণীয় উন্নয়ন ঘটিয়েছে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে যা বিমূর্ততার চাইতে বাস্তবতার সাথেই সংশ্লিষ্ট। এমনকি গণিত নিজেও, এর বিমূর্ততা সত্ত্বেও মুসলিম পণ্ডিতদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছে প্রাকৃতিক প্রপঞ্চকে অধ্যয়ন ও উপলব্ধির উদ্দেশ্যে, পাশাপাশি প্রতিদিনের ঐসব কাজ সম্পাদনে যা গণনার রীতি দাবি করে।

গণিতের ইসলামিকরণ : বিশুদ্ধতাপন্থীদের সংখ্যাতত্ত্ব

একথা উল্লেখের প্রয়োজন যে গণিত কেবল ব্যবহারিক উদ্দেশেই ব্যবহৃত হতো না, কিংবা একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্দেশেই, বরং মুসলিম পণ্ডিতগণ এই জ্ঞানকে পুঁজি করে আল্লাহ তায়ালা সম্পর্কে উন্নততর জ্ঞান অর্জনে প্রয়াসী হন। এ দ্বারা এটা নির্দেশ করে যে, জ্ঞান অন্বেষণের উদ্দেশ্যের পরিণতি এর অর্জনের মধ্যেই নিহিত-এমন ধারণা প্রাথমিক যুগের মুসলিমগণ বাতিল করেছেন। এখানে সর্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিশুদ্ধতাপন্থীদের (ইখ্ওয়ান আল-সাফা) অবদান, বসরার একদল পণ্ডিত যারা

---

[১৫৫] ইসলামি সভ্যতায় সঙ্গীত গণিতকে ছন্দ ও সুরের অধ্যয়নে কাজে লাগিয়েছে। এভাবে, কিছু মুসলিম গণিতবিদ সঙ্গীত বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন যেমন : ইবনে সীনা, আল-ফারাবী ও আল-গাজ্জালী। বিশদ জানতে দেখুন : Seyyed Hussim Nasr : Science and Civilization in Islam, ১৯৮৬, Dewan Pustaka FJar 1984. মালয়েশিয়া, পৃষ্ঠা ১৪৯-১৫০।

[১৫৬] Tarihk al-'ulum 'inda al 'arab, Omar Farrukh, dar al 'ilm lil malayin, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৪ বৈরুত লেবানন, পৃষ্ঠা ১৩২।

[১৫৭] A Young Muslim's Guide to the Modern World, Sayyed Hussein Nasr, 1994. P- 89

www.pathagar.com

চতুর্থ হিজরি শতকের সমসাময়িককালে কোথাও বসবাস করতেন। তারা সৃষ্টি ও জ্ঞান সংক্রান্ত শাস্ত্র অধিবিদ্যার ওপর আলোকসম্পাতের জন্য গণিতের ক্ষমতায় বিশ্বাস করতেন। সংখ্যা বিষয়ে তাদের দর্শনের একটি অংশ পিথাগোরাস ও তার শিষ্যদের কর্ম হতে গৃহীত[১৫৮]। তারা সংখ্যার ধ্যানকে একপ্রকার উপাসনা বলে বিবেচনা করতেন। কারণ, তাদের মতে, সংখ্যা সংক্রান্ত অধ্যয়ন ছিল পিথাগোরাসের দক্ষতার ক্ষেত্র, যিনি ছিলেন নবি ইদরীস (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)-এর মহত্তম অনুসারীদের একজন। তাদের কোনো একটি যাজকীয় পত্রে তারা বলেন :

জেনে রাখো, হে ভাই, (আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ও আমাদের তাঁর আত্মা দ্বারা সহায়তা করুন) যে, পিথাগোরাস ছিলেন একজন পরম বিজ্ঞ ব্যক্তি, একজন হারানীয় (মেসোপটেমিয়ার হাররান সম্প্রদায় হতে, তারা দাবি করত যে, তাদের নবি ছিলেন ইদরীস বা ইনোক যাকে আমি সাধারণত হারমিস ট্রিসমেগিমসতাসের সাথে সনাক্ত করি) যাঁর পরম আগ্রহ ছিল সংখ্যা বিজ্ঞান এবং এদের উৎপত্তি বিষয়ে অধ্যয়ন করা, এবং এরা এসবের উপাদান সম্পর্কে বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা করেন, সেই সাথে শ্রেণিবিভাগ ও ক্রম সম্বন্ধেও। তিনি বলতেন : সংখ্যা এবং একত্ব হতে এদের উৎপত্তি বিষয়ক জ্ঞান যা (দুই-এর পূর্বে) হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার একত্ব সম্পর্কিত জ্ঞান, যিনি মহিমাময়। এবং মহিমাময় স্রষ্টা কর্তৃক জীবের জ্ঞান সংক্রান্ত জ্ঞান, এবং তাঁর শিল্পকর্ম, এর ক্রম এবং শ্রেণিবিভাজন। সংখ্যার বিজ্ঞান আত্মায় কেন্দ্রীভূত এবং তা স্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া জানার পূর্বে প্রয়োজন সামান্য ধ্যান ও কিছু স্মরণ...। জেনে রাখো হে ভাই, (আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ও আমাদের তার আত্মা দ্বারা সহায়তা করুন) যে, আল্লাহ তায়ালা, তাঁর প্রশংসা মহীয়ান, যখন তিনি সকল সৃজিতকে সৃষ্টি করলেন এবং সবকিছুকে অস্তিত্ব দান করলেন, তখন তাদেরকে অস্তিত্বে আনলেন এক সংখ্যা হতে প্রজন্মের প্রক্রিয়ায়। যাতে সংখ্যার এই বহুত্ব তাঁর একত্বের সাক্ষ্য হয়, এবং এদের শ্রেণিবিন্যাস ও ক্রম সৃষ্টিতে তাঁর জ্ঞানের পূর্ণতার ইঙ্গিত বহন করে[১৫৯]। এই আকর্ষণীয় বক্তব্যে দেখা যায় যে, বস্তুগত মহাবিশ্বকে একটি গাণিতিক সমীকরণ গণ্য করা হয়েছে এবং সে গণিত

---

[১৫৮] ওমর ফারুক, পৃষ্ঠা ১৩৪।

[১৫৯] সাইয়েদ হুসেইন নাসর : Science and Civilization in Islam. পৃষ্ঠা ১৫৫।

www.pathagar.com

দুটো ভিন্ন গন্তব্যে কাজ করে, একটি অধিবিদ্যা এবং অন্যটি পদার্থবিদ্যা। দুটোরই বিকাশ ঘটেছে আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় লক্ষ্যে।

আল-খাওয়ারিয্‌মী (মৃত্যু ৮৫০ হিজরি)

তাঁর পূর্ণ আরবি নাম হলো : আবু আবদ আল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে মুসা আল-খাওয়ারিয্‌মী। বীজগণিতের পিতা হিসেবে সুপরিচিত। তিনি গ্রিক ও ভারতীয় উৎস হতে শিক্ষা লাভ করেন। জ্ঞানগৃহের সদস্য হিসেবে নিযুক্ত হয়ে তিনি সম্মানিত হন, এটা ছিল উচ্চতর জ্ঞানের সবচেয়ে সম্মানজনক বিদ্যায়তন, মা'মুনের শাসনামলে (১৯২-২১৮ হিজরি/৮১৩-৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ)। এই প্রতিষ্ঠানে আল-খাওয়ারিয্‌মী ৩৫ বছর কাজ করেন, যে সময় তিনি বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষত গণিতে তত্ত্ব নির্মাণে কঠিন পরিশ্রম করেন।

তিনি তাঁর নিজস্ব কর্ম সাধন করেন যা পাশ্চাত্যে অনেক প্রজন্মে প্রভাব বিস্তার করে। তার গ্রন্থাদির ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদের মধ্য দিয়ে তিনি ইউরোপে পরিচিত হন। চমকপ্রদ ব্যাপার হচ্ছে, তার কিছু বই কেবল ল্যাটিন অনুবাদেই সংরক্ষিত হয়েছে এবং প্রকৃত আরবিতে লিখিত গ্রন্থাদির ভাগ্য এখনও অজানা।

ইসলামের ইতিহাস জুড়ে তাঁকেই সবচেয়ে প্রভাবশালী গণিতবিদ গণ্য করা যায়। আল-খাওয়ারিয্‌মী'র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান হচ্ছে হিসাব আল-জাবার ওয়া আল-মুকাবালা, ৮৩০ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত এই গ্রন্থ আমাদের শাব্দিক বীজগণিত উপহার দেয়। পরবর্তীতে এই গ্রন্থটি অনেক শিরোনামে অনুদিত হয়, যেমন :

- পুনঃপ্রবর্তন ও ভারসাম্য স্থাপন
- পক্ষান্তরিতকরণ ও সহজীকরণ
- পক্ষান্তর ও হ্রাসকরণ
- সমীকরণের বিজ্ঞান

বীজগণিতে তাঁর উৎকর্ষ এবং এতে তার ব্যাপক অবদানের ফলে তিনি বিজ্ঞানের বহু ঐতিহাসিক কর্তৃক বীজগণিতের প্রতিষ্ঠাতা জনক হিসেবে পরিগণিত হন।

এই অতুলনীয় গ্রন্থ চতুর্মাত্রিক সমীকরণের সমাধানকে শ্রেণিবদ্ধ করে এবং চতুর্ভুজ পূর্ণকরণে জ্যামিতিক পদ্ধতি প্রদান করে। কোনো প্রতীক ব্যবহৃত হয় না এবং কোনো নেতিবাচক বা শূন্য সহগকে অনুমোদন করা হয়নি।

www.pathagar.com

আল-খাওয়ারিযমী হিন্দু-আরবি সংখ্যাসূচকও রচনা করেন। আরবি মূলগ্রন্থ হারিয়ে গেছে, কিন্তু একটি ল্যাটিন অনুবাদ, অ্যালগোরিত্মি ডি নিউমেরো ইনডোরাম, ইংরেজি ভাষায় হিন্দু হিসাব নিকাশ শিল্পে আল-খাওয়ারিযমী-শিরোনামে লিখিত পুস্তকে তাঁর নাম থেকে আলগোরিদম শব্দটির উদ্ভব ঘটে। আমরা অ্যালজাবরা ও আলগোরিদম শব্দ দুটির জন্য তার নিকট ঋণী।

বীজগণিত বিষয়ক তার কাজে, আল-খাওয়ারিযমী দ্বিতীয় পর্যায়ের সমীকরণের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি ভূমির পরিমাপ সম্পর্কেও আলোচনা করেন, যেখানে তার বইয়ের একটি অংশ উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কিছু বাস্তব বিষয়ে নিবেদিত।

তিনি, অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে দ্বিতীয় পর্যায়ের সমীকরণের ছ'টি বিষয় চিহ্নিত করেন। সেগুলো নিম্নরূপ :[১৬০]

- স্কয়ার বর্গমূলের সমান : $ax^2 = bx$
- স্কয়ার সংখ্যার সমান : $ax^2 = c$
- বর্গমূল সংখ্যার সমান : $ax = c$
- স্কয়ার ও বর্গমূল সংখ্যার সমান : $ax^2 + bx = c$
- স্কয়ার ও সংখ্যা বর্গমূলের সমান : $ax^2 + c = bx$
- বর্গমূল ও সংখ্যা স্কয়ারের সমান : $ax^2 = bx + c$

আবু বকর আল-কারখী বা আল-কারাজী (৪২০ হিজরি/ ১০২৯ খ্রি.)

তার আগ্রহের ক্ষেত্র ছিল বীজগণিত। আল-কারখী নতুন গাণিতিক ভাবধারা উদ্ভাবনের চেয়ে বীজগণিতীয় সমস্যা সমাধানে তার মেধার জন্য বেশি পরিচিত ছিলেন[১৬১]। সৃজনশীল চিন্তার দৃষ্টিতে তিনি সৃজনশীল চিন্তাবিদের চেয়ে বেশি ছিলেন সমস্যা সমাধানকারী।

---

[১৬০] Islam and Evolution of Science. পৃষ্ঠা ২৭-২৮।

[১৬১] Omar Farukh. পৃষ্ঠা ১৩৬।

www.pathagar.com

আল-কারখী যা অর্জন করেন তাহল প্রথমে একপদী সংখ্যা যেমন $x, x^2, x^3 \ldots$ এবং $\frac{1}{x}, 1/x^2, 1/x^3, \ldots$ এর সংজ্ঞা প্রদান করা এবং এদের যেকোনো দুটির ফলাফলের বিধান দেওয়া। সুতরাং এখানে তিনি যা অর্জন করেন তা ছিল এসব পরিভাষার ফলাফলের জ্যামিতির কোনো সূত্র ছাড়াই সংজ্ঞা প্রদান। প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রায় সূত্রটিই প্রদান করেন $x^n x^m = x^{m+n}$ n ও m এর সকল পূর্ণসংখ্যার জন্য আল-কারখী কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য ফলাফলের মধ্যে রয়েছে n এর প্রথম স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল, n এর প্রথম স্বাভাবিক সংখ্যার স্কয়ার এবং এসবের কিউবসমূহ। তিনি প্রমাণ করেন যে, প্রথম n স্বাভাবিক সংখ্যার যোগফল হচ্ছে, $n(\frac{1}{2}+\frac{n}{2})$।

আল-কারখী দেখান যে $(1+2+3+\ldots+10)^2$ $1^3+2^3+3^3+\ldots+10^3$। তিনি এটা করতে প্রথমে দেখান যে $(1+2+3+\ldots\ldots+10)^2 = (1+2+3+\ldots+9)^2+10^2$। তিনি এখন একই বিধি ব্যবহার করতে পারতেন $(1+2+3+\ldots+9)^2$, তারপর $(1+2+3+\ldots+8)^2$ ইত্যাদির ওপর $(1+2+\ldots\ldots+10)^2 = (1+2+3+\ldots+8)^2 + 9^3+10^3 = (1+2+3+\ldots+7)^2+8^3+9^3+10^3 = 1^3+2^3+3^3+\ldots+10^3$ পাওয়ার জন্য।

এতে প্রমাণিত হয় যে, আল-কারখী তার সাধারণ সূত্র তৈরিতে আরোহ পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন।

আল-বিরূনী (৯৭৩-১০৫০ খ্রি.)

আবুল-রাইহান মুহাম্মদ বিন আহমদ আল-বিরূনী আল-খাওয়ারাযমী ৩৬২ হিজরির ৩ যুলহিজ্জা/৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর খাওয়ারাযাম- এ জন্মগ্রহণ করেন। কুড়িটি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচনাবলী ১৪৬ টি শিরোনাম ছাড়িয়ে যায়। এর মধ্যে ছিল জ্যোতির্বিদ্যা হতে গণিত, গাণিতিক ভূগোল, কালনিরূপণবিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা, ঔষধবিজ্ঞান, খনিবিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্ম এবং দর্শন।

তার অবদান রয়েছে গণিত এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে। তার তাহদীদ (শহরের সমশ্রেণিভুক্তদের মধ্যে সীমানা নির্দেশ করণ) লিখিত হয়েছিল যাতে করে কিবলা নির্ণয় করা যায়। গ্যালিলিও'র ছ'শ বছর পর আল-বিরূনী পৃথিবী এর নিজ অক্ষের ওপর আবর্তন করছে- এই তত্ত্ব আলোচনা করেন। এস্ট্রোল্যাব ব্যবহার করে এবং সমুদ্র বা সমতলের নিকট পর্বতের উপস্থিতিতে, তিনি একটি অতি জটিল ভূগোলের আকার পরিমাপক সমীকরণ ব্যবহার করে পৃথিবীর প্রদক্ষিণকাল গণনা করেন।

www.pathagar.com

গণিত ব্যবহার করে তিনি পৃথিবীর যেকোনো স্থান হতে কিবলার অবস্থান নির্ণয়েও সমর্থ হন।

তার সম্পাদিত বৃহৎ কার্যাবলীকে নিম্নরূপে শ্রেণিবদ্ধ করা যায় :

ক. আঠারটির মতো রচনা যেগুলোকে প্রকৃতিগত দিক দিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত করা যায়।

খ. পরবর্তী শ্রেণিতে রয়েছে পনেরটি বই-এর সমাহার কমপক্ষে ৬৩৫ টি মোড়ক বিশিষ্ট যা বিভিন্ন শহরের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ এবং এর একটি হতে অন্যটির পথনির্দেশিকা।

গ. আটটি গ্রন্থ, ২৩০ টি মোড়কের, যেগুলো গাণিতিক (হিসাব) শ্রেণিভুক্ত।

ঘ. যন্ত্রপাতি ও এসবের ব্যবহার শ্রেণিভুক্ত পাঁচটি পুস্তক যাতে রয়েছে ১৪০ টি মোড়ক।

ঙ. এমন গ্রন্থ যেগুলোকে সাধারণভাবে গাণিতিক ও আবহাওয়া সংক্রান্ত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে পাঁচটি গ্রন্থ কমপক্ষে ১৮০ টি ফোলিওর মধ্যে।

চ. একমাত্র জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত সাতটি প্রবন্ধ।

ছ. ফার্সী হতে অনুদিত সাতটি গ্রন্থ।

জ. মতবাদ (আকাইদ) সংক্রান্ত রচনা।

সাধারণভাবে, গণিতে মুসলিম অবদান এই ক্ষেত্রের বিভিন্ন দিককে স্পর্শ করেছে, যার মধ্যে আমরা নিম্নেরগুলো উল্লেখ করতে পারি

- গাণিতিক ও অধিবিদ্যা উভয় বিষয়েই সংখ্যাতত্ত্বের উন্নয়ন
- সংখ্যা সংক্রান্ত ধারণার সাধারণকরণ যা ইসলামি সভ্যতার পূর্বে অজানা ছিল
- দশমাংশ সংক্রান্ত বিভাজনের বিষয় নিয়ে কাজ
- বীজগণিত বিষয়ক বিজ্ঞানের উন্নয়ন ও ব্যবস্থিতকরণ
- ত্রিকোণমিতির উন্নয়ন[১৬২]

[১৬২] সাইয়েদ হুসেইন নাসের, Science & Civilization in Islam, পৃষ্ঠা ১৫২।

www.pathagar.com

জ্যোতির্বিদ্যা

জ্যোতির্বিদ্যার সাথে মুসলিমদের সম্পর্ক মজবুত। কারণ ইসলামে ইবাদত ও আমলের ক্ষেত্রে জ্যোতির্বিদ্যার বিশেষ জ্ঞান প্রয়োজন। প্রত্যেক মুসলিমের দৈনন্দিন জীবনে চাঁদ ও সূর্যের আবর্তন প্রকৃতই গুরুত্বপূর্ণ। মুসলিমের সালাত ও সিয়ামের সময় গণনায় সূর্য ও চাঁদ। যেহেতু মুসলিমগণ সালাতের সময় মক্কার দিকে মুখ করে তাই কিবলার সঠিক দিক নির্ণয়ে জ্যোতির্বিদ্যাও প্রয়োজন।

এটি প্রণিধানযোগ্য যে কুরআন'র জান্নাতের বর্ণনা এবং চাঁদ ও সূর্যের বর্ণনাকে মুসলিমদের জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষায় উৎসাহ সৃষ্টির উপাদান বিবেচনা করা যায়। মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণই প্রথম মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। যেমন চেঙ্গিজ খানের পুত্র হালাকু কর্তৃক পারস্যের মুগারায় নির্মিত মানমন্দির অন্যতম।

কৌণিক উচ্চতা মাপনিও অ্যাসট্রোল্যাবের যন্ত্র আবিষ্কার এর হাত ধরে সম্পন্ন হয়েছিল। এর সাথে যুক্ত করে মুসলিমগণ অতি উত্তম সৌর পঞ্জিকা নিয়ে আবির্ভূত হন; নাম জিলালি, যা জুলিয়ানের পঞ্জিকার চেয়ে উত্তম, এটি বিন্যস্ত করা হয়েছিল উমর খৈয়ামের তত্ত্বাবধানে।

অতি গুরুত্বপূর্ণ কিছু জ্যোতির্বিদের মধ্যে রয়েছেন আল-বাত্তানী, আল-সূফী, আল-বিরূনী ও ইবনে ইউনুস। আল-বাত্তানী (মৃত্যু : ৯২৯ খ্রি.) ইউরোপে আল-বাতেগনি নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি ছিলেন সাবিয়ান সারণী (আল-যিজ. আল-সাবি)-এর গ্রন্থকার। মুসলিম ও খ্রিষ্টান উভয় সম্প্রদায়েই রয়েছে তার একই মাপের বিশাল প্রভাব। সূর্য ও চন্দ্রের কক্ষপথ সংক্রান্ত তার উন্নত সারণী তার এ আবিষ্কারে সহায়তা করে যে, পলেমী কর্তৃক ধারণকৃত সূর্যের উৎকেন্দ্র পরিবর্তিত হচ্ছে। আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যায় এটির অর্থ, পৃথিবী পরিবর্তনশীল উপবৃত্তাকারে ঘূর্ণায়মান। তিনি চাঁদের সময়নির্ঘণ্ট, গ্রহণের পূর্বাভাস এবং গ্রহ-নক্ষত্রাদির অবস্থাকে পরিবর্তনের প্রপঞ্চ, যা আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে আপেক্ষিকতার এবং মহাশূন্য যুগের কাছাকাছি- এসব নিয়েও কাজ করেন।

আব্দ আল-রাহমান আল-সূফী (৯০৩-৯৮৬) বার্ষিক পরিক্রমণ পথের তীর্যক গতি এবং সূর্যের গতি (বা সৌরবর্ষের সীমা)-এর ওপর কয়েকটি পর্যবেক্ষণ করেন। তিনি তারকাদের বর্ণনা, তাদের অবস্থান, তাদের (ঔজ্জ্বল্যের) বিশালতা ও তাদের রঙ বিষয়ক পর্যবেক্ষণের জন্য বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। আল-সূফী অ্যাসট্রোল্যাব-এর ওপরেও লেখেন, এর অসংখ্য অতিরিক্ত ব্যবহার দেখতে পেয়ে।

www.pathagar.com

পদার্থবিদ্যা

মুসলিম মানস হচ্ছে উৎকর্ষমণ্ডিত পরীক্ষামূলক মানস। এটিই ইসলামি পরিবেশে পদার্থবিদ্যাগত জ্ঞানের উৎকর্ষসাধনে সহায়তা করে। ইবনে সিনাসহ অনেক মুসলিম পদার্থবিদ অ্যারিস্টটলীয় পদার্থবিদ্যাকে ছাপিয়ে যান যিনি পরিবর্তনশীল পদার্থসমূহকে পদার্থবিদ্যার বিষয়বস্তু হিসেবে চিহ্নিত করেন[১৬৩]। প্রাথমিক যুগের মুসলিম দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্ববিদগণের ওপর অ্যারিস্টটলের প্রভাব তাদেরকে প্রকৃতি অধ্যয়নে পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি অবলম্বনে অনাগ্রহী করে রাখে। তবে, পরবর্তী প্রজন্মের পদার্থবিদগণ অবরোহ পদ্ধতির দুর্বলতা এবং এর অন্তর্নিহিত সীমাবদ্ধতা উপলব্ধি করেন প্রাকৃতিক প্রপঞ্চসমূহ বোঝার ক্ষেত্রে। এদের মধ্যে ছিলেন আলোকবিজ্ঞানের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ছাত্র। যেমন- কুত্‌ব আল-দীন আল-শিরাযী এবং সকল মুসলিম পদার্থবিদের মধ্যে প্রসিদ্ধতম, আল হাযেন, আল-বিরূনীর মতো যিনি খনিজ পদার্থের সুনির্দিষ্ট ওজন পরিমাপ করেন এবং আবু আল-ফাতহ্ আবদ আল-রাহমান আল-খাযিনী যিনি ঘনত্ব ও ভরের পরিমাপ নিয়ে গবেষণা করেন[১৬৪]।

মাধ্যাকর্ষণজনিত প্রপঞ্চসমূহ

এটা সর্বজনবিদিত যে, ইউরোপীয় বিজ্ঞানী আইজাক নিউটন ১৬৮৬ সালে সর্বজনীন মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব আবিষ্কার করেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ভাবধারা সংক্রান্ত ইতিহাস ভিন্ন গল্পের অবতারণা করে। রোমাঞ্চকর আবহসহ আপেল পতিত হওয়ার উত্তেজনাকর কাহিনী মাধ্যাকর্ষণজনিত উপাদান এবং দেহের গতিতে এর প্রভাব আবিষ্কারে মুসলিমদের অতীত কীর্তির ঐতিহাসিক সত্যতার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারে না। এটা সুবিদিত যে নিউটনের সময়কালের ইউরোপ আরবিয় ভাষ্যকারদের মাধ্যমে আরব ও গ্রিক গ্রন্থাদির ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল ছিল। যদিও নিউটনের ওপর ইসলামি বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ প্রভাবের প্রমাণ আমাদের কাছে নেই, এটা বলাই নিরাপদ যে নিউটন কর্তৃক সূত্রবদ্ধ হওয়ার পূর্বে সতের শতকের শেষার্ধে মুসলিমদের নিকট মাধ্যাকর্ষণ পরিচিত ছিল[১৬৫]।

---

[১৬৩] প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ১২৬, আরো দেখুন Omar Farrukh, পৃষ্ঠা ২১৭।

[১৬৪] সাইয়েদ হুসেইন নাসের, প্রাগুক্ত পৃ. ১২৭।

[১৬৫] আহমদ ফুয়াদ বাশা, Al-'Ulum al Kawniyyah fi al-Turath al-Islami, Majma al-Buhuth al-Islamiyyah Fi al-Azhar পৃ. ৮৮।

www.pathagar.com

অন্যতম মুসলিম পদার্থবিদ ইবনে মালকা আল-বাগদাদী, যিনি মাধ্যাকর্ষণের ওপর সবেগে অভিক্ষিপ্ত বস্তুর গতি পরীক্ষা করেন এবং শক্তি দ্বারা সৃষ্ট গতি ও মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে সৃষ্ট গতির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, কোনো বাহ্যিক বাধাদানকারী অথবা সংঘর্ষমূলক কোনো শক্তির অনুপস্থিতিতে অবাধে পতিত বস্তুর বেগ এদের ভরের ওপর নির্ভরশীল নয়[১৬৬]।

ফখর আল-দীন আল-রাযীও মাধ্যাকর্ষণকে সার্বজনীন আইন বলে অভিহিত করেছেন যার দ্বারা সমস্ত বস্তুই সীমাবদ্ধ। তিনি এই অভিমত পোষণ করতেন যে, দূরবর্তী বস্তুসমূহের মধ্যেও একপ্রকার আকর্ষণ থাকবেই।

তাঁর গ্রন্থ ভারসাম্য ও প্রজ্ঞা সংক্রান্ত পুস্তক-এ আরো এগিয়ে তিনি এই অভিমত পোষণ করেন যে, সকল বস্তুই পৃথিবীর কেন্দ্রে আকর্ষিত। এসব অবদান পরিষ্কারভাবে ইঙ্গিত দান করে যে নিউটনের আপেল পতিত হওয়ার পূর্বেই মুসলিমদের নিকট মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব পরিচিত ছিল[১৬৭]।

আলোকবিদ্যা (ইলম আল-মানাযির)

আল-হাযেন বা ইবনে আল-হাইসাম হচ্ছেন আধুনিক আলোকবিদ্যার প্রতিষ্ঠাতা। তার আবিষ্কারের মাধ্যমে তিনি আলোক অধ্যয়নে এক নতুন যুগের উন্মেষ ঘটান। তাঁর পূর্বে সাধারণ ধারণা এই ছিল যে, দেখার কাজটি হচ্ছে রশ্মির প্রতিফল যা চোখ হতে দৃশ্য বস্তুর দিকে প্রতিফলিত হয়। সাধারণভাবে এই গতানুগতিক ধারণা গ্রিকদের বলে মনে করা হয়, কিন্তু পেণ্টটো ও অ্যারিস্টটল ভিন্ন পন্থা গ্রহণ করেন। যদিও মনে হয় যে ইবনে আল-হাইসামের মতের চেয়ে, অ্যারিস্টটল একটি ভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেন এটা বলা নিরাপদ যে পরবর্তীজন যে পরীক্ষামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করেন, তা কেবল আলোকবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই নয় বরং প্রাকৃতিক জ্ঞানের জগতেও সাধারণভাবে এক নতুন যুগের সূচনা করে।

আল-হাযেনই প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রমাণ করেন যে, বস্তুর নিকট হতে আমাদের সামনে আগত আলোর রশ্মি দ্বারাই আমরা দেখতে পাই। মনে হয় তিনি একটি সৃজনশীল কৌশল অবলম্বন করেছিলেন যা সম্প্রতি উৎপাদনশীল প্রমাণিত হয়েছে।

---

[১৬৬] প্রাগুক্ত পৃ. ৮৭।

[১৬৭] প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ৮৬।

www.pathagar.com

তাহলো, যখন আল-হাযেন দর্শন কর্মের আপাত স্বাভাবিক নির্দেশিকার বিপরীত করতে চাইলেন : প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা দেখায় যখন আমরা আমাদের চোখ বন্ধ করি আমাদের সামনের বস্তু দেখা থেমে যায়। এ অবস্থায় দেখার প্রারম্ভ বিন্দু হিসেবে চোখ স-প্রমাণিত বলে বিবেচিত। এই কারণেই ইবনে সীনা ও আল-বিরূণী ব্যতীত আল-হাযেনের অধিকাংশ উত্তরাধিকারীই তার সাথে একমত হননি[১৬৮]।

আল-হাযেন কেন এটা প্রমাণের ঝুঁকি নিলেন যে, অবস্থা অন্যরকম? উত্তর সরল : তিনি ছিলেন সৃজনশীল ব্যক্তি। তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন কিভাবে আমাদের স্বাভাবিক চিন্তার ধরন ছড়াতে হয় তা জানতে, যাতে দিক পরিবর্তন করা যায় এবং ভিন্ন পথ বের করা যায়[১৬৯]। তিনি আপাত প্রতিফলিত দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন হতে নিজেকে বিরত রাখেননি, কারণ কেবল সন্দেহ উত্থাপন করাই একজন সৃজনশীল চিন্তাবিদের কাজ নয়। বিকল্প যোগান দেওয়াই হচ্ছে পৌঁছানোর প্রধান লক্ষ্য। আল-হাযেন এভাবেই করেছেন যখন তিনি গতানুগতিক প্যাটার্নকে ভুল প্রমাণিত করেছেন, তিনি তার নিজের মতো করে কাজ করেছেন। আলোকবিদ্যার নতুন তত্ত্ব দিয়েছেন যা এখন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করছে।

গবেষকের অবস্থান হতে, আল-হাযেন চোখের কাঠামো, দৃষ্টিবিভ্রম, ছায়া ও রঙ নিয়ে কাজ করেন। তিনি পরীক্ষণ কৌশলে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেন।

তিনি গোলকার ও অধিবৃত্তাকার আয়না, গোলকাকৃতির বিচ্ছুরণ ও ডাই অপটিকস বিষয়ে গবেষণা করেন... তিনি লেন্সের বিবর্ধক শক্তি বর্ণনা করেন এবং বায়ুমণ্ডলীয় প্রতিসরণ অধ্যয়ন করেন। তিনি বলেন যে, গোধূলি/অস্তরাগ কেবল অদৃশ্য হয় বা শুরু হয় যখন সূর্য দিগন্তরেখার ১৯° নিম্নে থাকে ...। তিনি চোখের দৃষ্টির একটি উত্তম বর্ণনা দেন এবং দিগন্তের কাছাকাছি স্থানে সূর্য ও চন্দ্রের আকৃতিতে দৃশ্যত বৃদ্ধি সম্বন্ধে সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি 'গুপ্ত ক্যামেরা' সম্পর্কে প্রথম গাণিতিক বর্ণনা দেন[১৭০]।

---

[১৬৮] Islam and Evolution of Science, পৃষ্ঠা ৪৮।

[১৬৯] বিস্তারিত জানতে সৃজনশীল চিন্তা কৌশলের ক্রস প্যাটার্নিং সম্বন্ধে দেখুন : এডওয়ার্ড ডি বোনো।

[১৭০] Islam and Evolution of Science. পৃষ্ঠা ৪৯।

www.pathagar.com

ইবনে আল-হাইসামের পদ্ধতি

প্রকৃতপক্ষে, আমাদের নিকট মানব জ্ঞানে মুসলিম অবদান গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কিভাবে তারা এটা করেছেন। আমার মতে পদ্ধতির প্রশ্ন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞানের বিষয়ের চেয়ে। ইসলাম বস্তুগত দিকে মুসলিমদের মনকে চালিত করেছে। এভাবে মধ্যযুগের ইসলামি পরিমণ্ডলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন প্রকার আবিষ্কারে পরীক্ষামূলক পদ্ধতির উৎকর্ষ সাধিত হয়। ইবনে আল-হাইসাম ঐসব মুসলিম পণ্ডিতদের অন্যতম যিনি এই নতুন বৈজ্ঞানিক বিশ্বদর্শন হতে মানবিয় জ্ঞানে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার সুবিধা পেয়েছিলেন।

ইবনে আল-হাইসাম জ্ঞান অন্বেষণে অসাধারণভাবে তাঁর ভ্রমণের বর্ণনা দেন। তার বক্তৃতা জ্ঞান ও আবেগে পরিপূর্ণ। তিনি তার সময়ের বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা পুঞ্জীভূত করেই সময় কাঁটান বরং যে পদ্ধতি তাকে প্রয়োগ করতে হয়েছিল সেটির ব্যাপারে তিনি সজাগও ছিলেন। তিনি বলেন : আমার শৈশব হতেই আমি লোকদের বিভিন্ন বিশ্বাস ও প্রত্যেক গোষ্ঠীর নিজ নিজ মতামতের প্রতি আকর্ষণ বিষয়ে সাবধান ছিলাম। এসব সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে আমি ছিলাম সন্দেহপ্রবণ যে, সত্য একটি এবং এর দিকে যেতে বিভিন্ন পথের উদ্ভব ঘটেছে। আমি যখন বুদ্ধিবৃত্তিক বিষয়গুলো বোঝতে সমর্থ হলাম। তখন আমি এর উৎস হতে জ্ঞান অন্বেষণে উৎসর্গিত হলাম। আমি আমার আকাঙ্ক্ষা ও উৎসর্গকে এটি বোঝার জন্য চালিত করলাম যার দ্বারা সন্দেহপূর্ণতার পূর্বেই দূরকল্পনার বিভ্রান্তি দূর করা যাবে। আমি আমার ইচ্ছাকে ঐ ধারণার দিকে ফেরালাম যা আমাকে আল্লাহ তায়ালার নিকটতর করবে...। আমার প্রাথমিক দিনগুলো হতেই আমি ভাবছিলাম কিভাবে আমি প্রস্তুতি নিতে পারি, সাধারণ লোকদের অবজ্ঞা করে জ্ঞান ও সত্যকে নিয়ে তাদের দিকে আমার মনোযোগ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য? আপনি বলতে পারেন যে, এটি ঘটেছিল একটি আশ্চর্যজনক ঘটনার মাধ্যমে কিংবা ঐশী প্রেরণার মাধ্যমে কিংবা এমনকি পাগলামী হতে বা আপনি যেভাবে মনে করেন আমার ব্যাপারে আরোপ করতে পারেন[১৭১]। এই মূল পাঠ হতে আমরা ইবনে আল-হাইসামের ভাবধারার কিছু অন্তর্নিহিত পদ্ধতিগত নীতি তুলে ধরতে পারি। সেগুলো নিম্নরূপ :

---

[১৭১] Omar Farrukh, পৃষ্ঠা ৩৬৬-৩৬৭।

www.pathagar.com

১. তিনি অন্যের মতামত ও ধ্যানধারণা অনুসরণ করার বিরোধী ছিলেন। তার মতে অন্ধভাবে অন্যের বিশ্বাসের অনুসরণ করা সত্যকে জানার পথে অন্তরায়।

২. সত্যে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ একটি উপায়। তিনি তার চারপাশের ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে সংশয়প্রবণ। যদিও তিনি যথেষ্ট নিশ্চিত ছিলেন যে সত্য বিদ্যমান। এর অর্থ এই যে তিনি নেতিবাচক সংশয়বাদের বিরোধী ছিলেন। যা উদ্দেশ্যমূলক সত্যকে ধ্বংসের দিকে চালিত করে। এখানে এটা বলা নিরাপদ যে রেনে দেকার্তে নয় ইবনে আল-হাইসাম ছিলেন প্রথম যিনি সত্যে উপনীত হওয়ার জন্য উপকরণ হিসেবে সন্দেহকে ব্যবহার করেছেন।

৩. জ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভ এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করা।

৪. কাউকে সৃজনশীল করার ক্ষেত্রে সহায়তার কিছু সুপ্ত পথ রয়েছে যেমন : ১. দৈব সংঘটন ২. ঐশ্বরিক অনুপ্রেরণা ৩. পাগলামি[১৭২]

তার পরীক্ষামূলক পদ্ধতির ভিত্তি ছিল :

ক. পর্যবেক্ষণ খ. শ্রেণিকরণ গ. আরোহ ঘ. বিধান প্রণয়ন

---

১৭২ পাগলামিতে এখানে এর আক্ষরিক অর্থে নেওয়া যাবে না। এটা ব্যাপকভাবে মনে করা হয় যে, সৃজনশীলতায় পাগলামি একটি মূল ভূমিকা পালন করতে পারে। আমি এখানে ঐ আরবি বাগধারা ব্যবহার করছি না : পাগলের মুখ হতে জ্ঞান নেওয়া যায়। আমরা রেফারেন্স পাগলামির ঐ মজার ভাবের দিকে যা Edward De Bono'র সুপারিশকৃত পাগলামির পার্শ্বগত চিন্তার উপাদান হিসেবে তার অনেক গ্রন্থে এসেছে। ডি বোনো সৃজনশীল ভাব অর্জনে চিন্তার প্রতিষ্ঠিত প্যাটার্নের বিরুদ্ধে যাওয়ার গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন। তার নিকট পাগলামি/উন্মাদনা অন্যতম প্রপঞ্চ যা ক্রস প্যাটার্ন'র প্রতিফলন ঘটায়। তবে, কেউই তার মনের পূর্ণতা উন্মাদনার জন্য উৎসর্গ করতে প্রস্তুত থাকবে না, এমনকি ডি বোনোও, ইবনে আল-হায়সাম নিজেও। সুতরাং, উন্মাদনা লাভ এবং তা সৃজনশীলতায় উপনীত হওয়ার কৌশলের অন্তর্ভুক্ত করতে ডি বোনো আমাদের সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য পাগল সাজার কথা বলেন। একজন সাময়িক পাগল হিসেবে এটা আপনাকে বক্র ভাবধারা উপনীত হয়ে বস্তুর বাস্তবতা ক্ষুন্ন করতে সহায়ক হবে। এই বক্র ভাবকে বলে : উত্তেজিতকরণ। যখন আপনি উত্তেজিতকরণ গঠন করবেন, তখন আর পাগল থাকবেন না এবং কাজ চালিয়ে যাবেন, যৌক্তিকভাবে এই সময়, আপনার উত্তেজিতকরণ সুন্দর ভাব উৎপাদন করবে, সমাধান আনবে বা বিকল্প মিলবে। উত্তেজিতকরণ বিশ্লেষণের যৌক্তিক পদ্ধতিকে আন্দোলন বলে। বিশদ আরো জানতে দেখুন : Edward De Bono, Serious Creativity, হারপার কলিন্স বিজনেস। ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ১৪৫-১৬৩।

www.pathagar.com

৫. লক্ষ্য প্রণোদিত হওয়া পক্ষপাতদুষ্ট হওয়া নয় (তার মতে পক্ষপাত জ্ঞান উপলব্ধিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে)

৬. কার্যকারণ সম্বন্ধীকরণ।

চিকিৎসাবিদ্যা

ইসলামি সভ্যতায় চিকিৎসাবিদ্যার সন্ধান পাওয়া যায় নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমল থেকেই। প্রাচীন আরবিয় সূত্রসমূহে উল্লেখ পাওয়া যায় আরবিয় আল-হারিস ইবনে কেলাদাহ'র (মৃত্যু : ৬৩৪ খ্রি.) কথা যিনি আরব উপদ্বীপ হতে পারস্য পর্যন্ত চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য ভ্রমণ করেন। জুন্দিসাবুর যান, যেখানে অতি পরিচিত বীমারিস্তান (হাসপাতাল) ছিল। জুন্দিসাবুরে পড়াশোনা শেষ করে আল-হারিস বাড়ি ফিরে আসেন তার জ্ঞান পিপাসুদের শিক্ষাদানের জন্য।

ইবনে গোগল, হিজরি চতুর্থ শতক (খ্রিস্টিয় ১০ম শতাব্দী)-এর সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক বলেন যে, আল-হারিস পারস্য ও ইয়েমেনে চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করেন এবং নবি সা. এর সময় জীবিত ছিলেন।

মু'আবিয়া (৬৬০-৬৮০ খ্রি.)-এর শাসনামলে চিকিৎসকদের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বেড়ে যায়। ইনি ছিলেন উমাইয়া রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা। মু'আবিয়া তার স্বাস্থ্যের পরিচর্যার জন্য জুন্দিসাবুর হতে সর্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসকদের নিয়ে আসার জন্য তার লোকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। বিশেষত যখন তিনি এই আশংকা করেন যে, শত্রুরা তার খাবারে বিষ মিশাতে পারে।

উমাইয়া রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতার সাথে সাথেই প্রকৃতপক্ষে মুসলিম চিকিৎসাবিদ্যার প্রকৃত উন্নয়ন শুরু হয়। খলীফা মারওয়ান ইবনে আল-হাকাম (মৃত্যু : ৬৮৫ খ্রি.) মুখ্য ভূমিকা পালন করেন যখন তিনি পারস্যের চিকিৎসক মাসারজাওয়াইহ্ কে আলেকজান্দ্রিয়ার পাদ্রী আহরুন-এর চিকিৎসা এবং সাইরিয় ভাষা হতে আরবিতে বিশ্বকোষ অনুবাদের নির্দেশ দেন। মাসারজাওয়াইহ্ কর্তৃক আহরুন-এর বই-এর অনুবাদকে বিদেশি ভাষা হতে আরবি ভাষায় চিকিৎসাবিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থের প্রথম অনুবাদ বলে গণ্য করা হয়।

তবে, বিশাল উন্নয়ন ঘটে কেবল আব্বাসীয় রাজত্বকালে। তারা চিকিৎসাবিদ্যার উন্নয়নে একটি খুব শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করেন।

www.pathagar.com

আব্বাসীয়গণ বিজ্ঞানীদেরকে উৎসাহিত করেন এবং বাইত আল-হিকমা (জ্ঞানের প্রাসাদ) প্রতিষ্ঠা করে ইসলামি বিশ্বে অবিমিশ্র বৈজ্ঞানিক আন্দোলন শুরু করেন।

দশম শতাব্দীকালে চিকিৎসাবিদ্যাকে পেশা হিসেবে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে আল-মুক্‌তাদির একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। যারা চিকিৎসা করতে চান তিনি তাদের পরীক্ষা নেওয়ার এবং উত্তীর্ণ হলে ইজাযাহ (লাইসেন্স) দেওয়ার নির্দেশ দেন। চিকিৎসা পেশা হিসেবে সংগঠিত হলে তা বিমারীস্তান বা হাসপাতাল বিকাশে সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছিয়ে যেখানে ডাক্তারগণ লোকদের চিকিৎসা প্রদান করতেন।

যেসব বড় বিজ্ঞানী চিকিৎসাবিদ্যার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন আল-রাযী (রাজেস ৮৫০-৯২০ খ্রি.) ইবনে সীনা (আবিসিনা ৯৮০-১০৩৭ খ্রি.), আল-যাহরাবী (আবুল কাসিম ১০১৩) এবং ইবনে আল-নাফীস। চিকিৎসাবিদ্যার উন্নয়নে মুসলিমদের অবদান বহু শতাব্দী যাবত ইউরোপে মুসলিম বিজ্ঞানীদের অভূতপূর্ব প্রভাবের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, ইউরোপে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়নে আল-রাযী'র গ্রন্থের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দেখা যায়। কিতাব আল-আসরার প্রথম ল্যাটিন ভাষায় ক্রেমনার জেরারর্ড (মৃত্যু : ১১৮৭) কর্তৃক অনুদিত হয়েছিল, যেসময় কিতাব আল-তিব্ব্ আল-মানসূরী ল্যাটিন অনুবাদে মিলানে প্রকাশিত হয় ১৪৮০ সালে। আল-হাভি'র গ্রন্থ অনুদিত হয়েছিল ১২৭৯ সালে এবং বহুবার ল্যাটিন ভাষায় তা পুনর্মুদ্রিত হয়। এটি একটি বিশদ গ্রন্থ হওয়ায় ইউরোপে এর প্রভূত প্রভাব ছিল। গ্রিক, সিরীয়, ভারতীয়, পারসিক এবং আরব গ্রন্থকারদের মতামত সহ এই গ্রন্থটি ঐ সময় পর্যন্ত ছিল সকল চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিশ্বকোষ। এর সাথে যুক্ত ছিল তার বস্তুনিষ্ট পর্যবেক্ষণ ও সিদ্ধান্ত।

ইসলামি চিকিৎসাবিদ্যার শাস্ত্রীয় ক্ষেত্রে ছিল ব্যাপক পরিধিগত বিস্তার। এর মধ্যে আমরা নিম্নলিখিতগুলো উল্লেখ করতে পারি।

১. শারীরবিদ্যা : বা 'ইল্‌ম আল-'উমূর আল-তিব্বিইয়্যাহ। এতে জীবন্ত প্রাণি হিসেবে মানব শরীরের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

২. অঙ্গ ব্যবচ্ছেদবিদ্যা : 'ইল্‌ম আল-তাশরীহ্। এটি ইসলামি রীতি অনুযায়ী আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এই বাস্তবতায় যে ইসলামি ব্যবচ্ছেদবিদ্যা ছিল অধিকতর ব্যাপক বা বিশ্বজনীন এবং এর সম্পর্ক ছিল শারীরবিদ্যা ও ধর্মতত্ত্বের সাথে।

www.pathagar.com

৩. রোগবিদ্যা : ইল্‌ম আহ্‌ওয়াল আল-বাদান, আক্ষরিকভাবে শরীরের অবস্থা সংক্রান্ত বিজ্ঞান। মুসলিম চিকিৎসকদের মতে তিনটি অবস্থা রয়েছে : ১) স্বাস্থ্যের অবস্থা ২) রোগের অবস্থা ৩) না স্বাস্থ্য না রোগের অবস্থা।

৪. নিদানতত্ত্ব : 'ইলম্ আল হচ্ছে রোগের পেছনে বিদ্যমান কারণ সংক্রান্ত বিদ্যা।

৫. 'ইলম আল-দালাইল রোগের উপসর্গ/লক্ষণ নিয়ে আলোচনা করে। লক্ষণ সমূহের যে প্রধান লক্ষণটি অধিকতর মনোযোগ আকষর্ণ করেছে তা হলো রক্তস্পন্দন। ইবনে সীনার মতে, রক্তস্পন্দনের দশটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সাধারণত রোগ নির্ণয়ের সময় যেগুলোর প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়। এগুলো হচ্ছে :[১৭৩]

- পরিমাণ
- শক্তি
- নড়াচড়ার স্থিতিকাল
- রক্তনালী দেওয়ালের অবস্থা, নরম অথবা শক্ত
- আয়তন
- বিশ্রামকালের মেয়াদ
- রক্তনালীর কম্পন
- সমতা ও অসমতা
- রক্তস্পন্দনের ভারসাম্য
- ছন্দ

৬. স্বাস্থ্য বা হিফয্ আল-সিহ্‌হা : এটি স্বাস্থ্য রক্ষার উপাদান, প্রক্রিয়া ও কার্যাবলী যেমন- বাতাস, খাদ্য ও পানীয়, শরীরের বিশ্রাম ও চলাচল, আবেগের বিশ্রাম ও গতি, ঘুম ও অন্যান্য বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত।

৭. ভেষজবিদ্যা : ইলম আল-ইলাজ বা আরোগ্যবিদ্যা। এটি চারটি কৌশল দ্বারা প্রয়োগ করা হয় :

---

[১৭৩] এ পর্বে আমি ব্যাপকভাবে ওসমান বাকারের 'তাওহীদ ও বিজ্ঞান' পুস্তকের ওপর নির্ভর করেছি। আরও জানতে হলে দেখুন পৃষ্ঠা ১১২ হতে ১২৩।

www.pathagar.com

- প্রতিরোধক চিকিৎসা বা ইলাজ বি আল-তাদবীর
- খাদ্যগত চিকিৎসা বা 'ইলাজ বি'ল-ঘিদা
- ঔষধ প্রয়োগমূলক চিকিৎসা বা 'ইলাজ বি দাওয়া'
- শল্য চিকিৎসা বা 'ইলাজ বি'ল ইয়াদ

আবু বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন যাকারিয়্যা আল-রাযী (ল্যাটিন ভাষায় রাযেস)

বিজ্ঞানের অনেক ঐতিহাসিকের নিকট তিনি ছিলেন মহত্তম মুসলিম চিকিৎসক। বাগদাদের রাই হাসপাতালে তাকে প্রধান চিকিৎসকের পদে নিয়োগ করা হয়। এটাই তাকে একটি উন্নততর পরিবেশে তার কর্তব্য পালন ও গবেষণায় সহায়তা করে।

আল-রাযী একশ'রও অধিক গ্রন্থ রচনা করেন যার প্রায় সবই ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়।

তার গ্রন্থসমূহের একটিতে কিডনিতে ও মুত্রথলিতে পাওয়া যায় এমন পাথর সম্বন্ধে বর্ণনা রয়েছে, এটি ১৮৯৬ সালে লেইডেন-এ প্রকাশিত হয়। তার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে আল-হাভী, এক প্রকার চিকিৎসা বিষয়ক বিশ্বকোষ। তিনি স্ত্রীরোগবিদ্যা, ধাত্রীবিদ্যা ও চোখের শল্য চিকিৎসা বিষয়ে মূল্যবান অবদান রাখেন[১৭৪]।

রসায়ন

আলকেমী বিজ্ঞানে মুসলিমদের অবদান তাৎপর্যপূর্ণ। এটি প্রধানত দু'জন মহান বিজ্ঞানীর বদৌলতে হয়েছে। তারা হলেন : জাবির এবং রাযী। এ দুজন রসায়ন প্রতিভা রসায়ন সম্বন্ধে বহুবিধ সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেন এবং এর ফলে রসায়ন একটি সত্যিকার বিজ্ঞান হিসেবে রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে।

পাতন, ঊর্ধ্বপাতন, লঘুকরণ, দ্রাবণ এবং কেলাসনের সাধারণ পরীক্ষাগার পদ্ধতি উন্নত করা হয় এবং এসবের সাধারণ উদ্দেশ্য ভালোভাবে বোধগম্য হয়ে ওঠে।

মুসলিম রসায়নবিদদের কাজ মূলত : পরীক্ষা চালাবার ওপর আলোকপাত করে। তত্ত্বনির্মাণ সঠিক ছিল না এবং এটা পরীক্ষাগারের ফলাফল ও গবেষণা সংক্রান্ত পরীক্ষা ব্যাখ্যার লক্ষ্যাভিমুখী ছিল। এটা ছিল তাদের গ্রিক, মিসরীয় ও মেসোপটেমিয় পূর্ববর্তীদের ওপর স্পষ্ট মুসলিম অগ্রগতি।

---

[১৭৪] Islam and Evolution of Science. পৃষ্ঠা ৯৯।

www.pathagar.com

মুসলিম সোনালী যুগে পরিচিত মহত্তম রসায়নবিদ হলেন মুসা জাবির ইবনে হাইয়ান। তিনি আরবিতে লিখিত তার রাজত্বের গ্রন্থ, প্রাচ্য পারদের গ্রন্থ, এবং অন্যান্য পুস্তকের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। রসায়ন তত্ত্বে তার অন্যতম মুখ্য অবদান হচ্ছে ধাতুর গঠন সংক্রান্ত অভিমত। পুনর্জাগরণের সময়ে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে জাবির কর্তৃক সাধিত অগ্রগতি প্রভূত উন্নতির সহায়ক হয়। কারণ এর ফলে সাধারণ কাজ সম্পাদন করা দ্রুততর ও অধিক দক্ষতার সাথে সম্ভব হয়ে ওঠে। এর সাথে, রেনেসাঁকালীন বিজ্ঞানীদের কাজও তার আবিষ্কারের কারণে সরলীকৃত হয়, তাদের জন্য আরো সহজে আবিষ্কার করার সুযোগ বয়ে আনে।

জাবিরের মৃত্যুর পর ইসলামের সামনে একজন উত্তরাধিকারীর আগমন ঘটতে প্রায় এক শতাব্দী লেগে যায়। পারস্যের রসায়নবিদ ও চিকিৎসক আবু বাকর মুহাম্মদ ইবনে যাকারিয়া আল-রাযী (যিনি পাশ্চাত্যে রাযেস নামে পরিচিত) ছিলেন জাবিরের পর শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত। আল-রাযী ৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে রাই নামক কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণমুখী এলবার্জ অঞ্চলের দক্ষিণ ঢালে অবস্থিত শহরে জন্মগ্রহণ করেন। আলকেমীর ওপর রাযী কর্তৃক লিখিত ১২টি গ্রন্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলে পরিচিত গ্রন্থ হচ্ছে গোপনের মধ্যে গোপন সংক্রান্ত গ্রন্থ।

এই গ্রন্থে আল-রাযী মধ্যযুগীয় রসায়নশাস্ত্রীয় পরীক্ষাগারে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক ও উপকরণাদির বর্ণনা দেন। আলকেমীর ওপর রচিত আল-রাযীর গ্রন্থ যা ছিল পরীক্ষাগারে ব্যবহারযোগ্য উপকরণ সম্বন্ধীয়, গোটা পুনর্জাগরণের সময় জুড়ে রসায়নশাস্ত্র ও রসায়নবিদদের জন্য সহায়ক গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তার বর্ণিত অধিকাংশ উপকরণ রেনেসাঁ জুড়ে মান হিসেবে বিরাজমান থাকে। এবং কিছু উন্নয়ন সাধিত হওয়ার পর আজকালকার রাসায়নিক পরীক্ষাগারেও দেখা যায়।

রসায়নশাস্ত্রে ইসলামি অগ্রগতির একটি বিরাট প্রভাব ছিল রসায়নবিদ্যার ওপর। প্রথমত, মুসলিমগণই প্রথম আকৃতিবিশিষ্ট বস্তু অনুযায়ী বস্তুসমূহকে শ্রেণিবিন্যস্ত করেন। পুনর্জাগরণের সময়কার বিজ্ঞানীগণ যারা তাদের মুসলিম প্রতিপক্ষকে অনুসরণ করেন তারা এই পদ্ধতি অনুসরণ করেন এবং বস্তুর ক্রমবর্ধমান জটিল ও যথার্থ শ্রেণিকরণে উন্নয়ন অব্যাহত রাখেন। তবে, তারা সেই একই ব্যবস্থা ব্যবহার করেন যা কয়েকশ' বছর পূর্বে মুসলিমগণ প্রবর্তন করেছিলেন।

অধিকন্তু, রসায়নশাস্ত্র বিষয়ে এবং এর অকার্যকর লক্ষ্য সম্পর্কে মুসলিমদের সমালোচনা আরো অধিক পরিণত বিজ্ঞানের, রেনেসাঁর বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য নির্মাণে

www.pathagar.com

সহায়তা করে। কেউ বলতে পারেন যে, রসায়নশাস্ত্রে মুসলিমদের সমালোচনা রেনেসাঁর সময়ের বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারের জন্য আংশিক দায়ি ছিল। কারণ এটি কল্পনাভিত্তিক গতানুগতিক বিজ্ঞানের বহু পুরাতন ধারণাকে দূরীভূত করে এবং পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও বাস্তব সত্য দ্বারা সমর্থিত ধারণার সূচনা করে।

সমাজবিদ্যা এবং ইতিহাসের দর্শন বিষয়ে ইসলামি অবদান

ইতিহাস সর্বদাই মানুষের আগ্রহের কেন্দ্রে রয়েছে। মানুষ যা তৈরি করেছে তার মধ্যে গল্পকাহিনীই সম্ভবত প্রথম ধরনের জ্ঞান ছিল। কারণ এই যে, এগুলো তাকে তার বর্তমান সময়কে বোঝাবার জন্য কাঙ্ক্ষিত তথ্য সরবরাহ করেছে। এটা সাদৃশ্যমূলক অনুমানের মাধ্যমে ঘটেছে যে মানুষ তার অভিজ্ঞতা বাড়াতে পারে এবং বিলুপ্ত গোষ্ঠী হতে শিখতে পারে। তবে ইবনে খালদুনের পূর্বে ইতিহাস দীর্ঘকাল যাবত কল্পনা ও পৌরাণিক কাহিনীর পর্যায়ভুক্ত কিংবা অযৌক্তিক বর্ণনাপ্রধান ছিল। এটি এমন একটি ক্ষেত্র বলে বিবেচিত হয়েছিল যেখানে বাস্তব ঘটনা মিশ্রিত হয়েছে কল্পনার সাথে এবং বর্ণনার মানসিকতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্য সত্যকে সংশোধন করা হয়েছে। এভাবে, ইতিহাস ছিল জ্ঞানের একটি অবজ্ঞার ক্ষেত্র যা নির্বাসিত হয়েছিল গল্পের মিথ্যা উদ্ভাবন, বা অতীত ঘটনাবলীর দুর্বল বর্ণনার মধ্যে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের আবির্ভাবের পর প্রথমবারের মতো ইতিহাস নির্দিষ্ট পরিভাষা, পদ্ধতি ও বিষয়সমৃদ্ধ একটি বিজ্ঞানে পরিণত হয়। এটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে পূর্ণ উপপাদে পরিণত হয় যা ঘটনা সৃষ্টিতে মিথষ্ক্রিয়া করে। এই মিথষ্ক্রিয়া কিছু গুপ্ত নকশা অনুসরণ করে যাকে পরবর্তীতে ইতিহাসের আইন বলে অভিহিত করা হয়। এসব আইনের স্বীকৃতির ভিত্তিতে ইবনে খালদুন জাতি ও সভ্যতার ভবিষ্যৎ দৃশ্যাবলী সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত পূর্বাভাস দিতে পারতেন।

মুসলিম ইতিহাসে ইবনে খালদুন ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তিনি ঐসব উজ্জ্বল তারকার একজন যিনি ব্যাপকভাবে সভ্যতাকে বোঝবার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছিলেন। কেউ যদি তার অবদান বোঝতে ও প্রশংসা করতে চান তাহলে তাকে তার জীবন সম্বন্ধে জানতে হবে। তিনি স্থিতি ও প্রভাবের সন্ধানে জীবন যাপন করতেন। তার আবির্ভাব ঘটেছিল পণ্ডিত ও রাজনীতিকদের পরিবারে এবং এ দুই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে থাকতে চাইতেন। তিনি অন্য যেকোনো ক্ষেত্রের চেয়ে বিদ্যাবত্তার ক্ষেত্রে সফল হতে পারতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এই শিখরচুম্বী

www.pathagar.com

ব্যক্তিত্ব দীর্ঘদিন ইসলামের অংগনে উপেক্ষিত ছিলেন। উনিশ শতকের পূর্বে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের কিছু পণ্ডিত তার অবদান পুনরাবিষ্কার করা পর্যন্ত অবস্থা এমনই ছিল। পাশ্চাত্যে তার অন্যতম গুণগ্রাহী আরনল্ড টয়েনবি তার সম্পর্কে বলেন যে, তিনি ইতিহাসের এমন একটি দর্শন আত্মস্থ ও সূত্রবদ্ধ করেন যা নিঃসন্দেহে মহত্তম ছিল যেকোনো সময়ে ও স্থানে কৃত এ ধরনের কাজের মধ্যে[১৭৫]।

আমরা সহজেই ইবনে খালদুনকে ইতিহাসের দর্শনের পিতা বলে গণ্য করতে পারি। তার মুকাদ্দিমা বা ভূমিকার মধ্যে তিনি আবির্ভূত হন উমরান বা সভ্যতার বিজ্ঞান নামক নতুন শাস্ত্রের সূত্রনির্মাণে পূর্ণ সচেতন হয়ে। তার মতে, ইতিহাস জল্পনাকল্পনা এবং সত্যে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা, বিরাজমান বিষয়ের কারণ ও উৎপত্তি সম্বন্ধে নিগূঢ় ব্যাখ্যা, এবং ঘটনার কিভাবে ও কেন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান রয়েছে[১৭৬]।

ইবনে খালদুন দৃঢ়তাসহকারে বলেন যে, ইতিহাস সম্বন্ধীয় গভীর উপলব্ধি সমালোচনা চিন্তন দ্বারা সজ্জিত যাতে বিদ্যা ও ভিত্তিহীন প্রতিবেদনের স্থলে ইতিহাসের সত্যিকার হিসাব নির্ণয় করা যায়। তার মতে, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ঐতিহ্য চিন্তনের সাথে ধারণাগত অন্তরায়। তিনি বলেন, লুক্কায়িত সত্যকে খুঁজে আনতে প্রয়োজন সমালোচনামুখী অন্তর্দৃষ্টি। সত্যকে উন্মোচন ও মার্জিত করতে জ্ঞান প্রয়োজন যাতে এর ওপর সমালোচনামূলক অন্তর্দৃষ্টি আরোপ করা যায়[১৭৭]।

ইবনে খালদুনের উদ্দেশ্য ছিল তার সময়ের ও পরবর্তীকালের অন্যান্য অনেক ঐতিহাসিকের দেওয়া ঘটনাবলীর শীতল বর্ণনার বাইরে চলে-আসা। খালদুনের তত্ত্ব অনুযায়ী ইতিহাস পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষা দান করে এবং তাদের বর্তমানকে বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় রসদসহ সজ্জিত করে এবং সেমতে বিভিন্ন উপাদানের সুক্ষ্ম উপলব্ধির ক্ষমতা দ্বারা ভবিষ্যতের জন্য পরিকল্পনা করতে পারে যা যে কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যেই থাকে।

ইবনে খালদুনের পদ্ধতি, যেমন তার সমালোচনামূলক চিন্তন শৈলীর সাথে আরো পরিচিত হতে চাইলে, আসুন আমরা তাকে তার পক্ষে বলতে দিই, যেখানে তিনি

---

[১৭৫] Islam and Science, Parvez Hoodbhoy, Zed Books Ltd. London & New Jersey, 1991, পৃষ্ঠা ১১৫।

[১৭৬] (The Muqaddimah, অনুবাদ : Franz Rosenthal, ২য় সংস্করণ, ১৯৮০; Bollingon Series, XLIII, Prienceton University Press, VI, পৃষ্ঠা ৬)।

[১৭৭] প্রাগুক্ত, (৭/১)।

www.pathagar.com

বলেন, আল-মাস'ঊদী এবং অন্যান্য অনেক ঐতিহাসিক বলেন যে, মুসা আ.-এরুভূমির মধ্যে বনী ইসরাঈলের সৈন্য সংখ্যা গণনা করেছিলেন। তাঁর ছিল ঐসব সমর্থ ব্যক্তি যারা অস্ত্র বহন করতে পারত, বিশেষত কুড়ি বছর এবং তার উর্ধ্বে বয়সের, যারা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। সেখানে একত্রিত হয়েছিল ৬০০,০০০ বা এর বেশি। এক্ষেত্রে (আল মাস'ঊদী) এটা বিবেচনায় নিতে ভুল করেন যে, মিশর ও সিরিয়ার এত সংখ্যক সৈন্য থাকা সম্ভব ছিল কি-না। তাছাড়া, এমন আকৃতির একটি সেনাবাহিনী একতাবদ্ধ গোষ্ঠী হিসেবে অগ্রসর হতে বা যুদ্ধ করতে পারে না। এর জন্য গোটা ভূখণ্ড ছিল খুবই ছোট[১৭৮]। এই জটিল অবস্থানে এসে ইবনে খালদুন এক বা অন্য সূত্রে উপস্থাপিত তথ্যকে সমালোচনার দৃষ্টিতে যাচাই করার জন্য প্রয়োজনীয় অন্তর্দৃষ্টি উপস্থাপন করেন। এটিই তাকে সভ্যতার উত্থান ও পতনের স্বকীয় বিধান আবিষ্কারের দিকে চালিত করে।

ভাষাবিদ্যা

এ পর্বে আমরা ভাষা শিক্ষায় মুসলিম ভাষাবিদগণের অবদান পরীক্ষা করব। আরবি ব্যাকরণের প্রতিষ্ঠাতা আবু আল-আসওয়াদ আল-দুওয়ালী এবং অভিধান রচনা পদ্ধতির সূত্রবদ্ধকারী আল-খলীল বিন আহমাদ আল-ফারাহীদী'র ওপর আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রথমে, আমরা ইসলামের প্রভাবে আরবিতে উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিত্রাঙ্কনের প্রতীক ও মুদ্রণচিহ্ন বিবেচনা করব।

ইসলামের আবির্ভাবের সাথে বিশুদ্ধ আরবি বানানতত্ত্ব নিয়ে সমস্যা দেখা দেয়। কারণ কিছুসংখ্যক বর্ণ একাধিক সঠিক এককের প্রকাশ ঘটায়। যখন অনেক দেশে ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা ছড়িয়ে পড়ে, তখন আরবি ভাষা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষায় পরিণত হয়। যে ব্যক্তি আরবিতে কথা বলতে পারত না তাকে আজমী বলা হতো, অর্থাৎ এমন ব্যক্তি যে আরবদের মতো আরবি বলতে পারে না। পরে যখন আরবরা আজমীদের (অনারব ভাষাভাষী) সাথে মিশে যায়, তখন কথ্য ভাষায় নতুন অভিনবত্বসহ নতুন প্রজন্মের আবির্ভাব ঘটে। কুরআন তিলাওয়াতে বড় বড় ভুল হতে থাকে। কুরআন তিলাওয়াতকে কেন্দ্র করে এমন অভিনব প্রসিদ্ধ ঘটনা ঘটে যা পরবর্তীতে আরব মুসলিম ভাষাবিদদেরকে এ নতুন প্রপঞ্চের (লাহন) সমাপ্তি ঘটাতে

---

[১৭৮] The Muqaddimah, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১৬।

www.pathagar.com

উদ্বুদ্ধ করে। আল-নাসের[১৭৯]-এর মতে, কোনো বিশেষ আয়াত তিলাওয়াত করতে গিয়ে কোনো পাঠক কর্তৃপক্ষ সম্বন্ধীয় স্বরগ্রাম চিহ্নিতকারী লু'কে কর্মকারক সম্বন্ধীয় অক্ষর চিহ্নিতকারী লি দ্বারা স্থানান্তর করলে তাতে আয়াতের অর্থে বৈপরীত্য ঘটে যেমন, أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (সুরা তাওবা ৯ : ৩) (আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল-এর সহিত মুশরিকদের কোনো সম্পর্ক রইল না)। পাঠক আয়াতের শেষ শব্দটি রসুলিহি উচ্চারণ করলে অর্থ সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে যায়। এখানে দুটো শব্দ আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রসুল কর্তৃকারক এবং মুশরিকরা কর্ম। ভুলকারী পাঠক বাক্যে শব্দের ক্রম হতে অর্থ গ্রহণ করতে পারে।

পবিত্র গ্রন্থ তিলাওয়াতে এই গুরুতর ঘটনা ছিল আরবি ব্যাকরণের বিজ্ঞান বিবর্তনের পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ।

অষ্টম শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মৌলিক পরিভাষা ও পদ্ধতিসমেত ব্যাকরণের এক বিবর্তনমূলক বিজ্ঞানের পরিষ্কার চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। প্রায়ই উল্লেখ করা হয় যে, সাম্রাজ্যের নতুন নাগরিকদের উচ্চারণের ভুলই ব্যাকরণের প্রয়োজনীয়তা জাগ্রত করে। তবে, নিশ্চয়ই সচেতনতাই ছিল অধিক বাধ্যকারী শক্তি। ফলে প্রকৃত মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে সরাসরি জীবন্ত যোগাযোগ অতীতে বিলীন হয়ে যায়, ইসলামের অস্তিত্ব চিরস্থায়ী ভাষা প্রতিষ্ঠার ওপর নির্ভরশীল হয়ে ওঠে, যাতে সেই ধর্মের চিহ্নগুলোকে সংযোজিত করা হয়।

এই অবস্থাকে সংশোধন এবং আরবি মুদ্রণচিহ্ন উদ্ভাবনে প্রথম পণ্ডিত কে ছিলেন তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে, বিখ্যাত পণ্ডিত আবু আল-আসওয়াদ এইক্ষেত্রে বিপুল অবদান রাখেন। তিনি ওপরে, নিচে বা ব্যঞ্জণবর্ণের পাশে ছোট স্বরবর্ণ যথাক্রমে ফাতাহাহ্-আলা/কাসরাহ লী/ও দাম্মা লূ চিহ্ন ব্যবহার উদ্ভাবন করেন। বলা হতো যে, আবু আল-আসওয়াদ ব্যাকরণের বিধি প্রণয়নের জন্য পীড়াপীড়ি করতেন যখন এক তারকাশোভিত রজনীতে তার কন্যা তাকে বললেন : মা-আহসানু আল-সামা! তিনি বিস্ময় প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন অথচ আহসান-এর ক্ষেত্রে কর্তৃকারক এবং আল-সামা'র পক্ষে দ্বিতীয়া বিভক্তি ব্যবহার

---

[১৭৯] আল-নাসের, A. আরবি ভাষাতত্ত্বে স্বরগ্রাম চিহ্নিত ও সংজ্ঞায়িত করেছেন, ইংরেজি ও ইসলামে : Creative Encounter, সম্পাদনা : খান ও হেয়ার, ১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৪৪৫।

www.pathagar.com

করলেন। তিনি তাকে (কন্যাকে) এ বলে জবাব দিলেন : নুজূমুহা (এগুলো তারকা)। একমুহূর্ত থতমত খেয়ে তিনি অন্যকিছু বললেন; প্রকৃতপক্ষে তিনি ভাবলেন যে, তিনি কৌতুহল প্রকাশের পরিবর্তে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তখন তিনি বোঝতে পারলেন যে, তিনি শব্দগুলো ভুল উচ্চারণ করেছেন। এভাবে বিস্ময়কে প্রশ্নে পরিণত করার কথা ভাবলেন। সন্দেহ বোঝতে পেরে তার পিতা তাকে বললেন, 'বলো, ما أحسن السماء 'কি সুন্দর আকাশ!'।

এখানে উদ্ভাবনী পদক্ষেপটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এটি আবু আল-আসওয়াদ আল-দুওয়ালীর আরবিতে ছোট স্বরবর্ণের গুরুত্ব উপলব্ধির ওপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

আবু-আল-আসওয়াদ আল-দুওয়ালীর অবদানের ওপর নিম্নের আলোচনা আলোকপাত করবে।

আবু আল-আসওয়াদ আল-দুওয়ালী

তার প্রকৃত নাম যা-লিম বিন আমর। তার বংশবৃত্তান্ত অনিশ্চিত; তার মা আবদ আল-দার গোত্রভুক্ত কুসাইই কুরাইশ ছিলেন। এমন একজন মানুষের জীবন সম্বন্ধে অধ্যয়ন করতে গেলে প্রচুর পরিশ্রম ও ধৈর্য প্রয়োজন। কারণ তিনি জ্ঞানের অনেক ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। তিনি কেবল একজন ভাষাবিদই ছিলেন না বরং একজন বর্ণনাকারী ও কবি ছিলেন। তিনি হিজরতের ১৬ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার জন্মস্থান সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কোনো ঐকমত্য নেই। তবে, আল-দুজানী বিশ্বাস করতেন তিনি মক্কায় জন্মেছেন। তিনি ইসলামে ধর্মান্তরিত হন। তার ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। আল-দুজানীর মতে তিনি খলীফা ওমর বিন আল-খাত্তাব রা.-এর খিলাফতকালে বসরায় অভিবাসিত হন। সুতরাং আমরা যেমনটা জানি, তার জীবন ইসলামি বিশ্বের অসংখ্য রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের সাক্ষী।

এটা লক্ষ্য করা উচিত যে, ব্যাকরণের বিজ্ঞান (علم النحو) প্রাক-ইসলামি যুগে ছিল না কারণ, সে সময় ভাষাবিজ্ঞানের প্রয়োজন হয়নি। তাসত্ত্বেও, যখন অনারবদের মধ্যে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ে, এবং অনারব দীক্ষা গ্রহণকারীদের মধ্যে বা আজমদের মধ্যে বাক্য গঠন পদ্ধতি, লাহন-এ অসঙ্গতি দেখা দেয়, তখনই আরবি ভাষাকে সংরক্ষণের প্রবল প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং এভাবেই ভাষা নির্দেশক

www.pathagar.com

ব্যাকরণের চাহিদা সৃষ্টি হয়। সুতরাং উপসংহারে আমরা বলতে পারি যে, আরবি ব্যাকরণের বিজ্ঞান বিকাশের পশ্চাতে ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক সকল কারণই বিদ্যমান ছিল।

এমনই এক ব্যাকরণ সংযুক্ত হয়েছিল আবু আল-আসওয়াদ আল-দুওয়ালীর সাথে যার নাম অনেক মুসলিম ভাষাবিদের মধ্যে সুপরিচিত হয়ে ওঠে। আল-দুজানী নিশ্চিত করেন যে, আবু-আল-আসওয়াদ সেই ব্যক্তি যিনি আরবি ব্যাকরণের পত্তন ঘটান[১৮০]।

যেসব বিজ্ঞানী কুরআন এবং চিত্রাংকন প্রতীকের ব্যবহার সম্বন্ধে লেখেন, তারা একমত হন যে, চিত্রাংকন প্রতীক প্রবর্তনে আবু-আল-আসওয়াদ ছিলেন প্রথম ব্যক্তি এবং তিনি সেগুলো কুরআনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রয়োগ করেন। সেটা ছিল বসরার গভর্নর যিয়াদ ইবনে আবিহীর শাসনকাল। সে সময় আরবরা নোক্তা ও যতিচিহ্নকে কিছুটা খারাপ মনে করত। তারা বলত, যদি মনে করো যে, তুমি কোনো মূর্খ লোককে লিখছ, তুমি যতিচিহ্ন ব্যবহার করতে পারো। তথাপিও কুরআন সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বুঝেই যিয়াদ ইবনে আবিহী আবু আল-আসওয়াদকে তলব করে কিছু করতে বলেন। লোকদের কল্যাণে কিছু করুন। প্রথমদিকে তিনি অসম্মত হন, কিন্তু যখন তিনি লোকদের কুরআনের ভুল তিলাওয়াত লক্ষ্য করলেন, বিশেষ করে কর্তৃকারকীয় উচ্চারণ চিহ্নের স্থানচ্যুতির ঘটনা শুনলেন পরোক্ষ কর্মপ্রকাশক অক্ষরচিহ্ন লু এর স্থানে লি, যা ইন্নাল্লাহা বারী'উম মিনাল-মুশরিকীন ওয়া রসুলুহু- আয়াতের অর্থ বিকৃত করে ফেলে, তখন তিনি কুরআনের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে নোক্তা ও ছোট বৃত্ত (মাদ) ব্যবহারে সম্মত হন। আবু আল-আসওয়াদ একজন লেখক নিয়ে আসেন এবং তাকে এভাবে লিখতে বলেন, যদি তুমি এই বর্ণটি উচ্চারণের সময় আমার মুখ খোলা লক্ষ্য করো, তাহলে এর ওপর একটি বিন্দু (নোক্তা) বসাও। এবং যদি তুমি আমাকে দেখ আমার ঠোঁট দুটি একত্রে গোলাকার করতে, তাহলে বর্ণের সামনে চিহ্ন বসাও, এবং যদি আমি কাসরাহ লি বলে শেষ করি, তাহলে বর্ণের নিচে কাসরাহ বসাও।

এখন এটা স্পষ্ট যে, আরবি লিখনরীতির সংস্কারে প্রথম পদক্ষেপ আবু আল-আসওয়াদই নিয়েছিলেন, যিনি ছোট বিন্দুগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করেন খুব ছোট লাল

---

[১৮০] Al-Dujani. F. Abu al-Aswad al-Duwali, wa Nash'at al-Nahw al-Arabi, 1974 Kuwait, Wikalat al-Muth'at. পৃষ্ঠা ১৬১।

www.pathagar.com

বৃত্ত দিয়ে ওপরে বা নিচে বা বর্ণের পরে। ড. দাইফ, আবু আল-আসওয়াদ আল-দুওয়ালীর উদ্ভাবন সম্পর্কে বলেন, এটি সত্যিই খুব চমৎকার একটি কাজ, আবু আল-আসওয়াদের কাজটি হচ্ছে প্রতিরক্ষামূলক বেষ্টনীর মতো যা লোকদেরকে ব্যাকরণগত ভুল করা থেকে বিরত রেখেছে[১৮১]। ড. মুবারক বলেন যে, আবু-আল-আসওয়াদ বিধিমালা প্রণয়ন করেন যা পাঠককে কুরআন তিলাওয়াতের সময় কৃত ভুলত্রুটি হতে বিরত রেখেছে[১৮২]।

নিম্নের আলোচনা আরেকজন মুসলিম ভাষাবিদ, আল-ফারাহীদীর অবদানকে তুলে ধরে।

আল-খলীল ইবনে আহমাদ আল-ফারাহীদী

আরবি ধ্বনিবিদ্যা এবং ছন্দশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা আল-ফারাহীদী ছিলেন একজন বিখ্যাত আরব ব্যাকরণবিদ ও অভিধান রচয়িতা। আল-ফারাহীদীকে ইসলামের ইতিহাসে মহান ব্যক্তিত্ব বিবেচনা করা হয়। ইনিই তিনি যিনি তার অপূর্ব অবদান দ্বারা আরবি ভাষার উন্নয়নে সহায়তা করেছিলেন যার মধ্যে আমরা উদ্ভাবন ও সৃজনশীলতা দেখতে পাই। তিনি ছিলেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আরব ভাষাবিজ্ঞানী, ব্যাকরণবিদ এবং ধ্বনিবিজ্ঞানী।

আল-ফারাহীদী ইরাকের বসরায় বড় হন। তার ছাত্রদের মাধ্যমে আরবি ব্যাকরণ ও ভাষা বিজ্ঞানে তার অবদান আমাদের নিকট পৌছায়। তাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হচ্ছেন সিবাওয়াইহ্-যার মাধ্যমে আমরা আরবি ব্যাকরণের বিজ্ঞানে আল-ফারাহীদীর অবদান জানতে পেরেছি।

আল-ফারাহীদী অনেক ক্ষেত্রেই কর্মপরিচালনা করেন। আল-ফারাহীদী সম্বন্ধে বসওয়ার্থ-এর বর্ণনা মতে[১৮৩], শিক্ষক হিসেবে স্থায়ীভাবে কেবল ধ্বনিবিজ্ঞানের প্রশস্ত ক্ষেত্রকেই প্রভাবিত করেননি, ব্যাকরণবিদ, অভিধান রচয়িতা ও পরিমাপবিদ হিসেবে তার সামর্থানুযায়ী, বরং একটি প্রভাবশীল লিখিত প্রামাণিক সাক্ষ্য রেখে গেছেন।

---

১৮১ আল-দুজানীর গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৪।

১৮২ আল-দুজানীর গ্রন্থ হতে উদ্ধৃত, ১৯৭৪, পৃষ্ঠা ১৯১।

১৮৩ Bosworth. C. E. The Encyclopedia of Islam, Von Donzel, W.P. Heimrichs and G.L. Ecomte, Leiden E.J. Brill, 1995 : পৃষ্ঠা ৯৬২।

www.pathagar.com

আল-ফারাহীদী আবু আল- আসওয়াদের পদ্ধতির উন্নয়ন ও সংশোধন করেন। তিনি একই নীতি অনুসরণ করেন কিন্তু প্রতীকের আকার পরিবর্তন করেন। তার সঙ্গীতবিষয়ক অনুভূতির উন্নয়নে সঙ্গীতের এক বিরাট প্রভাব ছিল। সঙ্গীতের সাহায্যেই তিনি বর্ণ তৈরির পর্যায়ে পৌছান এবং প্রতিটি বর্ণকে তার স্থান ও উচ্চারণশৈলী অনুযায়ী সাজান। তিনি বুঝতে পারেন যে, ক্রিয়া বা বিশেষ্য যেকোনো শব্দের ভেতরেই সঙ্গীত রয়েছে। সুতরাং তিনি এগুলোর মিত্রাক্ষর তৈরির কাজ করেন। তিনি আরবি কবিতার পরিমাপক বর্ণনা করেন এবং এগুলোকে ১৫টি প্রকরণে বিভক্ত করেন। এ পদক্ষেপ চরম গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ এটি আমাদেরকে শব্দ পৃথকীকরণে সমর্থ করে যে এটি প্রকৃত শব্দ অথবা ধার করা শব্দ এবং তা বিধি অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়েছে কিনা।

বস্ওয়ার্থ সর্বসমক্ষে প্রকাশ করেন যে, পণ্ডিতগণ আল-ফারাহীদীকে আরবি অভিধান, কিতাব আল-আ'ইন্দ[১৮৪]এর রচয়িতা বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন, তাদের এ মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও যে, এই প্রাথমিক কাজ তার সাথে অথবা তার ছাত্র আল-লেইথ বিন আল-মুযাফফরের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল।

বস্ওয়ার্থের মতে, এই সমস্যার সমাধানে সাম্প্রতিক অনুসন্ধান যথাযথ অবদান রেখেছে। এর ফলে দেখা গেছে যে, অভিধানের পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে আল-খলীলের কাছ থেকে এসেছিল। এটা বর্ণনাক্রমিকভাবে সজ্জিত নয় কিন্তু সম্ভবত ভারতীয় প্রভাবে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীভুক্ত ধ্বনি দ্বারা যেমন তথাকথিত আল-খলীলের ক্রম-এর অধীন সজ্জিত হয়েছিল : হ, হ, খ, ঘ, ক, ক, ডি, শ, ড, স, স, য, ট, ড, ট, য, ডব, থ, র, ল, ন, ফ, ব, ম, উ, আলিফ, ঈ। সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে এটাও দেখা যায় যে, অভিধানে আল-খলীলের অবদান উৎসের চেয়ে যৎকিঞ্চিত বেশি এবং ঐ কিতাব আল-আইন এর বর্তমান রূপে, বিশেষত প্রচুর পরিমাণ রসদের ক্ষেত্রে আল-লেইথ এর কাজ বলে বিবেচিত হবে।

বস্ওয়ার্থ আল-ফারাহীদীর ছোট রচনাকর্ম, আল-হুরূফ নিয়ে মন্তব্য করেন। শব্দের অর্থের প্রমাণ হিসেবে পুরাতন আরবি পংক্তিমালা, ভাষাগত অভিনবত্ব এবং ব্যাকরণগত গঠন নিয়ে কাজ করার সময় আল-ফারাহীদী একটি বিস্ময়কর ও গুরুত্বপুর্ণ আবিষ্কার করেন। পংক্তিমালার ছন্দ বিশ্লেষণকালে তার সামনে উদ্ঘাটিত হয় যে, হ্রস্ব ও দীর্ঘ শব্দাংশগুলো পরিবর্তিত হয়েছে এবং কঠিন ধাঁচে পুনরাবৃত্ত

---

[১৮৪] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯৬৩।

www.pathagar.com

হয়েছে। তিনি এ এককগুলোকে পাঁচটি সমকেন্দ্রিক বৃত্তে বিভক্ত করেন যেগুলোকে তাদের পরিমাণ অনুযায়ী পৃথক করা সম্ভব। এভাবে তিনি একটি উপযোগী ও কার্যকর চিত্ররূপ দেখতে পান। সমানভাবে সরল ও চমৎকার পংক্তির পরিমাপ-ক্রমের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য পরস্পরকে পৌনঃপুনিকভাবে অনুসরণ করেন। এক্ষেত্রে ছন্দের উচ্চারণকেও বিবেচনায় নেওয়া হয়েছিল। আল-ফারাহীদীর পরিমাপমূলক ব্যবস্থা পরবর্তী সব লেখকই কাজে লাগান। পরিমাপকসমূহের নাম এবং একগুচ্ছ পরিভাষাও তার দিকেই নিঃসন্দেহে ফিরে আসে যাতে পরিমাপকসমূহকে সহজে বলা হয়, ইলম আল-খলীল (আল-খলীলের বিদ্যা)।

তবে আল-খলীল তার মেধা প্রদর্শনে যে সর্বোত্তম অবদান রেখেছেন তাহলো প্রথম আরবি অভিধান লিখনে গৃহীত গাণিতিক পদ্ধতি। তিনি সকল আরবি শব্দকে তাদের শব্দার্থক্রম অনুযায়ী বসাতে আরোহ পদ্ধতিতে এসেছেন। তিনি এ বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন যে, অন্যান্য সেমেটিক ভাষার মতো আরবির একটি বৈশিষ্ট্য হলো গঠন ও অর্থের মধ্যেকার সম্পর্ক। আরবিয় অধিকাংশ শব্দই তিনটি মূলক দ্বারা গঠিত। উদাহরণস্বরূপ : কা/তা/বা অর্থাৎ লেখার জন্য ক্রিয়াপদ। আল-খলীলের পদ্ধতি অনুযায়ী আমরা আরোহমূলকভাবে সম্ভাব্যতার সূত্র ব্যবহার করতে পারি কা তা বা-র সম্ভাব্য সব পরিবর্তনগুলো জানার জন্য। প্রকৃতপক্ষে এগুলোর সংখ্যা ছ'টি: কাতাবা/ কাবাতা/তাকাবা/তাবাকা/বাকাতা/বাতাকা-এর ওপর ভিত্তি করে আমরা সহজেই জানতে পারি ব্যবহৃত ও অবহেলিত এই পরিবর্তনগুলোকে।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

পাশ্চাত্য পরিপ্রেক্ষিতে সৃজনশীলতা

এ অধ্যায়ে সৃজনশীল চিন্তনে পাশ্চাত্য রচনাবলী তুলে ধরা হবে। চারটি বই রয়েছে যেগুলোকে এ বিষয়ে গবেষণা কর্ম বলা যায়। এর মধ্যে একটি হলো সৃজনশীলতার বিশ্বকোষ এবং অন্যান্য কিছু মৌলিক রচনা।

যতটা সম্ভব উপলক্ষ বা ব্যক্তিগত ব্যাখ্যা এড়াবার জন্য এ বিষয়ে কিছু আলোচনায় আমরা সঠিক মূল পাঠকে উদ্ধৃত করেছি। যখন আমাদের ব্যক্তিগত অভিমত, মন্তব্য বা এরকম কিছু থাকে তখন আমরা এর একটা পরিষ্কার ইঙ্গিত দিই।

সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত উপাদান ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা নিম্নলিখিত উপায়ে অধ্যায়টিকে উপ-কাঠামোতে বিভক্ত করেছি :

ক. ঐতিহাসিক পরিক্রমা

খ. সৃজনশীলতার সংজ্ঞাসমূহ

গ. সৃজনশীলতার উপাদানসমূহ

ঘ. সৃজনশীলতা অধ্যয়নের পদ্ধতিসমূহ

ঙ. সৃজনশীলতা বিষয়ক গবেষণাকর্ম মূল্যায়ন

চ. পার্শ্বগত চিন্তনের উদ্ভব

১. ঐতিহাসিক পরিক্রমা

সৃজনশীলতা সম্পর্কে গোটাকয়েক সর্বশেষ রচনায় এ অভিমত পাওয়া যায় যে, এটি একটি সাম্প্রতিক প্রয়াস ও বিষয়। আনুপূর্বিক ঐতিহাসিক আবিষ্কার নির্দেশ করে যে, প্রাচীন বিশ্ব হতেই সৃজনশীলতা সম্পর্কে আগ্রহ খুঁজে পাওয়া যায়। এই আগ্রহ অনেক প্রকারে এবং বিভিন্ন রূপে প্রকাশ পেয়েছে। কতক লেখকের নিকট সৃজনশীলতা হচ্ছে একটি স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা, যেমন-স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা অবতীর্ণ

www.pathagar.com

হয়েছিল নবি মুসা আ.-এর ওপর। অন্যদের মতে, এটা ছিল ঐশ্বরিক উন্মাদনা[১৮৫], দার্শনিকগণ সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেন। প্লেটো তার সময়ে সমাজের জন্য সৃজনশীল লোকদের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করেন এবং তাদের উন্নয়ন উৎসাহিত করার পথ নির্দেশ করেন[১৮৬]। তবে, তিনি তার দর্শনগত কাজের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন যুক্তিপূর্ণ চিন্তা ও যুক্তি উপস্থাপনের ব্যাপারে। সৃজনশীলতাকে প্রদান করেন দ্বিতীয় পর্যায়ের গুরুত্ব। সে সময় চলমান বিতর্কের কারণেই এমনটা হতে পারে। এই পছন্দ ও অগ্রাধিকার প্রদান সক্রেটিস এবং অ্যারিস্টটলের ব্যাপারেও প্রযোজ্য। দাবি করা হয় যে, এটি হাজার বছরের বেশি সময় ধরে পাশ্চাত্য চিন্তায় সমালোচনাধর্মী চিন্তাশৈলীকে দমিত করে রাখে[১৮৭]।

ডেসী (১৯৯৯)-এর মতে, সৃজনশীল প্রক্রিয়ায় প্রথম বড় ধরনের অনুসন্ধান শুরু হয় ১৯৬৭ সালে এবং উইলিয়াম ডাফ ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি প্রকৃত মেধাবীদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লেখেন। ডাফ এর রচনাকেই কয়েকটি ঘটনার একটি বলে বিশ্বাস করা হয় যা মানবচিন্তার ওপর বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, যা পরবর্তীতে সৃজনশীল কাজের রহস্য উন্মোচনে দরকারি বলে প্রমাণিত হয়[১৮৮]।

সৃজনশীলতার ইতিহাস সংক্রান্ত গবেষণায় প্রায়ই স্যার ফ্রান্সিস গ্যালটন-এর উদ্ধৃতি দেওয়া হয় প্রতিভাধরদের প্রকৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনাকারী প্রথম পণ্ডিত হিসেবে। গ্যালটন বুঝতে পেরেছিলেন যে, মানসিক সামর্থ্য আসে উত্তরাধিকারসূত্রে। অতএব সেই ব্যক্তির মধ্যে প্রতিভা থাকে যারা ব্যতিক্রমী উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত, বিশেষ করে মস্তিষ্ক কোষের। তিনি এটা গ্রহণে অস্বীকৃতি প্রকাশ করেন যে, সৃজনশীল কর্মে প্রাথমিক অভিজ্ঞতা কিংবা তাৎক্ষণিক পরিবেশ অনেকটাই ভূমিকা পালন করেছে। এতদসত্ত্বেও গ্যালটনের মতামত গ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হয়নি। সাথে সাথেই তা গেস্ট্যাল্ট মনোবিজ্ঞানীদের দ্বারা বাতিল হয়ে যায়। গেস্ট্যাল্ট একটি জার্মান শব্দ যা ব্যবহৃত হয় মানসিক প্যাটার্ন বা গঠন-এর পরিবর্তে। গেস্ট্যাল্ট যুক্তি দেখান যে, সমগ্র সমস্যার ক্ষেত্রে একটি নতুন ধরনের

---

১৮৫ Richard Ripple : Teaching Creativity, Encyclopedia of Creativity, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৬৩০।

১৮৬ Cropley : Definitions of Creativity, Encyclopedia of Creativity, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫১২।

১৮৭ Edward de Bono : Parallelthinking.

১৮৮ (ডেসী) Dacey, John : Concept of Creativity (1999), Encyclopedia of Creativity, খণ্ড ১,, পৃষ্ঠা ৩১৬।

www.pathagar.com

অভিমত পাওয়ার চেয়ে বরং এটাকে অংশে অংশে সাজিয়ে নেওয়া সৃজনশীলতা তৈরিতে বেশি সম্ভাবনাময়।

কিভাবে মানবমস্তিষ্ক কাজ করে এ বিষয়ে উনবিংশ শতকে পরিচালিত গবেষণায় ফ্রাঞ্জ গ্যল-এর নামটি চলে আসে। গ্যল এর গবেষণা তাকে এ বিশ্বাসের পথে চালিত করে যে, প্রত্যেক মস্তিষ্কের মানচিত্রের সম্মুখের অংশগুলোতে কথা অবস্থান করে। ১৮৬১ সালে, একজন ফরাসি শল্য চিকিৎসক পল ব্রোকা, রোগীদের কতকগুলো বৃত্তান্ত, যারা বাকশক্তিহীনতা রোগে ভুগছে পরীক্ষা করে দেখতে পেলেন যে, মস্তিষ্কের সামনের অংশে তন্তুর একটি স্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ধারণাটি পরে রাখা হয় যে, কোনো কোনো ব্যক্তির মস্তিষ্কের বাম পার্শ্ব এবং কোনো কোনো ব্যক্তির ডান পার্শ্ব মানসিক প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তারপর থেকে অনেক আলোচনা এমনকি বিতর্কও হয়েছে মস্তিষ্কের দুটি অংশের মিথষ্ক্রিয়া এবং কিভাবে তা সৃজনশীল চিন্তায় অবদান রাখে সে বিষয়ে।

উইলিয়াম জেমস ছিলেন প্রথম বিজ্ঞানী যিনি বংশানুগতিক উত্তরাধিকারের সাথে পরিবেশের মিথষ্ক্রিয়ার একটি ঘটনা তৈরি করেন। তিনি যুক্তি দেন যে, বংশগত উত্তরাধিকারের চেয়ে পরিবেশ সামর্থ্য নির্ণয়ে বেশি শক্তিশালী প্রভাব রাখে। গ্যালটনের সাথে জেমস এই চিন্তনের নেতা ছিলেন যে, কারো অসচেতন ভাবধারার সংস্পর্শে আসার সামর্থ্য মৌলিকত্বের জন্মদানের মূল[১৮৯]।

এ অভিমতের মুখ্য সমর্থক সিগমাণ্ড ফ্রয়েডের অভিমত এই যে, সৃজনশীল সামর্থ্য হচ্ছে ব্যক্তিত্বের লক্ষণ যা অভিজ্ঞতার সাথে গেঁথে যাওয়ার ঝোঁকপ্রবণ যা জীবনের প্রথম পাঁচ বছরে স্থান নেয়। ফ্রয়েড এবং তার প্রথম দিকের মনোবিশ্লেষক অনুসারীগণ সৃজনশীলতাকে কিছু দগ্‌দগে অভিজ্ঞতা পাড়ি দেওয়ার ফলাফল হিসেবে দেখেছেন, সাধারণভাবে যেটা শৈশবে ঘটে থাকে[১৯০]।

সৃজনশীলতা গবেষণায় আরো প্রত্যক্ষ বক্তব্যের সূচনা করার কৃতিত্ব গারহাম ওয়ালাসের। ১৯২৬ সালে তা চার-স্তর প্রক্রিয়া তত্ত্বে তিনি এই প্রস্তাব পেশ করেন। ফ্রয়েডের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে ওয়ালাস তার তত্ত্বে 'অবচেতন' মনকে কেন্দ্রস্থলে রাখেন। তবে, ওয়ালাস অবচেতন-এর ওপর চেতন মনের অধিকতর প্রভাব আরোপ করেন। চেতন ও অবচেতন-এর এ অংশীদারিত্ব চার-স্তর প্রক্রিয়ায়

---

[১৮৯] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩২১ ও ৩২২।

[১৯০] প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

প্রত্যাদিষ্ট হয় : প্রস্তুতি, গভীর চিন্তন (incubation), আলোকিতকরণ এবং যাচাইকরণ[১৯১]।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ববর্তী এবং স্বল্পসময় পরবর্তী গবেষকগণ গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি দেন, একইভাবে স্থাপত্যের ন্যায় বৃত্তিতেও। এসব আলোচনায় সৃজনশীলতার শক্তিশালী নান্দনিক ব্যঞ্জনা ছিল, এবং পরিবেশ সুন্দরকরণের জন্য বিশাল মাধ্যম হিসেবে দেখা হয়েছিল। এটা ছিল এক প্রকার আত্ম-প্রকাশ ও যোগাযোগ অথবা বোঝার এক পদ্ধতি, পূর্বের অজানা বিষয়ের সাথে সাফল্যের সাথে মেনে নেওয়ার সূচনা[১৯২]।

১৯৫০ সালে জে পি গিলফোর্ড সৃজনশীলতার বৈজ্ঞানিক গবেষণায় আমূল পরিবর্তন সাধনের জন্য সমাদৃত হয়েছেন। এটা তিনি করেছেন মনোবিজ্ঞানীদেরকে সৃজনশীলতার ওপর আরো কেন্দ্রীভূতকরণে উদ্বুদ্ধ করে, যখন তিনি আমেরিকান মনোবিজ্ঞানী সমিতির সাথে কথা বলেন[১৯৩]। তার উদ্বুদ্ধকরণমূলক কথাবার্তায় প্রভাবিত হয়ে একগুচ্ছ গবেষণা করা হয়েছিল সৃজনশীলতার বিভিন্ন দিক নিয়ে। তাছাড়া গিলফোর্ড বোধশক্তির কাঠামোতে ভিন্নমুখী চিন্তন নামে নতুন উপাদান যুক্ত করেন। এটি একটি মানসিক ক্রিয়া এমন অবস্থায় সম্পাদিত হয় যখন কোনো আগাম সঠিক সিদ্ধান্ত বা জবাব থাকে না। পরিবর্তে কমবেশি যথাযথ সমাধান খোঁজ করা হয়। ভিন্নমুখী চিন্তনের বিপরীত হচ্ছে সমকেন্দ্রী চিন্তন, যেখানে সমস্যার জন্য সমাধান আগাম চিহ্নিত করা হয়।

ভিন্নমুখী চিন্তনকে সন্দেহাতীতভাবে সৃজনশীলতার সংজ্ঞা বিবেচনা করা হয়েছিল। এর বিভিন্ন দিকের মধ্যে ছিল সাবলীলতা, নমনীয়তা, স্বকীয়তা এবং চিন্তার বিস্তারণ। এই উপাদানগুলোকে সংখ্যায় ব্যক্ত করার মতো এবং পরিমাপযোগ্য ভাবা হয়েছিল যা মনোপরিমাপ ধারণার দিকে সৃজনশীলতার বৈজ্ঞানিক অধ্যয়নকে চালিত করে।

অর্ধ শতাব্দী পরে, অবিরাম প্রয়াস ও গবেষণা বিভিন্ন পর্যায়ের সৃজনশীলতার ধারণার দিকে নিয়ে যায় যা সৃজনশীলতা সমর্থিত ভাবধারাকে প্রত্যেকের জন্য লভ্য আদর্শগত প্রক্রিয়া বলে গুরুত্ব দান করে। পাশাপাশি, প্রত্যক্ষ প্রয়াসের ফল হিসেবে

---

১৯১ Richard Ripple : Teaching Creativity, পৃষ্ঠা ৬৩০।

১৯২ Cropley : Definition of Creativity, Encyclopedia of Creativity, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৬৩০।

১৯৩ Richard Ripple : Teaching Creativity, পৃষ্ঠা ৬৩০।

www.pathagar.com

সৃজনশীলতাকে উন্নত করা যায়–এমন ধারণা জনপ্রিয়তা পেতে থাকে। সৃজনশীলতা একটি গৃহস্থালীসংক্রান্ত শব্দে পরিণত হয় এবং সৃজনশীল পরিভাষাটি এর দ্বারা সংশোধিত যে কোনো বিশেষ্য পদকে বর্ধিত করে[১৯৪]।

২. সৃজনশীলতার সংজ্ঞা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছিল যে, সৃজনশীলতা দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত, বিপরীতমুখী চিন্তন (সৃজনশীলতার সাথে এটা যুক্ত) এবং কেন্দ্রমুখী চিন্তন। পরেরটির মধ্যে রয়েছে কোনো সমস্যার সম্ভাব্য সমাধানসমূহের সংখ্যা কমিয়ে আনার জন্য যুক্তিবিদ্যা ও জ্ঞানের প্রয়োগ যতক্ষণ না ব্যক্তির চিন্তাধারা সবচেয়ে যথাযথ পছন্দটির ওপর কেন্দ্রীভূত হয়। এক্ষেত্রে প্রথমটি সমস্যা সমাধানের বহুমুখী পথ মনশ্চক্ষে দেখতে সমর্থ হয়[১৯৫]। জটিলতা ও বহুমাত্রিকতাপূর্ণ উপাদানের কারণে, পাশ্চাত্য গবেষকদের মধ্যে সৃজনশীলতাকে সহজে সংজ্ঞায়িত করা যায় কিনা তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

সৃজনশীলতার ওপর একটি যথাযোগ্য গবেষণা কর্মের বর্ণনা নিম্নরূপ : অনেক গবেষক সৃজনশীলতাকে একটি জটিল, বহুমুখবিশিষ্ট ধারণা হিসেবে বিবেচনা করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। তাই, কার্যসাধনক্ষম অতিসম্ভাব্য সংজ্ঞাসমূহকে বিবেচনা করা যায় না। টোরেন্স (Torrance) সামর্থ্য, দক্ষতা এবং উদ্বুদ্ধকরণকে সৃজনশীলতার সংজ্ঞা প্রদানে প্রয়োজন বলে বিবেচনা করতে তাগিদ দিয়েছেন। আমরা যখন সৃজনশীলতার দিকে আমাদের মনোযোগ ফেরাই, অনেক ভিন্ন ধরনের অর্থ উদ্ভূত হয়, কিন্তু এগুলোকে সক্রিয়করণের জন্য উপযোগী ক্ষমতার ক্ষেত্রে বিশাল পার্থক্য দেখা যায়। সাধারণভাবে সৃজনশীলতার অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন অর্থ ও অভিব্যক্তি রয়েছে। যা সৃজনশীল প্রতিভার বিচিত্র ধরনের দর্শনগত ধারণা ও মূল্যবোধের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। সৃজনশীলতা সম্পর্কিত অভিমতকে ব্যক্তিকে জোরদারকরণ, প্রক্রিয়া, উৎপাদিত বস্তু/বিষয়, বা পরিবেশ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। তত্ত্ব ও গবেষণাকে বৈশিষ্ট্যের প্রকৃতির ভিত্তিতে সংহত করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থিত প্রয়াসের একটি আহ্বান রয়েছে অধিকতর

---

[১৯৪] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৩১।

[১৯৫] The Gale Encyclopedia of Psychology (1996), Gall. খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৯০।

www.pathagar.com

উপযোগী ধারণাগত ও কার্যগত সংজ্ঞার জন্য। এমনকি এসব ক্ষেত্রে উন্নতি হলেও একক, ব্যাপকভাবে সমর্থিত বা সমন্বিত তত্ত্ব নেই[১৯৬]।

পরবর্তী একটি গবেষণাকর্ম—সৃজনশীলতা সংজ্ঞায়িতকরণে অসুবিধা স্বীকার করার সময়-এটিকে অধিকতর ইতিবাচক পথে স্থাপন করে। রিচার্ড রিপ্‌ল বিশদভাবে বলেন, সৃজনশীলতা হচ্ছে সমাজবিজ্ঞানে সবচেয়ে দ্ব্যর্থবোধক পরিভাষাসমূহের অন্যতম। একটি বহুমাত্রিক ধারণা যেখানে পরস্পরবিরোধী মতামত ও সংজ্ঞার সুযোগ উন্মুক্ত। সৃজনশীলতার এমন জটিল ধারণা সংজ্ঞাবিরোধী যা বাড়াবাড়ি রকমের বিরক্তিকর হওয়ার প্রয়োজন নেই। সৃজনশীলতাকে একটি একক সামর্থ্য হিসেবে প্রকৃতিগতভাবে এককেন্দ্রিক বুদ্ধিমত্তার চিন্তনের চেয়ে উৎপাদনক্ষম মনে করা যায় না। উভয়টির মধ্যেই রয়েছে সামর্থ্য, দক্ষতা, উদ্বুদ্ধকরণ এবং মনোভাবের সমাহার। ক্রীড়াবিদের মতো সামর্থ্যের অনেকটাই যা প্রকৃতপক্ষেই অনেক ভিন্ন ভিন্ন সামর্থ্যের সমাহার, এ দিয়ে বহু সৃজনশীলতার কথা ভাবাই বেশি উপকারী। বিভিন্ন সৃজনশীলতার মধ্যে পার্থক্য এর অধ্যয়ন এবং এর উন্নয়নে পার্থক্যকারী অভিমত প্রকাশে বিভিন্ন প্রকার বক্তব্য রয়েছে[১৯৭]।

এ অভিমতের ভিত্তিতে রিপ্‌ল সৃজনশীলতাকে একটি সরল সামর্থ্য, দক্ষতা, উদ্বুদ্ধকরণ ও মনোভাব এর সমাহার[১৯৮] বলে অভিহিত করেন। ওপরের আলোচনা মনে রেখে এবং সৃজনশীলতা সংজ্ঞায়নে অন্যান্য প্রয়াস ব্যবহার করতে নিম্নলিখিত উদাহরণ রয়েছে :

নতুন এবং অপ্রচলিত পথে সমস্যার সমাধান পেতে, নতুন উদ্ভাবন সৃষ্টিতে, অথবা শিল্পের কাজে ধ্যান-ধারণাকে পাশাপাশি স্থাপনের সামর্থ্য[১৯৯]।

একক ব্যক্তির ওপর আলোকপাত করে সৃজনশীলতাকে চিন্তার একটি দিক, ব্যক্তিত্ব স্বরূপ এবং চিন্তন, ব্যক্তিগত উপাদান ও উদ্বুদ্ধকরণের মিথষ্ক্রিয়া হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এই মিথষ্ক্রিয়ার মধ্যে কিছু সংখ্যক আপাতবিরোধী সত্য, আপাত

---

১৯৬ Frontiers of Creativity Research.

১৯৭ Richard Ripples : Teaching Creativity. Encyclopedia of Creativity, খণ্ড ১,, পৃষ্ঠা ৬৩০।

১৯৮ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬২৯

১৯৯ The Blackwell Dictionary of Cognitive Psychology. (1991), USA

www.pathagar.com

পরস্পরবিরোধী উপাদানকে সৃজনশীলতার বিকাশের জন্য সহাবস্থান করতে হয়[২০০]।

এটা পরিষ্কার যে, এ সংজ্ঞাগুলো সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব, সৃজনশীল উৎপাদন, সৃজনশীল প্রক্রিয়া বা সৃজনশীল পরিবেশের ওপর আলোকপাত করে। সৃজনশীল ব্যক্তিত্বভিত্তিক সংজ্ঞা সৃজনশীল লোকদের বৈশিষ্ট্যের ওপর জোর দেয়। সৃজনশীল প্রক্রিয়াকে ভিত্তি করে প্রদত্ত সংজ্ঞা সমস্যা উপলব্ধিকরণ, প্রকল্পিত বক্তব্য গঠন ও পরীক্ষণ, এবং ফলাফল বিষয়ে যোগাযোগ সাধনের ওপর জোর দেয়-যা সাধারণত মূল্যবোধ বা সামাজিক মূল্যের সাথে সম্পৃক্ত। সৃজনশীল পরিবেশভিত্তিক সংজ্ঞা সেই পরিবেশের ভূমিকার ওপর জোর দেয় যা সৃজনশীলতাকে সমর্থন বা সংযত রাখতে পারে[২০১]।

আরেকটি বিতর্কের উদ্ভব ঘটেছে সৃজনশীলতার এসব বিভিন্ন সংজ্ঞা হতে। তা হচ্ছে কোন্ উপাদান প্রধান ভূমিকা পালন করে এবং তাই অধিক গুরুত্ব দাবি করে?

আমরা সৃজনশীলতা অধ্যয়নের মতবাদসমূহের মধ্যে এই বিতর্কের প্রতিফলন দেখতে পারি, যেখানে প্রত্যেক গ্রন্থকারই এক বা অন্য উপাদানকে আনুকূল্য দেখাবেন।

৩. সৃজনশীলতার উপাদান

সৃজনশীলতা আলোচনার ক্ষেত্রে কোন্‌টিকে প্রধান উপাদান গণ্য করতে হবে? সৃজনশীল বিবেচনার কোনো কিছুর মধ্যে কোন্ উপাদান থাকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ? এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পূর্বে আসুন আমরা আর্থার জে. ক্রপলি প্রদত্ত ইতিহাসের দিকে এক নজর দেখে শুরু করি : ১৯৫০ দশকের শেষ দিকে স্পুটনিক আঘাত-এর ঠিক পরপরই যুক্তরাষ্ট্রে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের গুরুত্বের দিক পরিবর্তিত হয়, এবং সৃজনশীলতাকে প্রতিযোগিতার (বিশেষ করে মহাশূন্য অভিযানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে) ক্ষেত্রে ব্যবহারে জোর দেওয়া হয়। অতি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সৃজনশীলতা সম্পর্কিত আলোচনা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ হয়ে ওঠে, আবার প্রতিযোগিতায় অবিমিশ্র গুরুত্ব পায় এ সময়ে বাজার ও বাজার

---

[২০০] Encyclopedia of Creativity. খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫১১।

[২০১] Gary A. Davis (1998) : Creativity is Forever, [Iowa : Kendall Hun : Publishing Company].

www.pathagar.com

অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে নতুন দ্রব্য উৎপাদনে গবেষণার ওপর আলোকপাত করা হয় এবং উৎপাদন পদ্ধতির ওপর, উদাহরণস্বরূপ, স্বত্বাধিকারীদের গবেষণার মাধ্যমে। অতি সম্প্রতি, সৃজনশীল ব্যবস্থাপনার ওপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হচ্ছে, বিশেষ সৃজনশীল নেতৃত্ব, উদ্ভাবন এবং উদ্ভাবনের ব্যবস্থাপনার ওপর। উৎপাদনশীলতা, কার্যকারিতা এবং এমনই সব বিষয়ে গবেষণাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

অতি সম্প্রতি, আলোচনাকে আবারো আরো বিস্তৃত করা হয়েছে। সৃজনশীলতাকে দেখা হচ্ছে একমাত্র অনুপম মানবিয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে। একটি এলাকা চিহ্নিত করা হচ্ছে যেখানে, উদাহরণস্বরূপ, মাইক্রোইলেকট্রনিক্স-এর প্রবেশ সম্ভব নয়। এই দৃষ্টিকোণ হতে, সৃজনশীলতা হচ্ছে মানবমর্যাদার একটি সুরক্ষাপ্রাচীর, এমন যুগে যেখানে যন্ত্রবিজ্ঞান, বিশেষত কম্পিউটার দৈনন্দিন কার্যনির্ঘণ্ট, দক্ষতাপূর্ণ কার্যকলাপ এবং দৈনন্দিন চিন্তনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে বলে মনে হয়। এই দৃষ্টিকোণের বিস্তৃতি ঘটালে সৃজনশীলতাকে মানসিক স্বাস্থ্যের উপাদান হিসেবে দেখতে হবে। দেখতে হবে নমনীয়তা, উন্মুক্ততা, সাহস, এবং এমনই বিষয়ের সাথে এর প্রত্যক্ষ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে, যেগুলো নিজেরাই একটি স্বাস্থ্যকর ব্যক্তিত্বের পূর্বশর্ত হিসেবে দেখা দেয়। সৃজনশীলতাকে জীবনের ইতিবাচক সামঞ্জস্যবিধানের জননী বলে ভাবা হয়। শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনায়, সৃজনশীলতাকে শিখনের বিশেষ উপায় হিসেবে দেখা হয়। যার মধ্যে রয়েছে সৃজনশীল শিক্ষণ এবং সৃজনশীল শিখন কৌশলসমূহ। এসব কৌশল শিখনকে সহায়তা করে এবং একই সাথে লাগসই শিক্ষণ ও শিখন ফল হয়ে দাঁড়ায়[২০২]।

সৃজনশীলতা সম্পর্কে প্রাথমিক পাশ্চাত্য লেখনীতে, নতুনত্ব সর্বদাই একটি উপাদান ছিল। এ বিষয়ের ওপর আরো গবেষণায় অন্যান্য উপাদানকেও বিবেচনা করা হয়েছে। যেমন- প্রাসঙ্গিকতা ও কার্যকারিতা (এমনকি যদিও এক শাস্ত্র হতে অন্য শাস্ত্রে কার্যকারিতার অর্থে পার্থক্য রয়েছে)। তবে, গণবিধ্বংসের হুমকি এবং বিজ্ঞান ও সম্প্রতির মানব ক্লোনিং সম্পর্কিত জীন প্রকৌশলে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের ফলে কতিপয় পাশ্চাত্য লেখক সৃজনশীলতার ইতিবাচক ব্যঞ্জনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন এবং নৈতিক উপাদান যোগ করেছেন[২০৩]।

---

[২০২] Arther J. Cropely : Definitions of Creativityt Encyclopedia of Creativity, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫১২।

[২০৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫১৩

www.pathagar.com

কিভাবে আমরা এসব উপাদান (গণধ্বংস সাধন, ক্লোনিং এবং এমন অন্য কিছু)-এর বিচার করতে পারি তা ক্রুপলি'র বাখ্যায় স্পষ্ট হয়নি। এগুলো কি সৃজনশীল উৎপাদিত বস্তু কিংবা বস্তু নয় বিবেচিত হবে, অথবা এগুলো কি সৃজনশীল তবে নৈতিক নয়? এমনকি উপকারিতার উপাদানের ওপর ভিত্তি করে যেমনটা প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে, এই জিনিসগুলো বিপক্ষে ব্যবহৃত অন্য দিকের জন্য ক্ষতিকর।

জ্ঞানকে কি সৃজনশীলতার প্রয়োজনীয় উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা যায়? এখানে পরস্পরবিরোধী অভিমত পাই। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে বিশেষ ক্ষেত্রসমূহে, প্রাসঙ্গিক বিশেষায়িত জ্ঞানের মালিকানা (উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানে), বিশেষ উপকরণ/যন্ত্রপাতি ব্যবহারের (যেমন, ভাস্কর্য) সামর্থ্য, যন্ত্রাদির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা (যেমন, সঙ্গীত) অথবা বিশেষ কৌশলাদি (যেমন, সৃজনশীল লেখনী) গুরুত্বপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে, জ্ঞান, বিশেষ দক্ষতা, কৌশলাদি এবং এ ধরনের উপাদানসমূহ সৃজনশীলতার সকল ক্ষেত্রেই ভূমিকা পালন করে[২০৪]।

মনে হয় যে, পাশ্চাত্য গবেষকগণ যেভাবে সৃজনশীলতা ও জ্ঞানের মধ্যকার সম্পর্ককে ধারণাবদ্ধ করেছিলেন তা ভিন্ন ধরনের। কারণ, তাদের অনেকেই বলেন, যেহেতু সংজ্ঞার দিক থেকে সৃজনশীল চিন্তন জ্ঞানের ঊর্ধ্বে, জ্ঞান ও সৃজনশীলতার মধ্যে টানটান অবস্থা রয়েছে এবং দাবি করেন যে, জ্ঞান হতে সৃজনশীল চিন্তা স্বাধীন-জ্ঞান কেবলমাত্র খুব ঢিলেঢালা অনুভূতি সত্যিকার সৃজনশীলতার সাথে সম্পর্কিত, এবং চিন্তার অভ্যাসের নেতিবাচক প্রভাব নির্ণয়ে জোর দেয়; জোরালোভাবে বিশ্বাস করে যে, সৃজনশীলতা ও জ্ঞান ইতিবাচকভাবে সম্পর্কিত। প্রথমটির যুক্তি হচ্ছে যে, সৃজনশীলতা অতীত হতে স্বাধীন, যেখানে পরেরটির যুক্তি হলো কোনো সৃজনশীলতাই হতে পারে না যদি কোনো ফল শক্তভাবে অতীতে প্রোথিত থাকে। এবং যেকোনো উৎপাদিত বিষয়কে দর্শকদের বোঝতে হলে তার একটি সূত্র কাঠামো থাকতে হবে যা কেবল অতীতই সরবরাহ করতে পারে[২০৫]।

সভ্যতা কিভাবে এবং কোন্ পথে সৃজনশীলতার সাথে যুক্ত? আরো সাম্প্রতিক গবেষণা নিশ্চিত করে যে, প্রয়োগের অর্থে সৃজনশীলতা হচ্ছে প্রযুক্তি দ্বারা আলোকিত। কোন্ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যে? কোন সীমা আছে কি? কিছু পশ্চিমা বুদ্ধিজীবী দাবি করেন যে, জ্ঞান নিজের ওপর সীমা আরোপ করতে পারে না। অন্যদিকে, মাত্র

---

২০৪ প্রাগুক্ত।

২০৫ Rober : W. Weisberg : Creativity and Knowledge : A Challenge to Theories (Handbook of Creativity) pp. 226-250.

www.pathagar.com

কয়েকজন সচেতন এবং সতর্কতামূলক সংবাদ পাঠানো শুরু করেছেন। সৃজনশীলতা অনুপলব্ধিকৃত পূর্ণাঙ্গতার অবিমিশ্র অনুভূতির আকুল আকাঙ্ক্ষা হতে উদ্ভূত। এটি নিজের সাথে নিয়ে আসে বস্তুর অতৃপ্তি যেমন তেমনি, এবং একটি উদ্যম তাদেরকে সংস্কারের জন্য মহান করতে অথবা এমনকি বর্তমানে বিরাজমান অবস্থার প্রতিবন্ধকতা হতে তাদেরকে মুক্তি দিতে, অথবা প্রকৃত বিশ্বকে ভাবগত বিশ্বের উপযোগী/অনুরূপ করার জন্য[২০৬]।

তারপর তিনি সমাপ্তি টানেন : সভ্যতার বিকাশ ঘটে এবং তা সতেজ থাকে মানবিয় সৃজনশীলতার শক্তি ও কৌশলের মধ্যে। সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিসমষ্টি সৃজনশীল হতে পারে। কিন্তু সত্যিকার সভ্যতা চায় যে, তাদের ধ্যান-ধারণা সমাজে এমনভাবে গৃহীত হোক যার ফলে, দৃষ্টান্ত স্বরূপ, লিখিত যোগাযোগ মানসম্পন্ন হয়ে উঠবে, একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি হবে যা ব্যবসায়কে সমর্থন জোগাবে এবং রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ এনে দেবে। নগর জীবনে স্থিতি দান করে, নেতাদের দ্বারা শাসিত হয় যারা সমাজ-অন্তর্গত বিভিন্ন অংশের রীতিনীতিকে গ্রন্থিত করে; এবং সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, স্থান তৈরি হয় বৈচিত্রপূর্ণ, বহুমুখী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য। এমন কাঠামোর দ্বারা সৃজনশীল নাগরিকদের মধ্যে কলা ও বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ব্যবসায় এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়।

সামাজিক দায়িত্বের বাধাবিপত্তি ব্যতিরেকে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত সৃজনশীলতার অন্ধকার দিক রয়েছে বৈপ্লবিক স্বায়ত্বশাসন অনুসন্ধানের মধ্যে । নিশ্চিত হওয়ার জন্য, জ্ঞানের উদাসীন প্রয়াস মৌলিক গবেষণার জন্য সংকটপূর্ণ। কিন্তু উদাসীন অর্থ হচ্ছে সংস্কার হতে মুক্ত; এটা গতানুগতিকতার ইঙ্গিত দেয় না। হিটলারের তৃতীয় রাইখের নাজী বিজ্ঞানীরা যখন কোনো প্রকার সংকীর্ণতা ছাড়াই তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে রাখলেন, তাদের মতোই লক্ষ লক্ষ মানুষকে অত্যাচার ও ধ্বংস করতে প্রস্তুত হয়ে, তারা মানব জাতির প্রতি তাদের প্রয়োজনীয় কর্তব্যবোধ বিসর্জন দিয়েছিলেন। কারো ভাইয়ের রক্ষক হওয়ার ধারণা হচ্ছে একটি অধিবিদ্যাগত বিষয়, কিন্তু যদি কোনো কিছু অস্বীকৃত হয় তাহলে মানবিয় উদ্যোগে ভয়াবহ ধ্বংস নিয়ে আসবে এবং বস্তুত গ্রহের অস্তিত্বেও।

১৯৯৩ সালে শিকাগোতে পৃথিবীর সকল ধর্মের সংসদের সভা হওয়ার পূর্বে পৃথিবীর নৈতিকতার দিকে শীর্ষক একটি দলিল তৈরি করা হয় এবং দুনিয়ার প্রত্যেক বৃহৎ

---

[২০৬] Rober : B. Mc Larent Dark Side of Creativityt Encyclopedia of Creativity, খণ্ড ১, p. 484

www.pathagar.com

ধর্মীয় গোষ্ঠীর পক্ষে ১৪৫ জন প্রতিনিধি এতে স্বাক্ষর করেন। এতে এ নিশ্চয়তা দেওয়া হয় যে, পৃথিবী উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে এবং আমাদের সৃজনশীল শক্তির অপব্যবহারকে এবং পৃথিবীর পরিবেশ ব্যবস্থাকে নিন্দা করে, পাশাপাশি দারিদ্র, অবিচার, এবং যুদ্ধ বিগ্রহকেও যা এগুলোকে ডেকে আনে। এই দলিল মানবজাতির আন্তঃনির্ভরশীলতার নিশ্চয়তা দেয় এবং আমাদের সকলকে আহ্বান জানায়, অন্যান্য জিনিসের মধ্যে মানুষের মর্যাদা, ব্যক্তি অধিকার এবং স্বাধীনতার সত্য সন্ধানে আমাদের কর্তব্য সৃজনশীল পথে পরিপূরণে[২০৭]।

৪. সৃজনশীলতা অধ্যয়নে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শুরুতে গুইলফোর্ড (১৯৫০), তার এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকা (এপিএ) এর সভাপতির ভাষণে, মনোবিজ্ঞানীদেরকে মোকাবেলা করে মনোযোগ দিতে বলেন সেদিকে যা তিনি দেখতে পেয়েছেন অবহেলিত অথচ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে, নাম সৃজনশীলতা। গুইলফোর্ড প্রতিবেদন দেন যে মনোবিজ্ঞানমূলক তালিকাভুক্ত সংক্ষিপ্তসারের ০.২% এর কম সংখ্যক ১৯৫০ পর্যন্ত সৃজনশীলতার ওপর আলোকপাত করেছে[২০৮]। তারপর থেকেই সৃজনশীলতা বিষয়ক গবেষণায় আগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এসব কাজের মধ্যে অনেক বিষয়ে উপস্থাপনা ছিল : অতীন্দ্রিয়বাদী, বাস্তবধর্মী, মনোগতিময়তা, মনোপরিমাপক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সমাজ-ব্যক্তিত্ব, এবং সম্মিলিত উপস্থাপনা[২০৯]।

এগুলোর মধ্যে, দুটি মূল্যায়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমটি সৃজনশীলতা গবেষণা সম্পর্কে অতীন্দ্রিয়বাদী ভাবধারার বিজ্ঞানভিত্তিক মনোবিজ্ঞানীদের শ্রবণের জন্য কঠিনতর করে তুলেছে। একজন সৃজনশীল ব্যক্তিকে শূন্য পাত্র হিসেবে দেখা হয়েছে যা সে ঐশী সত্তার প্রেরণা দ্বারা পূর্ণ করবে। ব্যক্তি অতঃপর অনুপ্রেরণা হতে প্রাপ্ত ভাবধারাকে অন্য জাগতিক বস্তু হিসেবে ছড়িয়ে দেবে। দ্বিতীয়টি, সৃজনশীলতার বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার ক্ষেত্রে সমভাবে ক্ষতিকর, গ্রন্থকারদের দৃষ্টিতে তারা জনমনের ক্ষেত্র গ্রহণ করেছে যারা প্রয়োগবাদী ধারণার অনুসারী। এ

---

[২০৭] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৯১।

[২০৮] Rober : J. Sternberg andtodd I. Lubart; the Concept of Creativityt Prospects and Paradigms. P - 3. Handbook of Creativity (1999), edited by Robrt J. Stenberg. (URT Cambridge University Press)

[২০৯] প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

ধারণা গ্রহণকারীগণ প্রাথমিকভাবে সৃজনশীলতা উন্নয়নের সাথে এবং দ্বিতীয়ত এটা বোঝার সাথে সংশ্লিষ্ট। কিন্তু এ সম্বন্ধে তাদের ধারণার বৈধতা যাচাইয়ে সংশ্লিষ্ট নয়। সম্ভবত এডওয়ার্ড ডি বোনোই এই ধারণার সর্বপ্রথম সমর্থক, পার্শ্বগত চিন্তন এবং সৃজনশীলতার অন্যান্য দিক সম্বন্ধে যার বিবেচনাযোগ্য বাণিজ্যিক সফলতা রয়েছে। ডি বোনো'র সংশ্লিষ্টতা তত্ত্বের সাথে নয়, কাজের সাথে। এই উদ্যোগে ডি বোনো একা নন। অসবর্ণ (১৯৫৩), এজেন্সীর প্রচারণায় তার অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে চিন্তা ঝঞ্ঝার কৌশল গ্রহণে লোকদের জন্য অনেক সম্ভাব্য সমাধানের সন্ধান করে সৃজনশীলভাবে সমস্যা সমাধানে উৎসাহিত করেন এমন পরিবেশে যা সংকটপূর্ণ ও দমনমূলক না হয়ে বরং গঠনমূলক। গর্ডন (১৯৬১)ও সিনেকটিক নামক পদ্ধতির মাধ্যমে সৃজনশীল চিন্তাকে উদ্দীপিত করেন, প্রাথমিকভাবে যার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।

অতি সম্প্রতি, এডামস্ (১৯৭৪/১৯৮৬) এবং ডন ওয়েক (১৯৮৩) এর মতো লেখকগণ স্মরণ করিয়ে দেন যে, লোকেরা প্রায়ই মিথ্যা বিশ্বাসের সিরিজ তৈরি করে যা সৃজনশীল কার্যের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু লোক বিশ্বাস করে যে, জবাব কেবল একটিই রয়েছে এবং যখনই সম্ভব অবশ্য দ্ব্যর্থতা এড়াতে হবে। লোকেরা এসব মানসিক বাধা চিহ্নিত করে ও সরিয়ে দিয়ে সৃজনশীল হতে পারে। এছাড়াও, ভন ওয়েক (১৯৮৬) পরামর্শ দেন যে, আমাদের সৃজনশীল উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার জন্য উদ্ভাবক, শিল্পী, বিচারক এবং যোদ্ধাদের ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর যথেষ্ট জনদৃশ্যমানতা ছিল। এবং তা এতটাই যে, লিও বাসকাগালিয়া দৃশ্যমানতা এনেছেন ভালোবাসা অধ্যয়নের ক্ষেত্রে এবং এটা বেশ উপকারীও হতে পারে। যাহোক, মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিকোণ হতে, এসব দৃষ্টিভঙ্গি কোনো গুরুতর মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কোনোপ্রকার ভিত্তির অভাব ঘটাতে পারে। সেই সাথে সেগুলোকে বৈধ করতে গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবসম্মত উদ্যোগও। অবশ্যই, মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্বে অনুপস্থিতি অথবা বৈধকরণে কৌশল কাজ করতে পারে। তা সত্ত্বেও, এসব দৃষ্টিভঙ্গির ফল প্রায়ই হয় বাণিজ্যিকিকরণের সাথে লোকেদের কোনো প্রপঞ্চের সাথে রেখে দেওয়া এবং এটাকে দেখা হয় মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টার চেয়ে স্বল্পতর হিসেবে[২১০]।

---

[২১০] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪-৬।

www.pathagar.com

এমন যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে উল্লিখিত লেখকগণ কর্তৃক শ্রেণিবদ্ধকরণ বা বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির ফলে লেবেল ব্যবহার নিম্নলিখিত কারণে ব্যক্তিগত মতামতের ওপর ভিত্তিশীল :

১. এসব গ্রন্থকার সেভাবে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে বিবেচনা করেন না।

২. মূল্যায়ন ও বিচার আনুপর্বিক আলোচনাভিত্তিক নয়। কারণ ব্যক্তি সহজে গোটা নতুন ধারণা একটি সংক্ষিপ্ত প্যারার মধ্যে প্রকাশ করতে এবং দশটিতে একটি সমন্বয়মূলক স্থান নির্ধারক কৌশল দক্ষতা (CORT) নির্বাচন করতে পারে না এবং দৃষ্টিভঙ্গির মূল্যায়নের উদ্দ্যেশ্যে এর বর্ণনাও দিতে পারে না।

৩. ডি বোনো'র অধিবেশনগুলোর প্রকৃতি নির্বাহী, ব্যবস্থাপক এবং ব্যবসায় কোম্পানিগুলোর জন্য এবং তার অধিকাংশ সৃজনশীল চিন্তা হাতিয়ারের প্রয়োগ ঐ পরিধির মধ্যেই। তবে তার সামাজিক পরিমণ্ডলে যেমন তার বই ডিকনফ্লেক্ট এ আরো কিছু প্রয়োগ রয়েছে।

৪. এটি তত্ত্বভিত্তিক নয়, এমন দাবি সত্য নয়। এটা মনের প্রক্রিয়াভিত্তিক কাঠামো ব্যবস্থা এবং কিভাবে ধারণা গঠিত, স্বীকৃত, ব্যবহৃত ও পরিবর্তিত হয় তার ভিত্তিতে এর উদ্ভব।

৫. দেখতে মনে হয় এই মতামত প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্রের। এটা হতে পারে ডি বোনো কর্তৃক পাশ্চাত্য চিন্তাধারার অবিরাম সমালোচনার ফলে যুক্তি ভিত্তিক এবং নেতিবাচক যুক্তিবাদী পদ্ধতি গত ২,৫০০ বছর ধরে প্রভাবিত। ডি বোনো জাপানী মানচিত্র তৈরির শৈলীকে সমর্থন করেন।

অনেক পৃথক পদ্ধতিতে দৃষ্টিভঙ্গিকে লেবেলযুক্ত ও শ্রেণিবদ্ধ করা যায়। সৃজনশীলতা: তত্ত্ব ও গবেষণা শীর্ষক তার গ্রন্থে ব্লুমবার্গ (১৯৭৩) পুন : উপস্থাপিত প্রবন্ধসমূহকে সাতটি তত্ত্বে গোষ্ঠীবদ্ধ করেন। এর মধ্যে রয়েছে মনোবিশ্লেষণাত্মক তত্ত্ব, মানবিয়তা তত্ত্ব, পরিবেশগত তত্ত্ব, সমিতিবদ্ধতা তত্ত্ব, উপাদানগত তত্ত্ব, ধারণক্ষম-উন্নয়নমূলক তত্ত্ব এবং সামগ্রিকতা তত্ত্ব[২১১]।

---

[২১১] Frontiers of Creativity Research, পৃষ্ঠা ১২৬।

www.pathagar.com

সৃজনশীলতার সারগ্রন্থ পুস্তকে অন্যান্য তত্ত্ব উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন- হিসট্রোমেট্রিক, বাস্তববাদী, গতানুগতিক প্রতিষ্ঠানগত, পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান, ডারউইনীয় তত্ত্ব, সামাজিক মনোবৈজ্ঞানিক প্রেক্ষিত, বিনিয়োগ প্রেক্ষিত এবং আধুনিক বুদ্ধিমত্তা বিজ্ঞান।

৫. সৃজনশীলতার ওপর গবেষণা কর্মের মূল্যায়ন

শুরু হতেই ব্যক্তির উচিত হবে সম্প্রতি সৃজনশীলতার উপর গবেষণা কর্মে বিনিয়োগের জন্য যে বিশাল প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে তার স্বীকৃতি দেওয়া। বহু বিষয়ভিত্তিক তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে অনেক গবেষণা করা হয়েছে। এটি সৃজনশীলতায় ক্রমবর্ধমান আগ্রহ সৃষ্টি করেছে। তবে, অনেক মৌলিক সমস্যাই সমাধানের মুখ দেখেনি। এসব সমস্যার একটি হচ্ছে সৃজনশীল মেধা চিহ্নিতকরণ বা মূল্যায়নের বিষয়। এযাবত, সৃজনশীলতার কোনো সুনির্দিষ্ট বর্ণনাও দেওয়া হয়নি। এ ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন না করেই সৃজনশীলতা এবং কিভাবে এর লালন হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট, স্থিত এবং কার্যকর জবাব পাওয়া অনেক প্রশ্নের ক্ষেত্রেই অসম্ভব। সৃজনশীলতা গবেষণা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান কতকগুলো প্রশ্ন নির্ধারণ করেছে যা যেকোনো সৃজনশীল মূল্যায়নের জন্য অপরিহার্য। এসব প্রশ্নের মধ্যে রয়েছে; সৃজনশীলতা কি? ব্যক্তির মধ্যে কিভাবে এর উন্নয়ন ঘটে? কোন ব্যক্তিগত ও সামাজিক উৎস হতে এর উৎপত্তি? স্তর বা শৈলীর ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা গোষ্টীর ভিন্নতা কিভাবে হয়? অন্য কোন বুদ্ধিমত্তা ও ব্যক্তিত্ব চলকের সাথে সৃজনশীলতা গুরুত্বপূর্ণভাবে সম্পর্কিত? কোন পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ বা শিক্ষামূলক পদ্ধতি দ্বারা সৃজনশীল আচরণ লালন বা বৃদ্ধি করা যায়? এসব প্রশ্নের উত্তর এবং অন্যান্য একই রকম অনেক মৌলিক ও কার্যগত সমস্যার উত্তর পেতে আমাদের সামর্থ্য বহুলাংশে নির্ভর করে সৃজনশীলতা মূল্যায়নে সমস্যা সমাধানের উপর[২১২]।

সৃজনশীলতা মূল্যায়নে গৃহীত সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, গবেষকদের জন্য একটা ভয়ানক সমস্যা থেকেই যায়। এখনও পর্যন্ত সৃজনশীলতার একটি সাধারণ, একক ও একীভূত তত্ত্ব নেই, যা থেকে মূল্যায়নের একটি ব্যাপক তত্ত্বের ভিত্তি হিসেবে একটি সংজ্ঞা প্রণয়ন করা যায়। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের ভোগান্তি হয়, সংজ্ঞার তত্ত্ব ও

---

[২১২] Scott G. Isaksen (ed.), Frontiers of Creativity Research (Bearly Limited), পৃষ্ঠা ১০৩।

www.pathagar.com

অভাবের কারণে যতটা নয়, বরং এদের প্রাচুর্যের জন্য। সম্ভবত এই বৈচিত্র গবেষণা সমস্যা হিসেবে সৃজনশীলতা সম্পর্কে আগ্রহের অভিনবত্বের একটি বিশুদ্ধ লক্ষণ। অথবা, সম্ভবত, যেমনটি ডেসী ও ম্যাডাউস বলেছেন, সৃজনশীলতার নিজস্ব জটিলতাই এর প্রতি সর্বজনীনভাবে সমর্থনযোগ্য সংজ্ঞার বিরুদ্ধতা প্রশমিত করে[২১৩]।

অন্যদিকে, সৃজনশীলতা তত্ত্ব সম্প্রতি এ পরামর্শ সহযোগে গবেষণা সূত্রাদিকে সমন্বয় করছে যে, সৃজনশীলতা নির্দিষ্ট কর্মকেন্দ্রিক। যাহোক, ক্ষেত্র বিশেষীকরণ তত্ত্ব চালু হওয়ার ফলে, সৃজনশীলতা মূল্যায়নে একটি নতুন চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হয়েছে। এ তত্ত্বের বক্তব্য অনুযায়ী, ইন্দ্রিয়জাত অনুভূতির উন্নয়ন জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবেই ছড়িয়ে যায়, যেমন- ভাষাগত, শিল্পসংক্রান্ত, সঙ্গীত বিষয়ক, এবং গাণিতিক জ্ঞান। তেমনি, কৌশল ও বোঝাপড়া যা প্রত্যেক ক্ষেত্রের সফল ভূমিকা পালনের মধ্যে নিহিত রয়েছে তা স্পষ্ট ও অন্যান্য ক্ষেত্রের কেন্দ্রীয় উপলব্ধির জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার সাথে সম্পর্কহীন। তা সত্ত্বেও বিকাশমান প্রমাণপঞ্জি ক্ষেত্র বিশেষীকরণ তত্ত্বকে সমর্থন করে[২১৪]।

জন বায়ের হাওয়ার্ড গার্ডেনার এর বহুমুখী প্রতিভা (ভাষাগত, সঙ্গীত সম্পর্কিত, যুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত গাণিতিক, মহাশূন্যসংক্রান্ত, শরীরী ভাষা, নৈর্ব্যক্তিকতা) কে সৃজনশীলতার ক্ষেত্র বিবেচনা করেন। সৃজনশীলতা সম্বন্ধে ক্ষেত্র বিশ্লেষীকরণ তত্ত্বের প্রয়োগ হতে সৃজনশীলতা পরীক্ষণে এর সংশ্লিষ্টতা অনেক গবেষকের নিকট আরেকটি সঠিকীকরণ পরিবর্তন। ক্ষেত্র বিশেষীকরণ তত্ত্ব অনুযায়ী, কিভাবে সৃজনশীলতা মূল্যায়ন করতে হবে, তার জন্য বিদ্যমান ধারণা একটা হুমকি। যতক্ষণ পর্যন্ত সৃজনশীলতা ক্ষেত্র বিশ্লেষায়িত, সৃজনশীলতা যাচাই তার চেয়ে বেশি কঠিন। এটা এজন্য যে সৃজনশীলতা ক্ষেত্র বিশেষীকরণ তত্ত্বে সাধারণ সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতা একটি শূন্য ইমারত। সাধারণ সৃজনশীল চিন্তন অন্বেষণের পরিবর্তে, সৃজনশীলতার পরীক্ষকগণ ক্ষেত্র-বিশেষ নিয়ে রয়েছেন তা থেকে আগ্রহের ক্ষেত্র খুঁজে নিতে।

পরিধির দিক থেকে প্রশস্ততর হচ্ছে সৃজনশীলতা প্রশিক্ষণ। এটা বরং সহজে সৃজনশীলতার ক্ষেত্র বিশেষীকরণকে সমন্বিত করতে পারে। অধিকাংশ সৃজনশীলতা

---

[২১৩] প্রাগুক্ত।

[২১৪] John Bear, Domains of Creativity. Encyclopedia of Creativity, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৫৯১।

www.pathagar.com

প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধরনের কৌশল ব্যবহার করে, আড়াআড়ি বিস্তৃত হয় বিভিন্ন উপাদান ক্ষেত্রে, কাজ সম্পাদনে তারা বৈচিত্রপূর্ণ চিন্তন এবং অন্যান্য সৃজনশীল চিন্তন দক্ষতার উন্নয়ন ঘটায়। যেসব সৃজনশীলতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি একটি নিদিষ্ট ক্ষেত্রমুখী হয়, সেগুলো সহজেই তাদের প্রশিক্ষণ কর্মকাণ্ডকে ক্ষেত্রের সাথে সংযুক্ত একটিতে সীমাবদ্ধ করে। ঐসব প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সাধারণভাবে সৃজনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্য গ্রহণ করে, যা কর্মসূচির বিশাল গরিষ্ঠ অংশ গঠন করে, এক অথবা কয়েকটি উপাদান ক্ষেত্রকে তাদের প্রশিক্ষণ কাজে অনেক ক্ষেত্রের সাথে সংযুক্ত করতে উৎকর্ষ সাধন করে।

ক্ষেত্র উৎকর্ষিতকরণ তত্ত্বসমূহ, সৃজনশীলতা প্রশিক্ষণ হতে উৎপাদিত, অনেক বেশি শক্তিসম্পন্ন হবে ক্ষেত্র-বিশেষিত তত্ত্বের চেয়ে যা কেবল সৃজনশীলতার উপাদান ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে।

এ কারণে সৃজনশীলতা তত্ত্বসমূহ ঐতিহাসিকভাবে এক আকারের মধ্যে সব তত্ত্বের সমন্বয়কারী তত্ত্ব, যা সংযোজিত হয়েছে ক্ষেত্র-সন্ধানী বা ক্ষেত্র-সাধারণ সৃজনশীলতা তত্ত্বের সাথে একটি বৃহত্তর আবেদন লাভ করার উদ্দেশ্যে।

লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সৃজনশীলতার ক্ষেত্র বিশেষীকরণের দিকে গবেষণায় প্রাপ্ত প্রমাণাদির নিবদ্ধ দৃষ্টি আনকোরা নতুন এবং যে গবেষণা এর পূর্বে হয়েছে তার মতো এ গবেষণা পুরা কাহিনী না-ও বলতে পারে। যেমন ইতোমধ্যে লক্ষ্য করা হয়েছে, সৃজনশীল আচরণের স্ব-ব্যক্ত পরিমাপকসমূহ সত্যিকার সৃজনশীল উৎপাদিত বস্তুর সৃজনশীলতা মূল্যায়নের চেয়ে সৃজনশীলতার আরো সর্বজনীনতা প্রদান করেছে। এটি পুরাপুরি সম্ভব যে ক্ষেত্র বিশেষায়ন ও ক্ষেত্র সর্বজনীনতা উভয় তত্ত্বই প্রত্যেকের নিজস্ব পথে আপেক্ষিকভাবে সত্য। জরুরিভাবে প্রয়োজন হচ্ছে অধিকতর গবেষণার যা সেই অবস্থাকে স্পষ্ট করবে, যার মধ্যে সৃজনশীলতার সর্বজনীনতা ও বিশেষায়ন অধিকতর বৈধ প্রেক্ষিত। ইতোমধ্যে, উভয় অভিমতই গবেষক ও তাত্ত্বিকগণকে আবেদন জানাতে থাকবে সংযুক্তির জন্য[২১৫]।

রবার্ট স্টার্নবার্গ সমর্থন করেছেন যে, সৃজনশীলতা অধ্যয়নে বিনিয়োগকৃত সম্পদের অপ্রতুলতা ছিল। যার নেতিবাচক ফল রয়েছে সৃজনশীলতা উন্নয়নের ওপর। তারপর তিনি কয়েকটি উপাদান নির্দেশ করেন যা সৃজনশীলতার নিম্নবিনিয়োগের

---

[২১৫] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৯৫।

www.pathagar.com

পরিমাপ করবে এবং কেন নিম্নবিনিয়োগ ঘটবে তিনি তার কতকগুলো কারণ উল্লেখ করেন।

১. সৃজনশীলতা অধ্যয়নের উৎপত্তি ঘটে অতীন্দ্রিয়বাদ এবং আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি হতে, যা অভিন্ন মনে হয় এবং সময়ে বৈজ্ঞানিক চেতনার বিপরীতে চলে।

২. সৃজনশীলতার বাস্তববাদী তত্ত্ব কিছু লোকের মধ্যে এ ধারণার জন্ম দিয়েছে যে সৃজনশীলতার অধ্যয়ন এক ধরনের বাণিজ্যিকতা দ্বারা চালিত, যখন এটি তার নিজ পথেই সফল হতে পারে। এর অভাব হল মনোবিজ্ঞান তত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞান গবেষণার মাধ্যমে যাচাইকরণের।

৩. সৃজনশীলতার ওপর প্রাথমিক কার্যাবলী তত্ত্বগত ও পদ্ধতিগতভাবে বৈজ্ঞানিক মনোবিজ্ঞানের মূলধারা হতে দূরে ছিল, পরিণতি ঘটে সৃজনশীলতার মধ্যে যা কখনও সামগ্রিকভাবে মনোবিজ্ঞানের বিষয়সমূহের সীমান্তবর্তী হিসেবে দেখা যায়।

৪. সৃজনশীলতার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে সমস্যা গবেষণাকর্মে কিছু অসুবিধা সৃষ্টি করেছে। সৃজনশীলতার কাগজ-ও-পেন্সিল পরীক্ষা এসব সমস্যার কিছু সমাধান করেছে কিন্তু এ সমালোচনার দিকে চালিত করেছে যে, প্রপঞ্চকে তুচ্ছ করা হয়েছে।

৫. একক ধারণাসমূহ সৃজনশীলতাকে সাধারণ কাঠামো বা পদ্ধতির এক অসাধারণ ফল হিসেবে দেখতে সহায়ক হয়েছে। ফলে এটাকে সর্বদা সৃজনশীলতার কোনো পৃথক গবেষণা হিসেবে দেখার প্রয়োজন বোধ হয়নি। ফলে, এসব ধারণা এদের অধীনে সৃজনশীলতাকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, এমন এক বিশেষ বিষয় হিসেবে যা ইতিমধ্যেই অধীত হয়েছে।

৬. সৃজনশীলতার বিষয় বর্হিভূত ধারণা প্রপঞ্চের অংশবিশেষকে অবলোকন করতে সহায়ক হয়েছে (যেমন- সৃজনশীলতার বুদ্ধিসঞ্জাত পদ্ধতি, সৃজনশীল ব্যক্তিগণের ব্যক্তিত্ব বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি) সমগ্র প্রপঞ্চ হিসেবে, প্রায়ই পরিণতি ঘটেছে যা আমরা বিশ্বাস করি, এক সংকীর্ণ, অ-সন্তুষ্টিকর সৃজনশীলতার দর্শনের মধ্যে[২১৬]।

---

[২১৬] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২।

www.pathagar.com

এর ওপর ভিত্তি করে, অমিত গোস্বামী সৃজনশীলতার গবেষকগণ কর্তৃক প্রদত্ত তিনটি ভিন্ন বিশ্বদর্শন নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন : অধিযন্ত্রবাদী, জৈবকাঠামোগত এবং ভাবগত। অধিযন্ত্রবাদীগণ একটি বস্তুবাদী বিশ্বদর্শনের ধারক। যাতে সবকিছুই বস্তু দ্বারা গঠিত এবং যান্ত্রিকভাবে নির্ধারণমূলক, উদ্দেশ্যমূলক, অবিরাম এবং স্থানীয়। তাদের নিকট সৃজনশীলতা একটি মস্তিষ্ক (কম্পিউটার) প্রপঞ্চ। যার কোনো অতিপ্রাকৃত উৎপত্তি ঘটেনি, তবে ঐসব বিধির অধীন কাজ করে যেগুলো এখন পদার্থবিজ্ঞানীগণ আবিষ্কার করছেন। জৈবকাঠামোগত মতবাদের প্রবক্তাগণ যন্ত্রবাদীদের উপসংহারের সাথে ঐকমত্যে উপনীত হন কিন্তু এটাকে অতিক্রম করে যান। তারা বিশ্বাস করেন যে, কোনো কিছুর যন্ত্রবৎ প্রকৃতির সাথে, সমগ্র জীবকোষের তাৎপর্য রয়েছে এবং রয়েছে উপকরণ যা দ্বারা সবকিছুর বিকাশ ঘটে। ভাববাদীগণ বিশ্বাস করেন যে, এটা হচ্ছে সচেতনতা, বস্তু নয়, যা সৃষ্টির জগতে প্রাথমিক এবং সৃজনশীলতা মৌলিকভাবে বিষয়ভিত্তিক।

পরবর্তীতে, এক নতুন তত্ত্ব ঐ তিন তত্ত্বকে সংযুক্ত করে বিকশিত হয়, নাম : সৃজনশীলতার কোয়ান্টাম তত্ত্ব। এ তত্ত্বমূলে, সৃজনশীলতার নতুন শ্রেণিবিভাজন করা হয়েছিল : মৌলিক এবং অবস্থাগত সৃজনশীলতা একদিকে, এবং অন্যদিকে বহিঃস্থ ও অন্তঃস্থ সৃজনশীলতা। মৌলিক সৃজনশীলতা একটি নতুন অর্থের প্রেক্ষাপটে নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টির কথা বলে। অবস্থাগত সৃজনশীলতা পুরাতন প্রেক্ষাপটে বা প্রেক্ষাপট গুচ্ছের মধ্যে নতুন ধারণার ভিত্তিতে মূল্যবোধ তৈরির কথা বলে। বহিঃস্থ সৃজনশীলতা বাহ্যিক প্রচেষ্টা যেমন- বিজ্ঞান, সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে বহির্জগতের সৃষ্টিকর্ম নিয়ে গঠিত। এক্ষেত্রে অন্তঃস্থ সৃজনশীলতা হচ্ছে জীবনযাপনের নতুন প্রেক্ষাপট আবিষ্কার (এবং প্রকাশ), যেমন রয়েছে কাজ সম্পাদন ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে[২১৭]।

ঐ বিষয়ে এসব তত্ত্ব মূল্যায়নে মনে হয় যে, একমাত্রিক এবং লঘুকারী সৃজনশীলতার একটি দিক আলোকপাত করতে ও অন্যদিকে উপেক্ষা করতে পছন্দ করে। সৃজনশীলতা যাচাই-এর জন্য সর্বাগ্রে করণীয় যেন বুদ্ধির বৈশিষ্ট্যে সামঞ্জস্য হয়ে ক্ষেত্রটিকে সৃজনশীলতার সংকীর্ণ ও সীমিত ধারণায় চালিত করে। এগুলোর ওপর চলক কার্যকরকরণে এবং পরীক্ষামূলক নিয়ন্ত্রণের প্রয়াসের ক্ষেত্রে সৃজনশীলতার দ্বারা যে চরম সহজীকরণ বোঝায় তা মেনে নেওয়া হয়েছে।

---

[২১৭] অমিতো গোস্বামী, Quantumtheory of Creativity, Encyclopedia of Creativity, (1999), Vol. 2, p. 491-500.

www.pathagar.com

সাবলীলতা, নমনীয়তা ও মৌলিকত্বের মতো একগুচ্ছ সামর্থ্য হতে সৃজনশীলতাকে নিষিদ্ধ করার প্রবণতা উন্নয়নের একটি নিঃশেষিত ধারণায় পরিণতি লাভ করেছে, যা মনোপরিমাপন প্রেক্ষাপটে বিদ্যমান সামর্থ্য কিংবা শিক্ষণ সামর্থ্যকে বোঝায় ঐসব লোকদের ক্ষেত্রে যাদের মধ্যে এর অভাব রয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গবেষণার মধ্যে নিহিত সৃজনশীলতার ধারণাকে বিস্তৃতিকরণের প্রয়াস রয়েছে, যা এক্ষেত্রে আগ্রহ বৃদ্ধি করে চলেছে। সৃজনশীলতা সম্পর্কে নতুন গবেষণাসমূহ একটি বহুমাত্রিক মানসগঠন এবং সৃজনশীল গুণাবলীর সম্ভাবনা ও স্থায়িত্ব প্রদর্শন করেছে এসব মাত্রিকতার মধ্যে মিথস্ক্রিয়া বা সম্মিলনের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে প্রকৃত-পার্থিব সৃজনশীল গুণাবলী অর্জনে স্মরণীয় দৃষ্টান্তের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় সৃজনশীল সামর্থ্যের সাহসিকতাপূর্ণ সাধারণ অর্ন্তনিহিত বৈশিষ্ট্যের পরিমাপ এবং উন্নয়ন ক্ষেত্রে[২১৮]।

কিছু সমস্যাসংকুল বিষয় সৃজনশীলতায় ভবিষ্যত গবেষণার জন্য বিষয়ে তার রচনায় ডোনাল্ড ডব্লিউ ম্যাককিনন লক্ষ্য করেন যে, সৃজনশীলতার প্রতিটি বৃহৎ ক্ষেত্রে পরীক্ষামূলক গবেষণা কিছু আলোকসম্পাত করেছে। এগুলো হচ্ছে সৃজনশীল উৎপাদন, সৃজনশীল প্রক্রিয়া, সৃজনশীল ব্যক্তি এবং সৃজনশীল অবস্থা। তা সত্ত্বেও তার মতে এর আলোকিতকরণ হয়েছে অনিয়মিত এবং পূর্ণতা হতে দূরবর্তী। এসব দিকের প্রত্যেকটিতে সৃজনশীল দিকের কঠিন ইস্যুগুলো রয়ে গেছে যা ভবিষ্যত গবেষণার ফলাফল দ্বারা সমাধান করা যায়[২১৯]।

আরেকটি গোপন সমস্যা হলো সৃজনশীল প্রক্রিয়ার কিছু পর্যায়ে আপেক্ষিক দৈর্ঘ্য, বিশেষত লালনের পর্যায়সহ প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ের। এবং সৃষ্ট বস্তুর ব্যবহারের পর্যায়েরও[২২০]। সৃজনশীল প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরো অনেক বিষয় রয়েছে যা শিখতে হবে। অধিকাংশ অনুসন্ধানকারী এই বিশ্বাস করতে চান যে, সব ব্যক্তির ক্ষেত্রেই সৃজনশীল প্রক্রিয়া অত্যধিকভাবে একই রকম এবং এক পর্যায়ে ত্রুটি খুব সম্ভব অভিন্ন। তবে, যে প্রশ্নটি এখনো জিজ্ঞাসিত হওয়ার অপেক্ষায় তাহলো, সৃজনশীল

---

২১৮ David Henry Feldman, The Developmen : of Creativity, the Handbook of Creativity, pp. 169-186.

২১৯ Frontiers of Creativity Research, p. 120

২২০ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২২।

www.pathagar.com

প্রক্রিয়া কি ভিন্ন হতে পারে না? উদাহরণ হিসেবে গণিতবিদ, সঙ্গীতজ্ঞ, চিত্রশিল্পী, উদ্যোক্তা এবং ব্যবসায় ব্যবস্থাপকগণ কোন্ সীমানা পর্যন্ত অভিন্ন এবং কোন্ ক্ষেত্রে ভিন্ন[২২১]?

সৃজনশীল প্রক্রিয়ার অভ্যন্তরে পার্থক্য সম্বন্ধে যেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে তার অনেকগুলো বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে সৃজনশীল কর্মশৈলীর পার্থক্য বিষয়ক। বিভিন্ন প্রকার সচেতনতা, এবং বাস্তবিকভাবে বিভিন্ন ধরনের সৃজনশীল ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য বিষয়ক। কারণ বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়া বৈশিষ্ট্যগতভাবে বিশুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক নয়, তবে মূলত ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক পরিমণ্ডলে নিহিত[২২২]।

সৃজনশীলতার ওপর সাম্পতিক গবেষণায় ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্য তত্ত্বের ওপর আক্রমণ বেড়েই চলেছে আচরণের পূর্বাভাসের জন্য যথার্থ ভিত্তি প্রদানে তাদের ব্যর্থতার ফলে। যারা এই অভিমত পোষণ করেন, তারা দাবি করেন যে, আচরণ হচ্ছে অধিকতরভাবে অবস্থানগত কারণে ব্যক্তির কাজ যার মধ্যে ব্যক্তিগণ নিজেদের দেখে। এটা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের পূর্ব অনুমিত স্থায়ী প্রলক্ষণ। প্রলক্ষণ তত্ত্ব ও অবস্থানগত তত্ত্ব এদের চূড়ান্ত রূপে উভয়েই আমার বিচারে অপর্যাপ্ত। আমরা যদি আচরণের পূর্বাভাস দিতে চাই তাহলে আমাদের কাজ হবে প্রলক্ষণ ও অবস্থা উভয়কেই স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা। কিন্তু তবুও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দুই শ্রেণির চলকের মধ্যে মিথস্ক্রিয়া অধ্যয়ন করা। সৃজনশীলতা গবেষণায় এটা অবশ্যই পর্যাপ্ত পরিমাণে করা হয়নি। পরীক্ষামূলক ভাবে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় নৈর্ব্যক্তিক এবং সামাজিক সম্পর্কের ভূমিকাকে সহজতর করা ও বাধাদান সংক্রান্ত ভবিষ্যত গবেষণার জন্য নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করতে হবে এবং এ ধরনের অনুসন্ধান কাজের জন্য একটি আদর্শ মূল্যায়ন কেন্দ্র প্রয়োজন[২২৩]।

শিক্ষাগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক উপাদানসমূহ সৃষ্টিধর্মী শক্তিকে সহায়তা দান বা বাধাদানে আমাদের পর্যাপ্ত উপলব্ধির পূর্বে প্রচুর গবেষণার প্রয়োজন রয়েই গেছে। যদি এই প্রশ্নের পূর্ণ জবাব পাওয়া সম্ভব হয় তাহলে সৃজনশীলতা অধ্যয়ন হবে আড়াআড়ি-সাংস্কৃতিক। এটা সত্য যে, অন্যান্য অনেক উন্নত দেশে সৃজনশীলতা দীর্ঘ পথ বেয়ে এসেছে এর গঠন পদ্ধতির পার্থক্য সত্ত্বেও। তাহলে অধিকতর

---

[২২১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২৪।

[২২২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২৫।

[২২৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২৭।

www.pathagar.com

পশ্চাৎমুখী (আদিম) ও অনুন্নত দেশে সৃজনশীলতা সম্বন্ধে কি বলতে হবে? ইউরোপীয় ও আমেরিকান মনোবিজ্ঞানীদের দ্বারা সাধারণভাবে সমর্থিত সৃজনশীলতার সংজ্ঞা কি অন্যান্য সমাজ ও সংস্কৃতিতে বৈধ হবে? একজন অধ্যাপকের একটি গল্প রয়েছে যিনি আফ্রিকার গোত্রসমূহে স্বভাবগতভাবে প্রকাশিত সৃজনশীলতা অধ্যয়ন করতে চেয়েছিলেন। তার গবেষণার অংশবিশেষ ছিল চারটি ভিন্ন ধরনের সংস্কৃতি চিহ্নিত করা, যার মধ্যে দুটোকে তিনি সৃজনশীল লেবেলযুক্ত হওয়ার যোগ্য মনে করেন এবং অন্য দুটিকে আপেক্ষিকভাবে অসৃজনশীল সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্বমূলক সাব্যস্ত করেন। এক বছর ধরে ইয়েলে আন্তঃছেদী সংস্কৃতির নথি গবেষণার পর তিনি চারটি গোত্রকে অধ্যয়নের জন্য সংগ্রহ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তার প্রকল্পিত গবেষণার জন্য অদ্যাবধি তহবিল বরাদ্দ হয়নি। এমন একটা গবেষণা, যদি যথাযথভাবে পরিচালিত হতো, তাহলে আমি মনে করি, সৃজনশীলতা ঠিক কি এবং এটি কিভাবে নিজেকে বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে প্রকাশিত করে সে সম্বন্ধে পুনর্ভাবনার প্রয়োজন হতো[২২৪]।

তাঁর প্রবন্ধে, রিচার্ড ই. রিপ্‌ল নিম্নলিখিত প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন : শিক্ষামূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি, মালমশলা, কৌশল, অথবা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কি সৃজনশীলতার উন্নয়ন ঘটান যায়? অনেক পণ্ডিতই এটা সম্ভব মনে করেন, কিন্তু এই দাবিকে ঘিরে অনেক মত পার্থক্য রয়ে গেছে। সুনির্দিষ্টতার সাথে এই দাবিকে সমর্থন করা অপরিপক্ক হবে। উত্থাপিত এই প্রশ্নের জবাব সৃজনশীলতা সম্পর্কিত ধারণার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত। কেউ কেউ এই সিদ্ধান্তে আসেন যে শিক্ষাদান মালমশলা, প্রক্রিয়া এবং কৌশলের ব্যবস্থিত ব্যবহারের মাধ্যমে সৃজনশীলতা শিক্ষা দেওয়া সম্ভব। অন্যদের যুক্তি হলো সৃজনশীলতাকে বৃদ্ধি করা সম্ভব। সর্বোৎকৃষ্ট যা আমরা করতে পারি তা হচ্ছে এর উন্নয়ন ও প্রকাশের নিষিদ্ধতাকে এড়িয়ে যাওয়া[২২৫]।

৬. পার্শ্বগত চিন্তনের উদ্ভব

সৃজনশীলতা-র ইস্যুর সূচনা ঘটে ভাবধারা সৃষ্টির তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তার মধ্য দিয়ে। এলেক্স অসবর্ণ, চিন্তাঝঞ্ঝার উদ্যোক্তা হিসেবে নতুন ভাবধারা সৃষ্টিতে ব্যবহৃত বিশেষ দক্ষতা যেখানে উন্নত করা প্রয়োজন সেদিকে দৃষ্টিপাত করেন। তাঁর

---

[২২৪] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২৮-১২৯।

[২২৫] "Teaching Creativity", Encyclopedia of Creativity, Vol. 2, p. 630.

www.pathagar.com

চমকপ্রদ গ্রন্থ ফলিত কল্পনা (Applied Imagination)[২২৬] এর মধ্যে তিনি অনেকগুলো দক্ষতার তালিকা তৈরি করেন যাকে স্কট আইজাকসেন (১৯৮৫) SCAMPER[227] নামে সংকেতাবদ্ধ করেন। যার প্রতিটি বর্ণের অবস্থান এরূপ : S = Substitute (বিকল্প), C = Combine (সংযুক্তকরণ), A = Adapt (উপযোগীকরা), M = Magnify/Minify/Modify) (বিবর্ধিত করা/ক্ষুদ্রাকার করা/সংশোধন করা), P = Put into other uses (অন্য কাজে লাগান), E = Eliminate (দূরীভূত করা), এবং R = Reverse/rearrange (উল্টানো/পুনর্বিন্যাস)।

এমন যুক্তি দেখান যায় যে, এডওয়ার্ড ডি বোনো এসবের কতক কৌশল ব্যবহার করেছেন, সেগুলোর উন্নয়ন করেছেন এবং তারপর তার পার্শ্বগত চিন্তন হাতিয়ার বিকশিত করেছেন। ১৯৭৪ সালে, প্রফেসর জেমস্ এডামস-যিনি একজন যন্ত্রপ্রকৌশলী-সৃজনশীল চিন্তায় ধারণাগঠন ও প্রত্যক্ষকরণের (conceptualization and visualization) প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করেন। এমনটা করতে সমর্থ হয়ে ব্যক্তিকে ইন্দ্রিয়জ (Perceptual) আবেগময় (Emotional), পরিবেশগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক মানসিক বাধা অপসারণে ভূমিকা রাখতে হবে[২২৮]।

ডি বোনো বর্ণনা করেন যে : চব্বিশ শতক যাবত আমরা আমাদের সকল বুদ্ধিবৃত্তিক প্রচেষ্টা ধারণার যুক্তিবিদ্যার পরিবর্তে যুক্তির যুক্তিবিদ্যা (Logic of reason) এ নিয়োজিত করেছি। তথাপি মানব বিষয়াদি পরিচালনায় ধারণা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ[২২৯]। এর ফলে, পাশ্চাত্য চিন্তায়, সমালোচনামূলক চিন্তনে অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। যে কেউ যিনি তার চিন্তায় যুক্তিবিদ্যায় ভুল করেন তিনি দরিদ্র চিন্তাশীল বিবেচিত হন : ধারণায় ত্রুটি ক্বচিৎ দেখা যায়, সেগুলো বেশি করে সয়ে নেওয়া হয়[২৩০]। তারপর তিনি বলতে থাকেন : চিন্তায় কেবল ভুলত্রুটি অপনোদনই চিন্তার উৎপাদনশীল, গঠনমূলক এবং সৃজনশীল দিক সরবরাহ করে না। ভুলত্রুটি

---

২২৬ Osborn, Alex : Applied Imagination, (1953), 3rd Edition.

২২৭ Isaksen, Scott and treffinger, Donaldt Creative Problem Solving, (1985), (Buffalo, New York : Bearly Limited), p. 105

২২৮ বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন (Conceptual Blockbusting) USA : Addison Wesley Publishing Company.

২২৯ De Bono : I am Righ : You Are Wrong, Penguin Books, 1991.

২৩০ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৬৪।

www.pathagar.com

দূর করা নিঃসন্দেহে মূল্যবান কাজ, কিন্তু এটা প্রক্রিয়ার একটা অংশ মাত্র- সম্ভবত চিন্তনের এক তৃতীয়াংশের বেশি নয়, বা কম। তা সত্ত্বেও আমরা সবসময়ই অতি উচ্চভাবে সমালোচনামূলক চিন্তার মূল্য দিয়েছি[২৩১]।

ডি বোনো বিশ্বাস করেন যে, উপলব্ধি হচ্ছে চিন্তনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং চিন্তনের যুক্তিসংগত বিতর্কমূলক অংশ সর্বদাই অবহেলিত হওয়ায় চিন্তনের অধিকাংশ ভুলই হয় উপলব্ধির পর্যায়ে। উপলব্ধির পরিবর্তন ও নকশা বদল হচ্ছে নতুন দৃষ্টিসঞ্জাত চিন্তনের প্রধান বিষয়। একটি পরিভাষা যা তিনি আবিষ্কার করেছেন এবং তা ইংরেজি অভিধানে ইতোমধ্যেই যুক্ত হয়েছে। প্যাটার্ন/নকশা বলতে বোঝায় স্মরণের উপরিভাগে অর্থাৎ মনে তথ্য বিন্যস্তকরণ। নতুন দৃষ্টিসঞ্জাত বা পার্শ্বগত চিন্তন বিন্যাসকে বিভিন্নভাবে জিনিসগুলোকে একত্রে রেখে পুনঃকাঠামোধীন করতে চেষ্টা করে যাতে তথ্যের সর্বোত্তম ব্যবহার করা যায় এবং আরো উন্নত ও কার্যকর বিন্যাস/প্যাটার্ন পাওয়া যায়। এছাড়া তথ্য ব্যবহারকারী পদ্ধতি হিসেবে নতুন দৃষ্টিসঞ্জাত চিন্তনও একটি মনোভাব যা মোকাবেলা করে ঐ অনুমানের যে, এই মুহূর্তে যা সুবিধাজনক প্যাটার্ন এমন বস্তুর প্রতি প্রয়োজনীয় হিসেবে বিশেষ পদ্ধতিতে দৃষ্টিপাত করে, কিন্তু তা অনন্য নয়, অবিমিশ্রও নয়। এই মনোভাব রক্ষণশীলতা ও অন্ধমতের রূঢ়তার বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে। কিছু বিশেষ কৌশল রয়েছে যা পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা যায়। নতুন দৃষ্টিসঞ্জাত চিন্তনের দুটি কাজ রয়েছে। একটি উত্তেজক ও অনুমতিদায়ক কাজ যাতে একটি নতুন পদ্ধতি তথ্যসমূহকে একত্রে রেখে তথ্যের অযৌক্তিক বিন্যাস অনুমোদন করে। নতুন দৃষ্টিসঞ্জাত চিন্তনের দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে মুক্ত করার কাজ। নতুন পুরাতন প্যাটার্নকে বাধাগ্রস্ত করে নতুন পথে বন্দী তথ্যকে একত্রে আসার অনুমতি দেওয়া। লেটারাল থিংকিং পুস্তকে ডি বোনো যেসব কৌশলের উদ্ভব ঘটিয়েছেন তা হচ্ছে : অনুমানের মোকাবেলা, উপাদান পৃথকীকরণ, পশ্চাৎ দিকে প্রেরণ পদ্ধতি, মস্তিষ্কঝঞ্ঝা, অনুসিদ্ধান্তসমূহ, প্রবেশস্থল ও মনোযোগ এলাকা বাছাই, দৈব উদ্দীপ্তকরণ, এবং নতুন ধরন সৃষ্টি করা, লেবেল, ধারণাসমূহ, বিভাগসমূহ অথবা এগুলো নিয়ে কাজ করা।

তার গ্রন্থ ভয়ংকর সৃজনশীলতা'য় তিনি আরো নতুন দৃষ্টিসঞ্জাত কৌশল অংকন করেন এবং পূর্ববর্তীগুলোকে উন্নত করেন এভাবে যে গ্রন্থটি সৃজনশীল চিন্তা

---

[২৩১] প্রাগুক্ত।

www.pathagar.com

সংক্রান্তা। তিনি তিন প্রকার হাতিয়ারের পরিচয় দেন : প্রথম গুচ্ছটি হচ্ছে সরল গুচ্ছ যার মধ্যে সৃজনশীল বিরতি, আলোকসম্পাত, মোকাবেলা, বিকল্পসমূহ, এবং ধারণা অনুগামী হয়ে রয়েছে। দ্বিতীয় গুচ্ছটি হচ্ছে সুব্যবস্থিত হাতিয়ারের সমন্বয় যাতে রয়েছে উত্তেজন ও বিচলন, এবং দৈব উপকরণ। তৃতীয় গুচ্ছের হাতিয়ার হচ্ছে তাই যাকে তিনি সংবেদনশীলকরণ কৌশল বলছেন, যার মধ্যে রয়েছে সোপানসমূহ (স্তর বা পর্যায় নির্দেশ করে এমনকিছু), এবং আঁশ কৌশল।

সবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে উত্তেজন ও বিচলন হাতিয়ার যার ওপর ডি বোনো সর্বদা জোর দেন[২৩২]। এটিই হচ্ছে নতুন দৃষ্টিসঞ্জাত কৌশলের সবকিছু। একগুচ্ছ কৌশল রয়েছে যা চিন্তাকারীকে চিন্তনের স্বাভাবিক পথ রোধ করে অন্য বিকল্প খুঁজতে সমর্থ করে। উত্তেজন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে অস্থায়ীভাবে একই সময় ত্রিশ সেকেন্ডের জন্য নিয়ন্ত্রণযোগ্য উপায়ে পাগল করায়, এমন এক বক্তব্যের দিকে নিয়ে যায় যা উদ্ভট, অদ্ভুত, অযৌক্তিক ও অসিদ্ধ। উদ্দেশ্যমূলকভাবে এটা করে এটাকে কিছু সময়ের জন্য সহ্য ও সমর্থন করার প্রয়োজন হয়। একটি নকশাকরা দৃশ্যপট হিসেবে, যা উত্তম পছন্দ ও বিকল্প গন্তব্যে নতুন রাজপথ খুলে দেয়। বক্তব্যকে একটি উত্তেজন বলে বিবেচনা করা এবং এটাকে সমালোচনামূলক বিচার/রায় হতে রক্ষা করার জন্য ডি বোনো একটি নতুন প্রতীক আবিষ্কার করেছেন যাকে উত্তেজক কাজ বলে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে (পি ও- উত্তেজক কাজ)। যা আপনি উন্নত করতে, অর্জন ও সমাধান করতে চান সেক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল আলোকপাত দিয়ে শুরু করে এ প্রক্রিয়া দুটো স্তর অতিক্রম করে : উত্তেজন বিন্যাসকরণ ও বিচলন দক্ষতা।

১. উত্তেজন বিন্যস্তকরণ : উত্তেজন বিন্যাসকরণে পাঁচটি ব্যবস্থিত দক্ষতা রয়েছে :

ক. পলায়ন পদ্ধতি : এটি একটি সরল ও সোজাসাপটা পথ। যে কোনো অবস্থায় অনেকগুলো স্বাভাবিক জিনিস থাকে যা আমরা স্বীকৃত বলে ধরে নিই। পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে আমরা যা স্বীকৃত বলে গ্রহণ করেছি তাতে পলায়ন। এর অর্থ; বাতিলকরণ, অস্বীকার করা, ফেলে দেওয়া, সরিয়ে দেওয়া, না-মানা, অথবা যা আমরা স্বীকৃত বলে গ্রহণ করেছি তা হতে পলায়ন।

---

[২৩২] De Bono : Serious Creativity, Harper Collins Business, 1996, pp. 145-176.

www.pathagar.com

উদাহরণ : আমরা ধরে নিয়েছি যে, রেস্তোরাঁয় খাবার থাকে। PO বা উত্তেজিতকারী কাজ, রেস্তোরাঁয় খাবার নেই। পরবর্তী পদক্ষেপ হচ্ছে বিচরণ ব্যবহার করা। মুহূর্ত হতে মুহূর্ত কৌশল ব্যবহার করে আমরা একটি নতুন ধারণায় উপনীত হতে পারি যে, অভিজাত স্থান হিসেবে রেস্তোরাঁকে বনভোজনের জায়গা মনে করে : আমরা রেস্তোরাঁর খাদ্য তালিকা ধরে নিয়েছি।

খ. পাথরে পদক্ষেপ পদ্ধতি : সতর্কবাণী : ঐ উত্তেজনের উদ্দেশ্য এমন ধারণায় উপনীত হওয়া যা পূর্বে আপনার ছিল না, ইতোমধ্যে লালিত ধারণার পুনঃনিশ্চিতকরণ নয়। এটা কত ভালো তার উত্তম পরীক্ষার জন্য আপনি যা ব্যবহারে অসমর্থ তা হতে হবে ৪০%! এখানে উপ-দক্ষতাগুলো রয়েছে।

১. বিপরীতমুখী চালনা : এর অর্থ হচ্ছে স্বাভাবিক বা সচরাচর লক্ষ্যে দৃষ্টি দেওয়া যাতে কোনো কিছু করা এবং তারপর উলটো বা বিপরীত দিকে চলে যাওয়া। সতর্কতা : প্রায়ই লোকেরা মনে করে যে, কোনো কিছু ছাড়াই করা হচ্ছে একটি বৈপরীত্য। তা নয়। কোনো কিছু ছাড়াই করা হচ্ছে এক প্রকার পলায়ন।

২. অতিরঞ্জিতকরণ : এ পদ্ধতি সরাসরি পরিমাপ ও মাত্রার সাথে সম্পৃক্ত : সংখ্যা, স্পন্দন সংখ্যা, মাত্রা, তাপমাত্রা, স্থিতি এবং এমন আরো। পরিমাপের একটি সীমা রয়েছে যা যে কোনো অবস্থাতেই দেখা যায়। অতিরঞ্জন বোঝায় এমন পরিমাপকে যা স্বাভাবিক সীমার বহুদূর পর্যন্ত বাইরে গিয়ে পৌছায় যা ওপরের দিকে (বাড়তে পারে) অথবা নিচের দিকে (কমতে পারে), কিন্তু শূন্যে উপনীত হয় না কারণ এটা হবে সরল পলায়ন নিষ্কৃতি।

উদাহরণ : উত্তেজক কাজ, পুলিশের চোখ রয়েছে। ডি বোনো বলেন ১৯৭১ এর এপ্রিল মাসে নিউইয়র্ক ম্যাগাজিনে এ উত্তেজক কাজের কথা এবং নতুন ধারণা প্রতিবেশিক প্রহরা প্রদান করে। কাজ : উত্তেজক কাজ, টেলিফোন তুলতে খুব ভারী। উত্তেজক কাজ, টেলিফোন বোতামের মতো পরতে যথেষ্ট ছোট।

৩. বিকৃতকরণ : যে কোনো পরিস্থিতিতে দলসমূহের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকে। কাজের সময় স্বাভাবিক পরিণতিও থাকে। আমরা এই স্বাভাবিক

www.pathagar.com

বিন্যাসকে গ্রহণ করি এবং দোমড়ান মোচড়ান ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টির জন্য এগুলোকে পরিবর্তন করি। উত্তেজক কাজ, ডাকে দেওয়ার পর চিঠিটি বন্ধ করুন।

উত্তেজক কাজ, ছাত্ররা একে অন্যকে পরীক্ষা করে।

৪. আকাঙ্ক্ষা-পূরণার্থে চিন্তন : আমরা একটা উদ্ভট ইচ্ছা করি যদিও জানি যে এটা পাওয়া অসম্ভব। ছাত্রদেরকে সতর্ক হওয়া উচিত যে, কেবল একটি স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য বা কাজকে সামনে রাখাও খুব দুর্বল। উদাহরণ: উত্তেজক কাজ, পেন্সিলের নিজেই লেখা উচিত। কিন্তু তা নয় : খরচ অর্ধেক করার জন্য আমি এই পেন্সিলটি তৈরি করতে চাই।

কাজ : উত্তেজক কাজ, গাড়িগুলোর তাদের নিজ নিজ পার্কিং সীমিত করা উচিত।

উত্তেজক কাজ : খরিদ্দার সেজে মাল সরানো চোরেরা নিজেদের চিহ্নিত করে। উত্তেজক কাজ, বিমানবন্দরে পৌছানোর সাথে সাথেই তুমি বিমানে পা রাখবে!

২. **চলন কৌশল** : একটি মানসিক কাজ এবং সৃজনশীলতার সমগ্রতায় এর কেন্দ্রীয়তা হিসেবে ডি বোনো চলন কৌশলের উপর চরম গুরুত্ব প্রদান করেন। চলন ছাড়া উত্তেজক ব্যবহারের কোনো অর্থ নেই।

এরপর, তিনি চলন-এর ব্যবহার গুরুত্বের সাথে তুলে ধরেন। চলনের কিছু সরল রূপ রয়েছে। যেমন- দুর্বল ধারণা হতে সবলতর ধারণার দিকে চলন, পরামর্শ হতে পূর্ণ ধারণার দিকে ধাবিত হওয়া, এবং ধারণা হতে দর্শনের দিকে চলন। তবে চলনের চরম রূপ হচ্ছে উত্তেজকের সাথে চলনের ব্যবহার, কিভাবে আমরা একটি অসম্ভব উত্তেজন হতে কিছু প্রয়োজনীয় দিকে এগোব[২৩৩]?

চলনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এক ধারণা বা দর্শনে না পৌছানো পর্যন্ত অন্যটির দিকে চলতে থাকা এবং এ পর্বের শেষে একটি কর্মক্ষম, সরল, বাস্তব এবং প্রয়োজনীয় চূড়ান্ত ভাবাদর্শ প্রাপ্তি।

ডি বোনো চলনের জন্য নিম্নলিখিত পাঁচটি কৌশল উদ্ভাবন করেন।

---

[২৩৩] Serious Creativity, p. 153

www.pathagar.com

ক. একটি নীতি নিষ্কর্ষণ : এটা হচ্ছে একটি নীতি বা একটি ধারণা বা একটি বৈশিষ্ট্য বা একটি দিক নিষ্কর্ষণ। আপনি উত্তেজন হতে কিছু নিন। বাকি টুকুকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করুন এবং যা নিষ্কর্ষণ করেছেন তাই নিয়ে কাজে অগ্রসর হোন। আপনি এই নীতির চতুর্দিকে একটি ব্যবহারযোগ্য ভাব গঠনের চেষ্টা করুন।

একটি উদাহরণ : একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থা একটি নতুন বিজ্ঞাপনী মাধ্যম খুঁজছিল। একটি উত্তেজনামূলক পরামর্শ দেওয়া হলো : উত্তেজক কাজ, শহর ঘোষককে ফিরিয়ে আনুন।

একজন শহর ঘোষকের মধ্যে আমরা কি কোনো নীতি, ধারণা বা বৈশিষ্ট্য দেখি?

- শহর ঘোষক সেখানেই যেতে পারে যেখানে লোকেরা থাকে।
- দর্শক শ্রোতা অনুযায়ী শহর ঘোষক সংবাদ পরিবর্তন করতে পারে।
- শহর ঘোষক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।
- শহর ঘোষক সম্মানিত সরকারি ব্যক্তিত্ব
- আপনি শহর ঘোষককে নিষ্ক্রীয় করতে পারেন না।

এসব দফার প্রত্যেকটিই নিষ্কর্ষণ ও ব্যবহার করা সম্ভব। যে নীতি ব্যবহার করা হয়েছিল তা শহর ঘোষককে নিবৃত্ত করতে পারেনি। সুতরাং এখন আপনি শহর ঘোষক সম্বন্ধে সব কিছু ভুলে যান এবং একটি মাধ্যমের জন্য চারদিকে খোঁজ করুন। যা থেকে আপনি অন্যদিকে যেতে (অথবা কমপক্ষে অনিচ্ছুক হতে) অসমর্থ। টেলিফোন মনে আসে। এখানে ভাব হচ্ছে কলচার্জ বিহীন সরকারি টেলিফোন থাকা কারণ বাক্যালাপ বিজ্ঞাপনী সংবাদের সাথে ছড়িয়ে যাবে। বিজ্ঞাপনদাতাগণ এসব ধারণকৃত সংবাদ সন্নিবেশ করার মূল্য পরিশোধ করবে এবং ফোন ব্যবহারকারী পাবে বিনামূল্যে কল। এসব স্থানীয় কলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে।

খ. পার্থক্যে আলোকসম্পাত : এখানে উত্তেজনের তুলনা করা হয়েছে বিদ্যমান ধারণার সাথে বা কাজ করার পদ্ধতির সাথে। পার্থক্যের বিষয়গুলো বিশদ ব্যাখ্যা ও বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যাতে তা থেকে চমৎকার নতুন ভাবধারা পাওয়া যায়।

একটি উদাহরণ : PO (উত্তেজন কাজ), টিকেটগুলো হতে হবে লম্বা ও খুব পাতলা। আমরা পার্থক্যগুলো দেখাতে পারি :

www.pathagar.com

- আপনি টিকেটগুলোর ওপর তথ্য লিখতে পারেন।
- ঠিকানার জন্য টিকেটে আরো স্থান থাকবে।
- আপনি খামের মুখ বন্ধ করার জন্য টিকেট ব্যবহার করতে পারেন।
- পরপর জড়ান অবস্থায় টিকেটগুলো বিক্রি করা যায়।
- টিকেটের দৈর্ঘ্য মূল্যের আনুপাতিক হবে।
- খামের পেছন দিকেও টিকেটের ভাঁজ দেওয়া থাকবে।

টিকেটের দৈঘ্য এর মূল্য নির্দেশক হবে এমন পরামর্শ বর্তমানে পাওয়া যায় লক্ষ্যমাত্রার পার্থক্য অনুসরণে। এর দ্বারা বলা হয় যে দৈর্ঘ্যের এককটি একক মূল্যের এক এককের প্রতিনিধিত্ব করে। সুতরাং টিকেটের ওপর মূল্য লেখার প্রয়োজন নেই, যেটা কেবল ডাক একক এর মধ্যেই বিভাজিত হবে। এসব ডাক একক বিদ্যুৎ ও গ্যাসের ইউনিটের বিরাজমান মূল্য দিয়েই কিনতে হবে। এই ধারণা স্বাভাবিক আকারের টিকেটের দিকে এখন ফিরিয়ে নেওয়া যেতে পারে যা কোনো মূল্য বহন করবে না, তবে এতে লেখা থাকবে অভ্যন্তরীণ ডাক, প্রথম শ্রেণির ডাক এবং আরো কিছু। চলমান দামে এসব টিকেট বিক্রি হবে।

গ. মুহূর্ত হতে মুহূর্ত : আমরা ফলাফলের মধ্যে উত্তেজন রাখা হয়েছে কল্পনা করি- যদি এমনকি এতে অলীক কল্পনাও থাকে। মুহূর্ত হতে মুহূর্ত কি ঘটবে তা আমরা মানশ্চক্ষে দেখি। আমরা চূড়ান্ত ফলাফলে আগ্রহী নই, কিন্তু মুহূর্ত হতে মুহূর্তের ঘটনায় আগ্রহী। এটা হচ্ছে ভিডিও চিত্র ফ্রেম হতে ফ্রেমে দেখা কি ঘটছে তা অবলোকনের জন্য। এই পর্যবেক্ষণ হতে আমরা কিছু চমকের ভাবধারা বা ধারণা উন্নয়নের চেষ্টা করতে পারি।

একটি উদাহরণ : PO, (উত্তেজন কাজ), উপর হতে নিচু হয়ে বিমান নামে।

কেউ কেউ মন্তব্য করেন যে, যখন একটি বিমান অবতরণ করতে থাকে তখন বিমান চালকের প্রয়োজন হয় অবতরণ এলাকার উত্তম দৃশ্য পাওয়ার। এখান থেকেই এই বিবেচনা আসে বিমানের কোন্ স্থানে বিমান চালককে বসানো হয়। সুতরাং বিমান চালকের দৃষ্টি বাড়ানোর জন্য বিমানের নাক নামানর একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে। নির্ধারিত স্থানে ভিডিও ক্যামেরাও থাকতে পারে।

ঘ. ইতিবাচক দিকসমূহ : এই উত্তেজক কাজে আমরা সরাসরি কোন্ লাভ দেখব? এখানে আমরা আগ্রহী হচ্ছি সরাসরি বিদ্যমান বিষয়ে, উত্তেজন হতে পারার

www.pathagar.com

বিষয়ে নই। আমরা এরপর এই মূল্য গ্রহণ করি এবং একটি নতুন ভাবধারায় যাওয়ার চেষ্টা করি। যখন উত্তেজন দ্বারা একটি মূল্য পাওয়া যায় তখন আমরা এই একই মূল্য অর্জনের পথ খোঁজার চেষ্টা করি অধিকতর বাস্তব পদ্ধতিতে। আমরা নিজেরা মূল্য সম্বন্ধে সচেতন এবং এর চারপাশে একটা ধারণা গঠনের চেষ্টা করি।

একটি উদাহরণ : PO, (উত্তেজন কাজ), মোটরকারের ইঞ্জিন এদের ছাদে থাকা উচিত। এতে চালনায় এবং মাধ্যাকর্ষণের উচ্চকেন্দ্রে অসুবিধা হবে, কিন্তু সেই সাথে কিছু ইতিবাচক দিকও রয়েছে;

- মেশিন রক্ষণাবেক্ষণের কাজ সহজ হবে।
- সংঘর্ষে ইঞ্জিন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ঝুঁকি কম থাকবে।
- দুই অ্যাক্সেলের ওপর ওজন বণ্টন হবে।
- কারের মধ্যে বা অপেক্ষাকৃত ছোট কারে স্থান বেশি হবে।
- ঠাণ্ডা করার জন্য বাতাস প্রবাহে কম বিঘ্ন ঘটবে।

এটি হতে এ ধারণা আসতে পারে যে, ছোট মধ্য ইঞ্জিনযুক্ত কার যাতে ইঞ্জিন প্লাটফর্মের ওপরে যাত্রীরা বসতে পারে।

ঙ. পারিপার্শ্বিক অবস্থা : আমরা বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য চারদিকে তাকাতে পারি যাতে এই উত্তেজিতকরণে মূল্য প্রদান করা যায়।

একটি উদাহরণ : বন্যা প্লাবিত অবস্থায় ছাদে ইঞ্জিনবিশিষ্ট মোটরকারের একটি প্রত্যক্ষ মূল্য থাকবে। কারণ গভীর পানিতেও ইঞ্জিনকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে এটা চালনা সম্ভব।

আমরা প্রতিটি চলন পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারি এবং প্রত্যেকটির জন্য একটি করে পয়েন্ট রাখতে পারি।

PO (উত্তেজন কাজ), যারা পদোন্নতি চায় তাদের প্রত্যেকে হলুদ জামা কিংবা ব্লাউজ পরবে।

একটি নীতি নিষ্কর্শন : কর্মচারী অভ্রান্ত পথে তার (পুরুষ/স্ত্রী) পেশাগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা নির্দেশে সমর্থ হবে।

www.pathagar.com

পার্থক্যের ওপর আলোকপাত : উচ্চাভিলাষী লোকেরা এখন নিজেদেরকে দর্শনযোগ্য করতে পারে।

মূহূর্ত-হতে মূহূর্ত : যখন কোন কর্মী সকালে পোশাক পরিধান করে তার স্বামী/স্ত্রী বলতে পারে, কেন আজ কোনো হলুদ জামা (ব্লাউজ) নয়? সুতরাং কর্মীদেরকে উদ্বুদ্ধকরণে পরিবারের মধ্যে ভাবধারা চালু হতে পারে।

ইতিবাচক দিকসমূহ : যে কেউ হলুদ জামা অথবা ব্লাউজ পরে নিজেদের (পুরুষ/স্ত্রী) কাছে ঘোষণা প্রদান করেছে এবং এর ওপরে বাঁচার চেষ্টা করতে পারে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা : যাদের অধীন চাকুরি করা হয় তারা হলুদ জামা অথবা ব্লাউজ পরিহিত কর্মীই পছন্দ করবে। কারণ উভয়ের কাজই ভালো হতে পারে এবং এ কারণেও যে অভিযোগ অধিকতর অর্থপূর্ণ হবে।

সাধারণ পর্যবেক্ষণাদি

১. চলন কৌশলের কিছু দিক রয়েছে যা বিশ্লেষণাত্মক এবং সমধর্মী।

২. এটি নিশ্চিত যে এখানে বড় ধরনের অধিক্রমই রয়েছে। তা সত্ত্বেও কোনো অসুবিধা নেই। যা গুরুত্বপূর্ণ তাহলো নতুন ভাবধারা বা ধারণার দিকে চলা অব্যাহত রাখতে হবে।

৩. যদি কোনো না-বাচক যুক্তি চলনপথে উত্থাপিত হয় তা সামনে রাখা যাবে না।

৪. কখনো কখনো চলন পথ পুরাতন ভাবধারার দিকে ঘুরে যায়। এমনটা ঘটলে, অন্য পথ উন্নয়নে সচেতন প্রয়াসের প্রয়োজন হবে।

৫. কখনো বা কোথাও চলন থাকে না। চিন্তন সর্বদা প্রতিষ্ঠিত ভাবধারায় ফিরতে চায়। পরে পুনরায় ভিন্ন উত্তেজন কিংবা ভিন্ন কৌশলে চেষ্টা করুন। তবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই যে, আপনার নির্ধারণকৃত সময়ে সৃজনশীল হওয়ার মতো চমৎকার ধারণা আপনি পাবেন।

৬. অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে চলন প্রক্রিয়ায় সাবলীলতা, দক্ষতা ও বিশ্বাস গড়ে তোলা।

৭. প্রত্যেক ক্ষেত্রেই/সময়েই কৌশলগুলোর সব ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। এদের একটি বা কয়েকটির ব্যবহারই প্রয়োজনীয় নতুন বাস্তব ধারণার জন্য যথেষ্ট।

(নতুন দৃষ্টিসঞ্জাত চিন্তন) ব্যবহারের পর ডি বোনো COR : চিন্তন পাঠসমূহকে স্কুলের শিক্ষার্থীদের জন্য বিন্যস্ত করেন। এই পাঠগুলো কেমব্রিজ এর বুদ্ধিবৃত্তিক

www.pathagar.com

গবেষণা ট্রাস্ট (Cognitive Researchtrust) কর্তৃক বিশদ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর ১৯৭৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এগুলো মূলত দু'টি পৃথক প্যাকেজে প্রকাশিত শিক্ষক সহায়িকা এবং শিক্ষার্থী কর্ম কার্ড সহযোগে পরে এগুলো কম্পিউটার ডিস্কে সেভ করা হয়।

CORT চিন্তন পাঠের আবশ্যিক উদ্দেশ্য চিন্তনকে একটি প্রত্যক্ষ দক্ষতা হিসেবে শিক্ষা দান করা। শিক্ষার্থীদেরকে উত্তম চিন্তা করা কিংবা উদ্ভাবন করা'র শিক্ষাদান করার খুব প্রয়োজন নেই। এ ধরনের শিক্ষাদান হতে বেশিকিছু অর্জন করা যায় না। এটার ওপর সাধারণ আলোচনা বৈঠক এই প্রত্যাশায় করা যথেষ্ট নয় যে, শিক্ষার্থীরা প্রথমে প্রয়োজনীয় চিন্তন কৌশল নিষ্কাশন করবে এবং পরে তা সাধারণ সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত করবে।

CORT চিন্তন পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত তিনটি মৌলিক নীতি নিম্নরূপ : চিন্তন একটি দক্ষতা যা আরো উন্নত করা যায়। সবচেয়ে বাস্তব ধারণাগঠন পর্যায়ে স্থান গ্রহণ করে এবং হাতিয়ার পদ্ধতি চিন্তন শেখাতে ব্যবহৃত হয়।

ডি বোনো চিন্তনের দিকসমূহকে ছয়ভাবে বিভক্ত করেছেন : দৈর্ঘ্য, সংগঠন, মিথস্ক্রিয়া, সৃজনশীলতা, তথ্য এবং অনুভূতি ও কাজ।

এখানে যেটা তুলে ধরা অতীব প্রয়োজন তা হচ্ছে প্রথম দিক যাকে দৈর্ঘ্য বলে। শিক্ষার্থীদেরকে তাদের ধারণা বিস্তারে দশটি হাতিয়ার সাহায্য করে : ভাবধারা পরিচর্যা, উপাদান সম্পৃক্ত বিধিমালা, ফলাফল, উদ্দেশ্যসমূহ, পরিকল্পনা, অগ্রাধিকারসমূহ, বিকল্পসমূহ, সিদ্ধান্তসমূহ এবং অন্যান্য লোকদের মতামত।

১. PMI : (যোগ বিয়োগ, এবং আকর্ষণীয় [কৌতুহল-উদ্দীপক])। এ হাতিয়ারের ব্যবহার ঘটে ভাবধারা পরিচর্যায় পরামর্শ ও প্রস্তাবে। আপনি একটি ভাবধারাকে পছন্দ করেন কিনা ঠিক সেটাই নির্ধারণ করার পরিবর্তে, ভালো যুক্তিসমূহ (P= Plus বা যোগ), মন্দ যুক্তিসমূহ (M= Minus বা বিয়োগ) দেখার জন্য এবং একটি ভাবধারার আকর্ষণীয় যুক্তির জন্য প্রয়াস নেওয়া হয়। আকর্ষণীয় যুক্তিসমূহ সেগুলো যা ভালোও নয়, মন্দও নয়, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ।

২. CAF : সব উপাদান বিবেচনা করা। লোকেরা স্বভাবতই মনে করে যে, তারা একটি ব্যবস্থার সব উপাদানই বিবেচনা করেছে, কিন্তু সাধারণত তাদের বিবেচনাগুলোই সীমাবদ্ধ। CAF (Consider All Factors) সব উপাদান

www.pathagar.com

বিবেচনা করাকে পরিকল্পিত সক্রিয়তায় আনলে উপাদানের গুরুত্বের পরিবর্তে মনোযোগ নিবদ্ধ হবে কাউকে প্রভাবিতকারী সকল সম্ভাব্য উপাদান, অন্য লোকেরা এবং সাধারণভাবে সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করার কাজে।

৩. বিধিসমূহ : বিদ্যমান বা প্রস্তাবিত বিধি হচ্ছে সুযোগ যোগ, বিয়োগ ও আকর্ষণীয় (PMI) এর জন্য। বিধি প্রণয়নে জড়িত উপাদান CAF (Consider All Factors) সব উপাদান বিবেচনা কাজে লাগাবার সুযোগ দেয়।

যদিও এই পাঠের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই সুযোগের অনুশীলন যোগান দেওয়া, কিছু মনোযোগ দিতে হবে বিধিগুলোর দিকে তাদের নিজ অধিকার চিন্তন পরিস্থিতির অংশ হিসেবে। কোনো কিছু সম্বন্ধে চিন্তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকার বিধিবিধান রয়েছে যা অনুসরণ করতে হবে অথবা বিবেচনাযোগ্য বিভিন্ন উপাদানে বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। এখানে বিধি প্রয়োগের আরেকটি কারণ এই ধারণার প্রতিক্রিয়ায় পাঠ সম্বন্ধে চিন্তা করা এবং যা কিছু হয় তার জন্য কোনো বিধি নেই।

৪. C & S : ফলাফল ও পরিণতি (Consequence and Sequel) এটি একটি প্রক্রিয়ার কেলাসিতকরণ যা দিয়ে কোনো কাজ পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত, বিধি, উদ্ভাবন ইত্যাদির তাৎক্ষণিক স্বল্প-মেয়াদী, মধ্য-মেয়াদী এবং দীর্ঘ মেয়াদী পরিণতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা ও সে সম্বন্ধে পূর্বাভাস দেওয়া।

৫. AGO লক্ষ্য, ফলাফল, ও উদ্দেশ্য (Aims, Goals, and Objectives) কাজের পেছনে পরিকল্পনা প্রত্যক্ষ ও সুচিন্তিতভাবে জানার জন্য এই কৌশল ছাত্ররা ব্যবহার করে। কর্মের কর্তা কোন্ লক্ষ্যে কাজ করে? কি অর্জন করতে হবে? কর্মের কর্তা কি সাধন করতে চায়? কর্মের কর্তার উদ্দেশ্যসমূহ কী? কর্মের কর্তা কোন্ ফলাফল পেতে চায়? (লক্ষ্য হচ্ছে সাধারণ পথ নির্দেশ, ফলাফল হচ্ছে গন্তব্য, এবং উদ্দেশ্য হচ্ছে পথ বরাবর প্রাপ্তির স্বীকৃতিযোগ্য স্থান)।

৬. পরিকল্পনা : চিন্তন অবস্থা হিসেবে পরিকল্পনাকে ব্যবহারের ভাবধারা হচ্ছে এমন যা উদ্দেশ্য (AGO) পরিণতি (C & S), বিজড়িত উপাদানসমূহ (CAF), এবং ভাবধারার পরিচর্যা (PMI)। একটি নির্দিষ্ট চিন্তন অবস্থা হিসেবে পরিকল্পনা রয়েছে এর নিজ অধিকারেই—যা কিছু কাজে লাগাবার দাবি রাখে।

৭. FIP প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার (First Important Priorities) পূর্ববর্তী পাঠসমূহে যতগুলো সম্ভব ভাবধারা উৎপাদনে এই প্রয়াস চালান হয়েছে। নিঃসন্দেহে, এসব ভাবধারার কিছু অন্যগুলোর চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। FIP

www.pathagar.com

এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি পরিকল্পিত প্রক্রিয়ার মধ্যে ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা। যদি আপনি শুরু হতেই কেবল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহকে বেছে নেন, তবে আপনি ছবিটির ছোট একটি অংশমাত্র দেখতে সমর্থ হবেন। তবে যদি আপনি যথাসম্ভব বৃহৎ ছবি দেখার চেষ্টা আরম্ভ করেন তাহলে আপনার গুরুত্বের চরম মূল্যায়ন হবে অধিকতর বৈধ। এই সিরিজে FIP পাঠ বিলম্বে আসার এটাই কারণ।

৮. APC : বিকল্পসমূহ, সম্ভাবনাসমূহ, পছন্দ সমূহ (Alternatives, Probabilities, Choices)। ব্যবস্থা গ্রহণে কিংবা সিদ্ধান্ত প্রণয়নে কতিপয় বিকল্প থাকতে পারে, কিন্তু বিকল্প পাবার পরিকল্পিত প্রয়াস সমগ্র পরিস্থিতিকে বদলে দিতে সমর্থ। APC পরিচালনা হচ্ছে একটি উদ্যোগ যা দিয়ে মনোযোগের প্রত্যক্ষ আলোকপাত হতে পারে। সকল বিকল্প বা পছন্দ বা সম্ভাবনাকে নিশ্চিত গুলোর উর্ধে বের করে আনতে পারে।

৯. সিদ্ধান্তসমূহ : এটি পূর্বের দুটি পাঠকে একত্রিত করার একটি সুযোগ প্রদান করেছে, বিশেষ করে FIP ও APC কে, এবং আরো সাধারণ উপায়ে অন্য পাঠগুলোকেও। সিদ্ধান্ত নিতে, আপনাকে সব উপাদানই বিবেচনা করতে হবে (CAF), লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্পষ্ট হতে হবে (AGO), অগ্রাধিকার মুল্যায়ন করতে হবে (FIP), ফলাফলের দিকে তাকাতে হবে (C & F), এবং বিকল্প পথ আবিষ্কার করতে হবে যা উন্মুক্ত হতে পারে (APC)। আপনি একটি যোগ, বিয়োগ উদ্দীপকও (PMI) করতে পারেন একবার গৃহীত সিদ্ধান্তের ওপরেই। পূর্ববর্তী পাঠগুলোতে বর্ণিত চিন্তনের বিভিন্ন দিক বা অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে সহজতর কারণ বিকল্পসমূহ অধিক সংখ্যক এবং ফলাফল উত্তমভাবে সংজ্ঞায়িত।

বিশেষ করে, এখানে FIP প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি AGO কিছুসংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন বিকল্পে পরিণত হতে পারে একটি সিদ্ধান্তের জন্য, এবং তারপর একটি পরিকল্পিত FIP সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণটিকে নির্বাচিত করতে পারে। ফলাফল ও পরিণতি (C & S) তারপর করা যায় প্রস্তাবিত সিদ্ধান্তের ওপর এবং সম্ভবত একটি PMI ও। এই পাঠটি চিন্তনের বিভিন্ন দিক দেখাবার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। পূর্ববর্তী পাঠগুলোর মতোই সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কোনো মূল্য বা বিধি নির্দেশের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। লক্ষ্য হচ্ছে অভিমতটিকে বৃদ্ধি করা যাতে অবস্থায় পৌছায় ছাত্র এ সম্বন্ধে দীর্ঘতর অভিমত

www.pathagar.com

পায়। যেই একটি সিদ্ধান্তজনিত অবস্থা স্পষ্ট করা হয়, তখনই কোনো ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে ব্যক্তিগত অভিমত ব্যবহার করে এতে সাড়া দেয়।

১০. OPV : অন্য লোকদের মতামত। পূর্ববর্তী ন'টি পাঠে অবস্থা সম্প্রসারিতকরণ -ধারণা প্রশস্তকরণ করা হয়েছে সর্বদাই চিন্তকের দৃষ্টিকোণ হতে। তবে, অনেক চিন্তন পরিস্থিতি একই সাথে অন্য লোকদেরকেও সম্পৃক্ত করে। এই অন্যান্য লোকদের দৃষ্টিকোণও অবস্থা সম্প্রসারণের আবশ্যকীয় অংশ যা প্রথম দশ পাঠের মূল ভাব। এভাবে অন্য ব্যক্তির ভিন্ন উদ্দেশ্য, ভিন্ন অগ্রাধিকারসমূহ, ভিন্ন বিকল্পসমূহ, ইত্যাদি থাকতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, যখন অপর কোনো ব্যক্তি একটি PMI, CAF, C & S, FIP, অথবা APC করে তখন সে (স্ত্রী বা পুরুষ) ভিন্ন ভাবধারা নিয়ে আসতে পারে কিংবা ভিন্ন অবস্থানে থাকতে পারে।

১৯৮৫ সালে ডি বোনো এই ধারণার (ছয়টি চিন্তন টুপি) প্রচলন করেন। এই ধারণার ওপর তার বই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং অনেক স্কুল ও ব্যবসায় কোম্পানি গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন চিন্তাশৈলীকে প্রতীকীকরণের জন্য রং ব্যবহার করা হয়। সাদা চিন্তন টুপি ব্যবহৃত হয় নিরপেক্ষ, উদ্দেশ্যমূলক চিন্তনের জন্য যেখানে টুপি ব্যবহারকারী কেবল উপাত্ত ও নির্ভুল ও খাঁটি তথ্য। লাল চিন্তন টুপি অনুভূতি, আবেগ, আবেগের ছাপ, পূর্বাভাস ও ইচ্ছার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।

কালো চিন্তন টুপি ব্যবহৃত হয় নেতিবাচক যৌক্তিক চিন্তন, পূর্ব সতর্কীকরণ, ত্রুটিসমূহ এবং কেন কোনো কিছু কাজ করবে না এসব বোঝাতে।

হলুদ চিন্তন টুপিতে রয়েছে যৌক্তিক আঁচ অনুমান, এটা ইতিবাচক মূল্যায়নের জন্য গঠনমূলক চিন্তন, লাভের জন্য এবং কেন একটি ভাবধারার সমৃদ্ধ মূল্য রয়েছে তা বোঝাতেও।

সবুজ চিন্তন টুপি উদ্ভাবন, উৎপাদনমূলক চিন্তন এর প্রতীক যেখানে চিন্তক বিকল্প এবং আরো বিকল্প খোঁজে। নীল চিন্তন টুপি হচ্ছে চিন্তা সম্বন্ধে চিন্তন, চিন্তা সংগঠিতকরণ, চিন্তনের দায়িত্ব নির্ধারণ এবং অন্য টুপিগুলোর পরিবীক্ষণের প্রতীক। ডি বোনো একই সময়ে সকল টুপি ব্যবহার করতে চিন্তকদের উৎসাহিত করেছেন যে জন্য তিনি একটি নতুন পরিভাষা : *সমান্তরাল চিন্তন* চালু করেন। এবং একটি চিন্তন শৈলী ব্যবহারে অনিচ্ছুক ছিলেন-যা সাধারণভাবে কালো টুপি চিন্তন শৈলী-যা চিন্তন প্রক্রিয়ায় প্রভুত্ব করে।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভাষা, উপলব্ধি ও চিন্তন

আমরা যদি যুক্তিকে ব্যক্ত বক্তব্য হতে উপসংহার টানার প্রক্রিয়া বলে গ্রহণ করি, তাহলে নিঃসন্দেহে যতদিন থেকে মানুষ কথা বলছে ততদিন হতেই যুক্তিসম্মত চিন্তনকে ব্যবহার করছে। তবে, আমাদের বিভ্রান্ত হওয়া উচিত হবে না সাধারণ একটি ভুল ধারণা দ্বারা : যুক্তিসম্মত চিন্তন দ্বারা যা বোঝায়। এমন একটি ভুল ধারণা যুক্তিবিদ্যাকে একটি শুষ্ক, কঠিন এবং চিন্তার আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি দ্বারা গঠিত বলে গ্রহণ করেছে। আমাদের অনেকেই এই ভাবধারাকে স্বতঃসিদ্ধ মনে করেন, এবং সেজন্যই আমরা সচরাচর ভয়ের গভীর অনুভূতি ও উৎকণ্ঠা সহযোগে গ্রহণ করে থাকি।

এতদ্‌সত্ত্বেও, এই বিষয়ের গভীরে প্রবেশের পূর্বে আমাদের উচিত হবে আমাদের ব্যবহৃত কতকগুলো মূল পরিভাষার অর্থবহ সংজ্ঞা প্রদান করা।

যেহেতু প্রত্যেকেই ভাষার সাথে পরিচিত, যার মাধ্যমে চিন্তন প্রক্রিয়া চলে, আমরা আরম্ভ করব ভাষার কর্মক্ষমতা সম্পর্কে কয়েকটি সংজ্ঞা দিয়ে এবং আমরা দেখব কিভাবে ভাষা চিন্তনের সাথে সম্পর্কিত।

এমনটা ব্যাপকভাবে মনে করা হয় যে, মস্তিষ্ক হচ্ছে চিন্তার হাতিয়ার। উল্লেখযোগ্য গবেষণার পর এ ধারণায় সন্দেহ দেখা দিয়েছে। গবেষণা করেছিলেন স্নায়ুবিজ্ঞানী এবং মনোবিজ্ঞানীগণ। বস্তুতান্ত্রিক হ্রাসকরণ তত্ত্বের বিরুদ্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে প্রবণতা দেখা যায় বিভিন্ন ধরনের চিন্তার সামর্থ্যকে অ-দৈহিক অঙ্গের অর্থাৎ মনের বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করায়। এর অর্থ এই নয় যে মস্তিষ্ক যেসব ক্রিয়া সম্পন্ন করে আমাদের চিন্তনের ওপর তার কোনো প্রভাব নেই।

স্নায়ুবিজ্ঞানীগণ এখনও হামাগুড়ি দিচ্ছেন। চিন্তা করতে মানবমন কিভাবে কাজ করে সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্তমূলক জবাব প্রত্যাশা করলে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করা হবে। কিভাবে আমরা কিছুই না হতে কিছু পেতে পারি?

যেটা দৃশ্যত : অলঙ্ঘনীয় বাধা হয়ে রয়েছে তা হলো, কিভাবে আমরা আমাদের মনকে ব্যবহার করে মনকে বোঝব। সেটা কি সম্ভব? এটাকে কঠিন মনে হলেও,

www.pathagar.com

আমরা, তবু মনের গঠনপ্রণালী বুঝবার চেষ্টা করতে পারি এর দৈহিক শেষক্ষেপনে প্রতিফলন ঘটিয়ে, যা ভাষা দ্বারা লিখিত, উচ্চারিত বা এমনকি অন্তঃস্থ বক্তব্য আকারে প্রকাশিত চিন্তা ছাড়া কিছুই নয়। এটা বাস্তবে সম্ভব হবে যদি আমরা অবিরাম আমাদের চিন্তনকে লেখা এবং কথোপকথনে যোগাযোগ করায় জোর দেই যাতে আমরা আমাদের চিন্তনকে উদ্দেশ্যমূলক দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করতে পারি। আমাদের মনে কী রয়েছে তা বুঝবার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথ হচ্ছে এর থেকে কি বেরিয়ে আসে তাই আমাদের প্রকাশিত চিন্তা[২৩৪]।

ভাষা কী?

আমরা আমাদের মাতৃভাষা ব্যবহার খুব সহজ দেখি; যে কোনো অকৃত্রিম ভাষার দেশীয় কথক স্বজ্ঞামূলকভাবে যেকোনো ব্যাকরণগত ভুলকে তার ভাষার প্রয়োগক্ষেত্রে ধরতে পারে। এটা এজন্য যে সে তার জিহ্বার প্রতিষ্ঠিত প্যাটার্নে কোনো সংবাদ যথাযথভাবে পৌঁছায় দেওয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে পরিচিত হয়ে গিয়েছে। তবে, এই পরিচিতির অনেক নেতিবাচক দিক আছে যখন আমরা ভাষাগত প্রপঞ্চ সম্বন্ধে গভীরভাবে ভাববো। কারণ এটা ভাষার সাধারণ কথককে এই খোদায়ী দানের জন্য প্রশংসার দিকে নিয়ে যায় এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রশ্নাদি উত্থাপনের পরিবর্তে। তাই, ভাষাকে সংজ্ঞায়িত করার ধারণা আমাদের অনেকের নিকটই আসতে পারে নিতান্ত নগণ্য অথবা কমপক্ষে ইতিমধ্যে স্বজ্ঞা ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এমন স্থূল সমরূপকরণ হিসেবে।

প্রথমে, আসুন আমরা ভাষার ঐসব সংজ্ঞা বিবেচনা করে দেখি :

- এটি শব্দ-এককের একটি সীমাবদ্ধ ব্যবস্থা যা অসীম পরিমাণ তথ্য গঠনের উদ্দেশ্যে একটি সুর্নিদিষ্ট ভ্রম (বাক্য কাঠামো/পদবিন্যাস) অনুযায়ী সংযুক্ত।
- এটি প্রতীকসমূহের একটি স্বাধীন ব্যবস্থা; একটি শব্দ স্বাধীনভাবে একটি কর্মের সাথে সংযুক্ত।
- এটি এমন এক ব্যবস্থা যা আমাদেরকে বাস্তব ও কাল্পনিক ঘটনার সাথে সাথে চলমান ঘটনা ব্যক্ত করতে দেয়, তা অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎ যখনকারই হোক না কেন।

---

[২৩৪] গ্রে. আর. কারবি এবং জেফরি আর. গুডপাস্টার : Thinking. Printice Hall, Inc. New Jersey, ১৯৯৯ পৃষ্ঠা ২২।

www.pathagar.com

প্রথম সংজ্ঞাটির জোর দেওয়ার স্থানটি হচ্ছে ভাষার বাস্তব দিক। অতএব ইতিমধ্যে ভাষা সম্পর্কে আমাদের চাই স্বাভাবিক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আয়ত্তকৃত বিষয়ের একটি সাদাসিধা সংজ্ঞা। ওপরের বক্তব্যে ব্যবহৃত কিছু পরিভাষা যেমন ব্যবস্থা ও পদবিন্যাস বৈজ্ঞানিক বুঝ এনে দেয় বলে মনে হয়। তবে যখন পুরো সংজ্ঞার প্রেক্ষাপটে দেখা হয়, তখন তারা আবদ্ধ কাজের ক্ষেত্রে ভাষার আরো অগ্রগতিসম্পন্ন জ্ঞান সম্বন্ধে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হয়। উপরে প্রদত্ত সংজ্ঞার সমকক্ষ ও সাধারণ বক্তব্য পরিষ্কারভাবে দেখাবে কিছু বিজ্ঞানসম্মত শব্দ এই স্থানটিতে ব্যবহারের দ্বারা দূর হতে কোনো অর্থপূর্ণ অভিমত প্রদান করবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ধরা যাক যে ভাষা হচ্ছে নির্দিষ্ট ক্রমে কথা বলার কিছু সংখ্যক ধ্বনিসমষ্টি যতটা কথা কেউ বলতে চায়। এক্ষেত্রে, একটি সংজ্ঞা ভাষাগত উৎকর্ষের ক্ষেত্রে কোনো তীক্ষ্ম আলোকসম্পাত করতে অসমর্থ, বিশেষত চিন্তন প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে।

দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি অর্থবোধক এবং অর্থের মধ্যে সম্পর্কের প্রকৃতির ওপর আলোকপাত করে। অর্থাৎ কিনা, কর্মের সম্বন্ধে (অর্থ) এবং এর সাথে অর্পিত শব্দ, দৃষ্টান্তস্বরূপ শব্দ : LION উপধ্বনি যেমন L, I, O এবং N নিয়ে গঠিত। ঐসব শব্দের (Sounds) সমন্বয় LION শব্দটি গঠন করেছে যা একটি পরিচিত পশুকে বোঝায়। এখানে পশুটি কর্ম বা অর্থ যা LION শব্দটি দ্বারা ব্যক্ত। এখানে, যে বিষয়টি প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হলো, কিভাবে শব্দটি কোন শব্দ বোঝায় যা এর অর্থ?

অনেক উত্তর, যার দিকে আমরা পরে তাকাব, এই প্রশ্নের অনুকূলে দেওয়া হয়েছিল এবং এগুলোর মধ্যে রয়েছে শব্দটির/কর্মটির সম্পর্কের আকস্মিকতা সম্পর্কিত বিখ্যাত তত্ত্ব। অনেক অসংখ্য ভাষাতাত্ত্বিক কর্তৃক এটি সাধারণভাবে দেখানো হয়েছে যে, শব্দটির সেটাই অর্থ যে অর্থ এলোমেলোভাবে বা হঠাৎ করেই প্রকাশ পায়। পূর্ববর্তী সংজ্ঞাটি একটি অনুমানকে বিশ্বাসযোগ্যতা দান করে। কিন্তু তা আমাদেরকে মন/ভাষার সম্পর্ক সম্বন্ধে বেশি কিছু বলে না যা আমাদের বর্তমান গবেষণার মূলে নিহিত।

শেষ সংজ্ঞাটি প্রেক্ষিত বদলিয়ে দেয় এবং ভাবপূর্ণতার ধারণা এনে ভাষা সংজ্ঞায়নে অন্য পথ অবলম্বন করে। এ অভিমত অনুযায়ী, ভাষা হচ্ছে আমাদের প্রকৃত ও কল্পনাশ্রয়ী অভিজ্ঞতা প্রকাশের একটি বাহন। এখানে, আলোকপাত করা হয়েছে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ভাষার কাজের ওপর। প্রকাশ করা (Express) শব্দটি ইঙ্গিত দেয় যে ভাষাগত কার্যকলাপ কথকের মনে কি আছে এবং তিনি ভাষাগত

www.pathagar.com

প্রতীকের প্রবাহের দ্বারা কি প্রকাশ করতে চান তার মধ্যে নিহিত। কোনো প্রকৃতিস্থ কথকের বক্তব্যের পেছনে একটা উদ্দেশ্য থাকে। আমরা সাহস করে ধরে রাখব যে, যেকোনো ধরনের বাক্যালাপের পিছনে মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একজনের ভাব অন্যের বোধগম্য হওয়া, একথা মনে রেখে যে, আমরা এখানে স্বাভাবিক আলাপের অবস্থার কথা বলছি (বলার কিছু ধরন কখনও কখনও বাক্যালাপের স্বাভাবিক পথকে বিপর্যস্ত করে বাক্যালাপে যোগদানকারী ব্যক্তিকে ভুলপথে চালনার চেষ্টা দ্বারা অথবা কমপক্ষে কথাবার্তার প্রকৃত অর্থের ভিত্তিতে তাকে সিদ্ধান্ত নিতে অসমর্থ করে তোলে)। অতএব, যদি আমরা চাই আমাদের ভাব অন্যদের বোধগম্য হোক, তাহলে আমাদের উচিত হবে যেকোনো দ্ব্যর্থতা এড়ানো যা দেখা দিতে পারে শব্দের অযথার্থ ব্যবহারের ফলে অথবা বাক্যের অশুদ্ধ বিন্যাসের ফলে কিংবা বক্তব্য এবং বক্তব্যের প্রাসঙ্গিকতার মধ্যে সাজুয্যের অভাবের কারণে। এই দ্ব্যর্থতা ঐ বিশেষ বক্তব্যের যথাযথ ব্যাখ্যাকে অসম্ভব করে তুলতে কিংবা কমপক্ষে সেখানে পৌছাতে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে। এটা দ্ব্যর্থহীনভাবে সত্য যে ঐ তিন ধরনের দ্ব্যর্থতা, যা যেকোনো বক্তব্যে ঘটতে পারে, তা বক্তার মনের অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। যথাযথ শব্দ বাছাইকরণ একজনের মন সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডার দ্বারা সজ্জিত থাকারই বহিঃপ্রকাশ, যা পরবর্তীতে তার চিন্তনের পর্যায় প্রকাশ করে। যে নকশার সাহায্যে কোনো বক্তব্যকে সাজানো হয় তা হচ্ছে সেই ব্যক্তির বুদ্ধিবৃত্তিক সামর্থের উৎকর্ষ মজবুতভাবে প্রদর্শন যিনি সেই বক্তব্যের উপস্থাপক। মর্যাদার বিচারে, একটি বিভ্রান্ত মন কেবল বিশৃংখল/বিভ্রান্তিকর বাক্যই গঠন করবে। যোগাযোগের পরিমণ্ডলে আমাদের অভিজ্ঞতা চিন্তা ও ভাষার শক্ত বন্ধনের সাক্ষ্য দেয়। উদাহরণস্বরূপ, অনেক পরিস্থিতিতে আমরা নিজেদেরকে নিজেদের কোনো বিষয়ে ভাব প্রকাশে অসমর্থ দেখতে পাই যা আমরা বোঝতে পারি এই সত্যতা সত্ত্বেও যে বাক্য গঠনে শব্দ ব্যবহার সম্বন্ধে আমরা জানি। তাই বলতে হয় যে, আমরা কেবল বলতে গিয়েই চিন্তা করি না বরং বলার সময়ও আমরা চিন্তা করি। এবং এখানেই চিন্তা বা ভাষার মধ্যে কোনটি কোনটির পরে আসবে সেই উভয় সংকটই পরিশেষে দেখা দেয়। এভাবে চিন্তা /ভাষা সম্পর্ক পরস্পর বিনিময় : আমরা কথা বলতে গিয়ে ভাবি এবং আমরা ভাবতে গিয়ে বলি। আমরা চিন্তা করার সময় কথা বলি এবং কথা বলার সময় চিন্তা করি।

www.pathagar.com

যেহেতু অন্যান্য অংশের মতো, যেমন লেখা ও পড়া, কথা বলা ভাষার একটি অংশ, ভাষার ক্ষেত্রে চিন্তার তাৎপর্যকে অন্য দুটি অংশের মাধ্যমে অধিকতর জোরদার করা যায়। যা যেকোনো প্রতীকী ব্যবস্থা গঠন করতে পারে, যার নাম ভাষা।

ভাষা ও চিন্তা : একটি ইসলামি পরিপ্রেক্ষিত

পবিত্র কুরআনে ভাষাকে আল্লাহ তায়ালার দান বলে বর্ণনা করা হয়েছে যা তিনি মানুষকে দিয়েছেন। এর অর্থ হলো ভাষাগত উৎকর্ষ, স্রষ্টাকে জানা এবং তাঁর সৃষ্টির প্রশংসার একটি পথ। আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ

> এবং তাঁর নির্দেশাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে (সুরা রূম ৩০ : ২২)।

অনুবাদ আরো সঠিক করলে ভাষাসমূহ শব্দের স্থলে জিহ্বা এর পরিবর্তে কথা বলার পদ্ধতি হবে। আরবি শব্দ আলসিনাতিকুম-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে জিহ্বা যা এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে কথা বলার পদ্ধতি আরবিতে হবে লুগাতিকুম। কুরআন অনুযায়ী পার্থক্য হয় কেবল কথা বলার পদ্ধতিতে ঠিক সেই ভাষায় নয়, কারণ এমন কোনো শব্দ নেই যা ভাষা হিসেবে সাধারণভাবে গৃহীত প্রতিষ্ঠিত সাংকেতিক ব্যবস্থা বোঝাবে। ভাষা একটি শক্তি যা আমাদেরকে ধ্বনি তৈরিতে সাহায্য করে, সেখানে ভাষা একটি প্রতীকী ব্যবস্থা যা ব্যাকরণ (কাঠামো) ও শব্দার্থ (অর্থসমূহ)-কে অন্তর্ভুক্ত করে। পবিত্র কুরআন এর নিজ ভাষাকে লিসা-নুন আরাবিইয়াম মুবীন বলে অভিহিত করেছে।

আমি তো জানিই তারা (মুশরিক ও কাফেররা) বলে, তাকে [মুহাম্মদ সা.] শিক্ষা দেয় একজন মানুষই।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ ۗ بَشَرٌ ۗ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَٰذَا عَرَبِيٌّ مُّبِينٌ لِّسَانٌ

www.pathagar.com

ওরা যার প্রতি এটা আরোপ করে তার ভাষা তো আরবি নয়, কিন্তু এটির (কুরআন) ভাষা নিঃসন্দেহে স্পষ্ট আরবি ভাষা (সুরা নাহল ১৬ : ১০৩)।

মজার বিষয় হচ্ছে, ফরাসির মতো কিছু ভাষায় আমরা ইংরেজির সঠিক সমার্থক শব্দ দেখতে পাই না।

ফরাসি ভাষা

ফরাসিতে আক্ষরিক ও সরাসরি অনুবাদে আমরা বলতে পারি : ল্যাংগুয়েজ ফ্রান্সাইজ (Language Francais- Lingua Franca অর্থাৎ বিভিন্ন ভাষাভাষীর মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে গৃহীত ভাষা—অনুবাদক)। এই অনুবাদ শুদ্ধ নয় এই কারণেই যে, ফরাসিতে আমরা tongue ব্যবহার করি ভাষা বোঝতে এবং তাই আমাদের বলা উচিত : (langue/tongue/ francaise)

এই ধারণা অনুযায়ী মানবজাতি তার যোগাযোগের কাজ শুরু করেছিল ঐশী সূত্র হতে তাকে প্রদত্ত একক ভাষা দ্বারা। এই ভাষা পরবর্তীতে অসংখ্য ভাষায় বিভক্ত হয়ে যায় জটিল ঐতিহাসিক ও ভাষাগত পরিবর্তনের ফলে। সমগ্র মানবজাতির জন্য একটি মাতৃভাষার ধারণা, আল্লাহ তায়ালার একত্বের নির্দেশক ব্যতীত, মানবচিন্তার সর্বজনীনতার প্রতি ইঙ্গিত করে। এখানে আমাদের যুক্তি দুটি সূত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

১. আদম (আলাইহিসসালাম) একটি ভাষায় কথা বলেছেন যা থেকে সকল ভাষা বা কথা বলার রীতি উৎসারিত হয়েছে।

২. ভাষা কম বা বেশি চিন্তন পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে।

৩. চিন্তন পদ্ধতি কমবেশি সর্বজনীন।

ওপরে বর্ণিত উপসংহারে আমাদের সূত্র গণ্য করে আমরা যুক্তিসমূহকে বিপরীতমুখী করতে পারি। যুক্তিসমূহ এমন হবে :

চিন্তন পদ্ধতি সর্বজনীন

ভাষা চিন্তনের ফসল

অতএব, ভাষা সর্বজনীন

কুরআনের এই অবস্থান বিশেষ কোনো জাতি বা বংশগতির বুদ্ধিবৃত্তিক বড়ত্বের দাবিকে বাতিল করে দেয়, এবং বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির পারস্পরিক বোঝাপড়ার

www.pathagar.com

জন্য দৃঢ় ভিত্তি নির্মাণ করে। এটি মানবচিত্তের সর্বজনীনতাকে গুরুত্ব প্রদানের দ্বারা চরম আপেক্ষিকতা বিকাশের সবল যুক্তিও পেশ করে।

আল্লাহ তায়ালা কিভাবে আদম আ.-কে শিক্ষা দিয়েছেন সে সম্বন্ধে কুরআনের আয়াত আমাদের বর্তমান আলোচনার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

> এবং (স্মরণ করো) যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদের বললেন, নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে (মানবজাতিকে) প্রজন্মের পর প্রজন্মব্যাপী প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছি। তারা বলল, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার সপ্রশংস স্তুতি গাই ও পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি বললেন, আমি জানি, যা তোমরা জানো না এবং তিনি আদমকে সকল নাম (সবকিছুর) শিক্ষা দিলেন। অতঃপর তিনি সেসব ফিরিশতাদের সম্মুখে প্রকাশ করলেন এবং বললেন, এই সমুদয়ের নাম আমাকে বলে দাও যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো। তারা বলল, আপনি মহান, পবিত্র। আপনি আমাদেরকে যা শিখিয়েছেন তাছাড়া আমাদের তো কোনো জ্ঞানই নেই। বস্তুত আপনি জ্ঞানময় ও প্রজ্ঞাময়। তিনি বললেন, হে আদম! তাদেরকে এসকল নাম বলে দাও। যখন সে তাদেরকে এসকল নাম বলে দিল, তিনি বললেন, আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর গুপ্ত বস্তু সম্বন্ধে আমি নিশ্চিতভাবে অবহিত এবং তোমরা যা ব্যক্ত কর বা গোপন রাখ আমি তা-ও জানি (সুরা বাকারা ২ : ৩০-৩৩)।

আদম আ. কে শিখিয়ে দেওয়া নামগুলো কি ছিল, তা আজ পর্যন্ত একটি ধাঁধাঁ হয়ে রয়েছে। মানবিয় ভাষার প্রকৃতির ওপর এটা অনেক মুসলিম বিতর্কের কেন্দ্রে রয়ে গেছে। ইসলামি পণ্ডিতদের সমাজে সাধারণভাবে এ ধারণা রয়েছে যে এ নামগুলো বস্তুসমূহের নাম ব্যতীত কিছুই নয়। যেমন- পর্বতের স্থলে পর্বত শব্দ এবং উটের স্থলে উট শব্দ এবং এমনই ধরনের। তবে এমন একটি ধারণা ভাষার প্রপঞ্চের ওপর উজ্জ্বল আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ভাসাভাসা। কারণ বস্তুসমূহের নাম জানা কোনো মূল্যবান বৈশিষ্ট্য নয় বরং আদমের ওপর আগত বিশেষ অনুগ্রহ বলে আল্লাহ তায়ালা উল্লেখ করেছেন। কারণ বস্তুনিচয়ের প্রতি নাম আরোপ করাকে কোনো পূর্ব

www.pathagar.com

জ্ঞান ছাড়াই গ্রহণ করা যায়, যেহেতু এটি প্রাচ্য হতে পাশ্চাত্যের মূলধারার ভাষাবিদদের অভিমত, মুসলিমরা এর অন্তর্ভুক্ত, তা এই যে নাম এবং এর পক্ষে যা ব্যবহৃত হয় তা একটি দৈব সম্পর্ক। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যে কোনো সম্প্রদায় বস্তুর বিপরীতে শব্দ যোগ করতে সমর্থ। উদাহরণস্বরূপ, আমরা কল্পনা করি একদল লোক ধ্বনিসমূহের এলোপাতাড়ি সহযোগে বস্তুনিচয়ের নাম সৃষ্টি করছে যেমন : যাকে আমরা pen বলি তার জন্য rap এবং বিশ্ববিদ্যালয় বোঝাতে horse। এখন এই প্রক্রিয়া এ দলের দ্বারা যথাযথভাবেই সম্পন্ন হতে পারে। এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের জন্য পূর্ণ ব্যবস্থিত আকারে ভাষা সৃষ্টি করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যাই হোক, এই বিশেষ সম্প্রদায় আরবি, মালয় অথবা জার্মানের মতো একটি ভাষাব্যবস্থা সৃষ্টিতে অসমর্থ। আমাদের যুক্তি এই প্রস্তাবের জন্য যে আল্লাহ তায়ালা আদমকে যা শিখিয়েছেন তা ছিল কিছুটা অলৌকিক এবং বস্তুর সাথে শব্দকে সাধারণভাবে পাশাপাশি স্থাপনের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই রহস্য আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছাকৃতভাবে উল্লেখ করেছেন তা হলো ভাষা প্রতীকসমূহের ব্যবস্থা হিসেবে এবং কেবল সামান্য নাম নয়, যা বিক্ষিপ্তভাবে বস্তু নির্দেশ করে।

কুরআনের আয়াতে ব্যবহৃত আসমা শব্দটির শব্দার্থতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ মানবজাতির জন্য প্রদত্ত ঐশী জ্ঞানের কিছু দিক উন্মোচনে কাজে লাগতে পারে।

আসমা শব্দটি দুটি মূলশব্দ হতে উদ্ভূত; প্রথমটি হচ্ছে সামাওয়া এবং দ্বিতীয়টি ওয়াসামা, প্রথমটির চারপাশে বিচিত্র অর্থ রয়েছে। যার প্রধানটি হচ্ছে মহিমান্বয়ন ও উন্নতিসাধন, যেখানে পরেরটির অর্থ হবে ইঙ্গিতকরণ ও নিয়মভুক্তকরণ। সামাওয়া হতে উদ্ভূত আসমা শব্দটির প্রথম অর্থটি অনেক শব্দার্থবিজ্ঞানসম্মত বিবেচনায় আমাদের গবেষণা পরিধির বহির্ভূত। আসমা ইঙ্গিতকরণ বা প্রতীকীকরণের কাজ নির্দেশ করে, যেমন অন্যান্য ধরনের ধারণার সাথে সংযুক্ত করে সৃষ্টি এবং চিন্তা ও বাস্তবতাকে একটি প্রতীকী ব্যবস্থায় রূপান্তর করার সামর্থ্য। এটি বোঝা, জানা ও ব্যাখ্যা করাকে সম্ভব করে। যদি নাম জানার কাজটি কেবল কর্মের পাশে শব্দ বসানোই হতো, তবে আল্লাহ তায়ালা কেন এটিকে একটি মৌলিক গুণ বলে গণ্য করেছেন যার জন্য আদম আ. ফিরিশতাদের চেয়ে পছন্দসই হয়েছেন?

পবিত্র কুরআন চিন্তা ও ভাষার মধ্যে প্রগাঢ় সম্পর্ক উন্মোচনে আরেকটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে। একটি আয়াতে, যেখানে সুলাইমান (আলায়হিসসালাম) তাঁর

www.pathagar.com

প্রভু (আল্লাহ) কর্তৃক তাঁকে প্রদত্ত অনুগ্রহ কামনা করছিলেন কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য প্রকাশের মধ্য দিয়ে। কুরআন বলে :

> সুলায়মান হয়েছিল দাউদের (জ্ঞানের) উত্তরাধিকারী এবং সে বলেছিল, হে মানুষ! আমাকে পাখিদের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, এবং আমাদেরকে সকল কিছু দেওয়া হয়েছে। এটা অবশ্যই এক সুস্পষ্ট অনুগ্রহ [আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে] (সুরা নামল ২৭ : ১৬)।

আরব বক্তাদের দ্বারা সাধারণ ব্যবহারের শব্দ মানতিক ইংরেজি যুক্তিবিদ্যা শব্দের সমতুল্য, অথবা মালয়ের মানতিকের মতো। তবে এই শব্দটির কুরআনী ব্যবহার সাধারণ ব্যবহাররীতির ইঙ্গিত বোঝায় না। আয়াতের মানতিক শব্দটি সরলভাবে ভাষার উৎকর্ষ নির্দেশ করে এবং সেখান হতে নীরব বিশ্বাস যে আমরা যেভাবে ভাব, যুক্তি এবং ভাষা গঠন করি তাকে এভাবে সমরূপে গণ্য করা হয় যে, এরা উভয়েই ভাষাগতভাবে একই বিষয় নির্দিষ্ট করে।

আমি কথা বলি, অতএব, আমি চিন্তা করি

মানব মস্তিষ্কের কাজ সম্পর্কে গবেষণার জন্য অনেক কষ্টকর প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। জীববিজ্ঞানীগণ এর অন্তর্নিহিত কার্যপ্রণালী চিহ্নিত করার জন্য মস্তিষ্কের ওপর অস্ত্রোপচারের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এ কৌশলের ফলাফল প্রতিশ্রুতিপূর্ণ নয়। আচরণবাদী মনোবিজ্ঞানীগণের অভিমত এই যে, মানুষের কাজ তার মনের অবস্থার প্রতিফলন। ধাঁধাঁগুলো অমীমাংসিত থাকে। তার কারণ এটা একটা সবল সম্ভাবনা যে, আমাদের কর্মসমূহ আমাদের নিজস্ব চিন্তার বোধ ছাড়া কিছুই নয়। চিন্তন ও যৌক্তিক সিদ্ধান্তের পরিবর্তে আকাঙ্ক্ষা, ঝোঁক এবং আবেগ দ্বারাও কার্য পরিচালিত হয়। তাই আমরা কিভাবে মস্তিষ্কের মতো এমন একটি প্রহেলিকার ওপর কিছু আলোকপাত করতে পারি? চিন্তন সম্বন্ধে চিন্তা করা অথবা বোধকে বোঝার জন্য সর্বোত্তম পথ, যদি থাকে, কী?

আসুন আমরা সরল বস্তুর দিকে ফিরে যাই। আপনার কি হয় যখন আপনি একাকি চিন্তা করেন? নিশ্চয়ই, তখন আপনি নিজের সাথে কথা বলায় মগ্ন থাকেন যেখানে আপনি আপনার চিন্তার সংখ্যা ও প্রকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন ভূমিকা পালন করেন। এই নীরব কথোপকথন একটি নীরব ভাষা নয় কি?

www.pathagar.com

এখন কল্পনা করুন যে আপনি একটি উন্মুক্ত বিতর্কে জড়িত রয়েছেন। আপনি স্বাভাবিকভাবে কঠিন চেষ্টা করবেন আপনার অভিমতে অন্যদেরকে উপনীত করতে। সে কারণেই আপনার কথা বলার পূর্বে চিন্তা করা প্রয়োজন। অন্যথায় বিতর্কে আপনার ঝুঁকি থেকে যাবে। সাধারণত, আপনি প্রথমে আপনার পক্ষেই কথা বলবেন এবং পরে আপনার বক্তব্যের জবাবে সম্ভাব্য আপত্তি যা উত্থাপিত হতে পারে এসব সম্বন্ধে ভাববেন এখানে এক নজরে। কিছু শব্দ পরিবর্তন করতে হয় যা আপনার কাছে অসম্ভব মনে হয়। এমনকি আপনি আপনার যুক্তিসমূহের কাঠামোও পুরো বদলে ফেলতে পারেন। এমন ক্ষেত্রে, আমাদের চিন্তনের ঐসব অন্তর্নিমিত কৌশল ভাষাগত প্রকৃতিসম্পন্ন। কথা বলা, শব্দাবলী ব্যাখ্যা করা এবং চিন্তনের অন্যান্য কাজ সবকিছুই ভাষার সাথে শক্তভাবে সম্পৃক্ত। তাই, যদি আমরা আমাদের মনের কর্ম প্রক্রিয়া বোঝতে চাই, এবং এর রহস্য উন্মোচন করতে চাই, তাহলে অন্যতম উপায় হচ্ছে ভাষায় উপর প্রতিফলন ঘটান যা আমরা চিন্তা প্রকাশে ব্যবহার করি। এটি আমাদের মানব চিন্তনের[২৩৫] যোগাযোগমূলক উপলব্ধির দিকে চালিত করতে পারে যার সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব।

এই মাত্র আমরা যা বললাম তার চিত্র হিসেবে আমরা চিন্তনের ভাষাগত হাতিয়ারের ওপর নির্ভর করব। তা হচ্ছে একাধিক রূপকের সংমিশ্রণ যা আমরা পরবর্তীতে বিবেচনা করব। রূপকের সংমিশ্রণ মানব মস্তিষ্ক ও কম্পিউটারের লুকায়িত সমরূপতাভিত্তিক, যেখানে ভাষাকে সফটওয়্যার হিসেবে ধারণা করা হয়। চিত্রটি নিম্নরূপ :

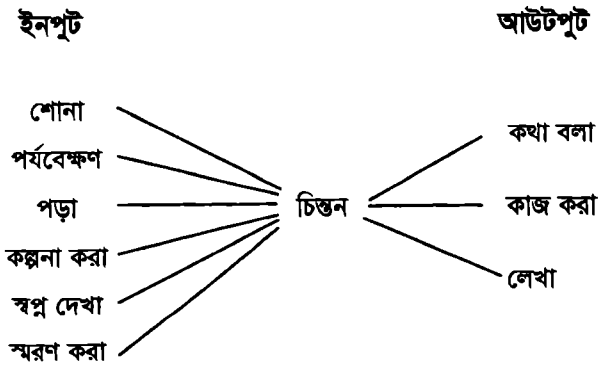

[২৩৫] Thinking, Gray Kirby, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫।

www.pathagar.com

কাজ, কথা ও লেখাকে আমাদের চিন্তার কিছু প্রতিফলন বলে গণ্য করা হয়। আরেকটি রূপক ব্যবহার করে, এসব কাজকে আয়না হিসেবে নিতে হবে যা আমাদের আমাদের চিন্তাকে দেখতে ও উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে অধ্যয়নে সহায়তা করবে। এটা সাধারণত করা হয় আমাদের চিন্তনের পরিকল্পিত বাহ্যিক প্রকাশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে।

এই বাহ্যিক প্রকাশন সম্ভবত আমাদেরকে আমাদের চিন্তনের সঠিক প্রতিরূপ দেবে না, তবে এটা মেঘাচ্ছন্ন আয়না তৈরি করবে। এই মেঘ পরিষ্কার হতে শুরু করবে যদি আমরা প্রায়ই এ কাজের পুনরাবৃত্তি করি এবং আমাদের চিন্তনের চার্ট করা শিখি কলমের সাহায্যে। আমাদের চিন্তাকে কলমে প্রকাশ করা একটি চ্যালেঞ্জ। কারণ মস্তিষ্ক কলমের চেয়ে অনেক দ্রুত চলে, একজন খটখটির (Rapper) চেয়েও দ্রুততর যে প্রতি মিনিটে ৩০০ শব্দ বসায়। মস্তিষ্কের প্রকৃত/সঠিক বেগ জানা যায়নি। তবুও আমরা ধরে নিতে পারি যে এটা মিনিটে প্রায় ৫০০ হতে ৭০০ শব্দ। প্রায়ই মস্তিষ্ক এমনকি এর চেয়েও দ্রুত চলে কারণ এটি প্রতিটি শব্দ চিন্তা করে না। কোনো কোনো সময় এটি শব্দসমষ্টি এবং ভাবধারার সকল গোষ্ঠী নিয়ে মোটামুটি তাৎক্ষণিক অন্তর্দৃষ্টিতে লাফিয়ে পৌঁছায়[২৩৬]।

একই জিনিস কথা বলার ক্ষেত্রেও। উচ্চস্বরে কথা বলার চেষ্টা করুন এবং আপনার চিন্তনকে ও ভাবকে চিহ্নিত করুন। এটি পরিকল্পিতভাবে করুন পৌনঃপুনিক স্কেলে। তারপর ঐসব ভাবধারার কিছুসংখ্যককে বিশ্লেষণ করুন যা আপনার মধ্যে আসে। এমন করে আপনি আপনার চিন্তাপদ্ধতির একটা ছবি পেয়ে যাবেন। এটা অস্পষ্ট হতে পারে, এই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি করতে থাকলে নিশ্চয়ই আপনি একটা সন্তোষজনক ফলাফল পেয়ে যাবেন।

ভাষার ক্ষমতা আমাদের চিন্তন ধারার আকৃতি দানের সামর্থ্যের মধ্যে নিহিত। গ্যারি আর কারবী এবং জেফ্‌রী আর গুডপ্যাস্টার (১৯৯৯) সাফল্যের সাথে একটি প্রশ্নত্তোরিকা তৈরি করেন আমাদের ভাষা সংক্রান্ত সামর্থ্য পরীক্ষার জন্য এবং সাথে সাথে আমাদের চিন্তার বিদ্যমান পরিস্থিতির ছবি পাওয়ার জন্য। কারণ চিন্তার বাহন প্রতীকী ব্যবস্থা ছাড়া কিছুই নয় যা ভাবকে পৌঁছায় দেয় (transmit)। প্রশ্নগুলো হলো :

১. আপনি কতটা সাবলীল/স্বাচ্ছন্দ?

---

[২৩৬] Thinking, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৭।

www.pathagar.com

২. আপনার মনে কি ধরনের শব্দ রয়েছে? কতগুলো? আপনি যে ধরনের বই পড়েছেন এবং কথা বলার কিংবা লেখার সময় যে ধরনের শব্দ ব্যবহার করেন তা চিন্তা করে এ প্রশ্নের উত্তর শুরু করতে পারেন।

৩. কেমন স্পষ্টভাবে আপনি আপনার চিন্তা বিন্যস্ত করতে পারেন? অন্যরা কি অনেক প্রশ্ন না করে কিংবা স্পষ্টিকরণের দাবি না করে আপনাকে অনুসরণ করতে পারে?

৪. আপনার লেখাপড়ার পর্যায় কি? কোন্ ধরনের বই, আপনি পড়েন?

৫. আপনার ভাষাভিত্তির সূচিশক্তি কতটুকু? অন্য কথায়, কোন্ ক্ষেত্রে আপনি জ্ঞানসম্পন্ন এবং সহজেই কি চিন্তা ও যোগাযোগ করতে পারেন? কোন্ ক্ষেত্রে আপনি বিস্তৃতি সাধন করতে চান?

৬. আপনার রূপকালংকার সামর্থ্য কি? আপনি কি নতুন সমাহারের মধ্যে ভাবধারা সমূহকে একত্রে গ্রথিত করতে পারেন?

৭. আপনার চিন্তনশৈলী কী? শব্দ ও ভাব কিভাবে আপনার মনের ভেতর চলাচল করে তা প্রতিফলনের জন্য এক মুহূর্তের বিরতি নিন : দৈবক্রমের মধ্যে, আঁটসাঁট ধারাবাহিকতায়, এককভাবে, গুচ্ছভাবে, অনুভবের সাথে, বা অন্য প্রক্রিয়ায় যা আপনি চিহ্নিত করতে পারেন।

ভাষা ও বাস্তবতা

ভাষা কিভাবে বাস্তবতার সাথে সম্পর্কিত? আমরা কিভাবে বুঝি তা বোঝার জন্য এই প্রশ্নটি মৌলিক। অন্য কথায়, মানুষ কিভাবে তাদের বাস্তবতা বোঝতে পারে? এখানে এই বোঝার প্রক্রিয়ার ভাষাকে ন্যস্ত করা যায়। কারণ সাধারণত মনে করা হয় যে, মনের দ্বারা ইতোমধ্যে যা বোঝতে পারা গেছে ভাষা কেবল তারই বর্ণনা দেয়। এমন একটি ধারণা অনুযায়ী, ভাষা একটি হাতিয়ার মাত্র, আমাদের বাস্তবতার মূর্তি গঠনে যার তাৎপর্যপূর্ণ কোনো প্রভাব নেই। কম বিমূর্ত হতে, একটি কার্যকর উদাহরণ পেশ করেছেন বেঞ্জামিন লী উর্ফ যিনি ভাষা আপেক্ষিকতার তত্ত্বকে সেই আপেক্ষিকতার মোড়ক পরিয়েছেন যা এই অনুমানকেন্দ্রিক যে ভাষা চিন্তার নির্ধারক। কিভাবে বাস্তবতার নির্দিষ্ট ছবির সাথে পরিপূর্ণভাবে যেমন আছে তেমন নয়- এটা বিস্তৃত করতে ভাষার সম্পর্ক রয়েছে, তবে ভাষার ব্যবহারের ফলে তা বরং ছাঁচবদ্ধ। উর্ফ বলেন যে :

www.pathagar.com

> যাকে বলে গ্যাসোলিন ড্রাম তার গুদামের চারপাশে নির্দিষ্ট ধরনের আচরণের ঝোঁক দেখা যাবে, অর্থাৎ সর্বোচ্চ সর্তকতা গ্রহণ করা হবে, পাশাপাশি গ্যাসোলিন শূন্য ড্রামের গুদামে দেখা যাবে পৃথক-অসতর্কতা, ধুমপানের সামান্য নিয়ন্ত্রণ বা সিগারেটের পোড়া টুকরা নিক্ষেপের ব্যাপারে। তথাপি খালি (গুরুত্বটি আমার) ড্রামগুলোই সম্ভবত অধিকতর বিপজ্জনক, কারণ এগুলোর মধ্যে থাকে বিস্ফোরক গ্যাস[২৩৭]।

উর্ফ-এর মতে, এখানে বাস্তবতা সম্পর্কে ভুল ধারণা। কারণ খালি শব্দটির ব্যঞ্জনা যা ঝুঁকির অভাব নির্দেশ করে। এর ওপর আরো চিন্তা করার ক্ষেত্রে খালি (Empty) শব্দটি উর্ফ-এর উদাহরণে একটি সাধারণ অবস্থা বোঝতে ব্যবহৃত হয়েছে, কোন বস্তুগত নয়। তাই খালি (Empty) শব্দটি একে ঐ পথে পরিবেষ্টন করে না যে গ্যাস কোনো কিছুর সমান নয়। এই শব্দার্থগত সমস্যার ফল হিসেবে শূন্য গ্যাস-এর প্রকৃত ঝুঁকিকে ভুল বোঝা হয়।

উর্ফ-এর সাথে অগ্রসর হয়ে তার আরেকটি উদাহরণ ভাষা/বাস্তবতা সম্পর্কের ওপর আরো আলোক *সম্পাত* করবে। তিনি বলেন :

> একটি বিশাল কেতলি বোঝাই বার্ণিশ অতি উত্তপ্ত হলে, সে পর্যায়ের কাছাকাছি তাপে এটি প্রজ্বলিত হবে। যে চালক এটি চালিয়েছে সে আগুন বন্ধ করে চাকার উপর গড়িয়ে এটিকে দূর স্থানে নিয়ে গেছে, কিন্তু অতিক্রম করতে পারেনি। এক মিনিট বা এরকম সময়ের মধ্যে বার্ণিশ প্রজ্বলিত হয়েছে[২৩৮]।

এ অবস্থা ভাষাগত কাঠামোর অধিকতর জটিল প্রভাব বেষ্টিত। ON কর্ণিকার বিপরীতে OFF কর্ণিকা ব্যবহারের ব্যাপন-স্থল সংক্রান্ত মাত্রার রূপকালংকার পূর্ণ প্রকাশে অনুমিত হয় যে, আমরা প্রজ্বলনকে বস্তু ও আগুনের ব্যাপন স্থল সংক্রান্ত সংযোগে সীমাবদ্ধ করেছি অর্থাৎ বস্তুটি আগুনের ওপর থেকে বিস্ফোরণ ঘটবে এবং যদি আগুনে না থাকে কোনো ঝুঁকি। ভাষার মাধ্যমে গঠিত জিনিস বাস্তবে ভিন্ন। বার্নিশের অতি উত্তপ্ত হওয়া এমন পর্যায়ে এসেছে যেখানে এর প্রজ্বলন একটি

---

[২৩৭] Language and Reality, Benjamin Lee Whorf, MIT প্রেস, কেমব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস ১ম সংস্করণ ১৯৫৬, ৮ম সংস্করণ ১৯৮৮, পৃষ্ঠা ১৩৫।

[২৩৮] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৬।

www.pathagar.com

অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে আগুনের On কিংবা Off পর্যায় ব্যতিরেকেই।

স্বাভাবিক ভাষা ও কৃত্রিম ভাষা

স্বাভাবিক ভাষা বা আল্লাহ তায়ালার দেওয়া ভাষা ঐ ভাষাকে বলা হয় কোনো সম্প্রদায় তাদের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নিয়মানুযায়ী সে ভাষায় কথা বলে। কৃত্রিম ভাষার বিপরীতে স্বাভাবিক ভাষা না মানব-সৃষ্ট না তা কোন বিশেষ ধরনের যোগাযোগের প্রয়োজন পূরণে গঠিত। আরবি, ইংরেজি এবং মালয়ের মতো ভাষা রয়েছে যেগুলোকে এমন গণ্য করা যায়, কোন পরিকল্পিত প্রক্রিয়ায় এর ব্যবস্থা পরিবর্তন এবং এর যৌক্তিক বৈধতার প্রশ্ন ছাড়াই। উদাহরণস্বরূপ, ফরাসি ভাষায় টেবিল (Table) হচ্ছে স্ত্রী এবং বোর্ড (Board) পুরুষ। এটাকে অযৌক্তিক মনে হয় কেবল এজন্য নয় যে, বস্তু স্ত্রীও নয় পুরুষও নয়, কিন্তু একারণে যে টেবিলের স্ত্রীবাচক হওয়ার এবং পুরুষ না হওয়ার কিংবা এর উল্টোপাল্টা না হওয়ার পেছনে কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই। এধরনের প্রশ্ন এই সরল সত্যকে উপেক্ষা করে যে, স্বাভাবিক ভাষাকে স্থায়ীভাবে গ্রহণ করতে হবে এবং এর ব্যবস্থা যুক্তিসম্মতকরণ এর প্রকৃতিকে বোঝার বাস্তব পথ নয়।

কৃত্রিম ভাষার ক্ষেত্রে, যা এর নামের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে, এ ধরনের ভাষা মানবসৃষ্ট ভাষা। বিস্তারিত বলতে গেলে, একদল লোক যোগাযোগের একটি ব্যবস্থা গঠনে সম্মত হয়েছে প্রতীকসমূহের নির্দিষ্ট অর্থ সাব্যস্তকরণের মাধ্যমে। উদাহরণস্বরূপ, কৃত্রিম আর্ন্তজাতিক ভাষা, গাণিতিক ভাষা, অনুষ্ঠানসূচিকরণের ভাষা এবং এমন আরো।

আমাদের আলোকপাত হবে স্বাভাবিক ভাষা, বিশেষত ইংরেজির ওপর উপরে বর্ণিত কারণে।

ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষণ (Perception)

চিন্তন হতে প্রত্যক্ষণকে চিহ্নিতকরণ/পৃথকীকরণের ধারণা চিন্তার ক্ষেত্রে আমাদের গতানুগতিক অভ্যাসকে অপরিহার্যভাবে পরিবর্তন করবে। ভাব, ধারণা, এবং বিষয়াদি প্রতীক ছাড়া কিছু নয়। এটা সত্য যে, এদের কতকগুলো অমূর্ত, অন্যগুলো আয়ত্তযোগ্য; তবে, প্রকৃতপক্ষে, এগুলো প্রতীক হিসেবে অভিন্ন বাস্তবতা হতে

www.pathagar.com

আমাদের ব্যাখ্যার অন্তর্গত। তথাপি, যা সমষ্টিগতভাবে সমর্থিত হয়েছে তার বিপরীত আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে, এমন অবস্থা রয়েছে যেখানে অমূর্ত ধারণাকে সহজে উপলব্ধি করা যায় নিখাঁদ বস্তুর তুলনায়। আপনার চারদিকে তাকান, আপনি কি দেখেন না যে সূর্য চারদিকে ঘুরছে? আপনার চলন্ত যানবাহনের বিপরীত দিকে গাছপালা চলে যাচ্ছে? আপনার চারপাশের পানিতে যখন তাকান তখন আপনার শরীর গতিময় রয়েছে? এখন আপনি সবিনয়ে বিশ্বাস করবেন আপনার চক্ষু দুটিতে এবং সন্দেহ করতে বাধ্য হবেন বাস্তব যেমন তেমন দেখতে আপনার সামর্থ্য সম্বন্ধে।

দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক বিতর্কের অগ্নিগর্ভ হৃদয়ের ইস্যু হিসেবে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষণ সর্বদাই আছে এবং সর্বদাই থাকবে। বস্তুগত দৃষ্টিকোণ হতে বাস্তবতা তাই যা প্রকাশিত এবং তাই এটা উপলব্ধি করা যায়, বোঝা যায় এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিশ্লেষণ করা যায়।

বহির্জগতের বর্ণনার সাধারণ প্রক্রিয়ায় মানবিয় অনুসন্ধান এই সাদাসিধা উপস্থাপনা দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। বস্তুবাদে বিশ্বাসী বৈজ্ঞানিকগণ ক্যামেরার সাথে তুলনীয় হতে পারে যার একমাত্র কাজ হচ্ছে কোনো প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই বাস্তবতার প্রতিলিপি করা যেভাবে এই বিশেষ বাস্তবতা বোঝা যায়।

এটা সত্য যে জার্মান দার্শনিক কান্ট সেই ব্যক্তি যিনি ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষণের একটি নতুন উপলব্ধির সূচনা করেন। তার মতে, বাস্তবতার দুটো রূপ রয়েছে; প্রথমটি হচ্ছে বাস্তবতা যেমন তেমনটিই, এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে বাস্তবতা যেভাবে আমাদের সামনে প্রতিভাত হয় তেমনই। তথাপি, পবিত্র কুরআন বহির্জগত প্রত্যক্ষণ পদ্ধতির একটি উৎপাদনশীল, সমৃদ্ধ ও উর্বর বীজ বপন করেছে। তাই প্রায়শই, কুরআন দৃঢ়তার সাথে উচ্চারণ করে যে, কোনো কিছুর বাস্তবতা তুমি যা দেখছ তা নয়; বরং তুমি যা উপলব্ধি করছ তা-ই। এখানে আমি আমাকে অনুমতি দেব ক্রিয়াপদ প্রত্যক্ষকরা (Perceive) দ্বারা এমনকিছু বোঝবার যা ক্রিয়াপদ দেখা (to see) এর উর্ধ্বে। পবিত্র গ্রন্থ নাসারা (nasara) ও আবসারা (absara) এর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। আক্ষরিকভাবে, উভয় শব্দ দ্বারা দেখা বোঝায়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আল্লাহ তায়ালা পরের শব্দটিকে জিনিসের প্রকৃত দর্শন বোঝাতে ব্যবহার করেছেন যা চোখের সরল ও প্রত্যক্ষ দেখাকে ছাড়িয়ে যায়।

www.pathagar.com

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন শ্রবণের অধিকারী হতে পারত। প্রকৃতপক্ষে অন্ধ তো চোখ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয় (সুরা হাজ্জ ২২ : ৪৬)।

এখানে দেখার প্রকৃত হাতিয়ার হচ্ছে হৃদয়। যাকে মানব কাঠামোর অপরিহার্য অংশ হিসেবে কুরআনের প্রেক্ষিতে দেখা হয়েছে। কুরআনের এই অভিমত আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দ্বারা সমর্থিত। কোনো কোনো সময়, আমরা কোনো কিছুর দিকে তাকিয়ে থাকি, কিন্তু তা দেখতে ব্যর্থ হই। চোখসহ দেখার যে শারীরিক গঠন, বস্তু এবং আলো একটি স্বাভাবিক পথে কাজ করে। এতদ্সত্ত্বেও, যেহেতু আমরা রশ্মিকেন্দ্র হারিয়ে ফেলি, তাই আমাদের সামনের জিনিস দেখতে ব্যর্থ হই। আল্লাহ তায়ালা স্বাভাবিক প্রপঞ্চসমূহের জন্য আমাদের অসাধারণ (অপ্রচলিত) ব্যাখ্যা খোঁজ করা এবং কোনো কিছুর ঊর্ধ্বে দেখা চান। সুরা আন-নামলে আমরা তিলাওয়াত করে থাকি :

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

এবং তুমি পর্বতমালা দেখে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত মনে করছ, কিন্তু ওরা মেঘপুঞ্জের ন্যায় সঞ্চরমান হবে। এ আল্লাহ তায়ালারই সৃষ্টিনৈপুণ্য যিনি সবকিছুকে সর্বাঙ্গীন করেছেন। তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত (সুরা নামল ২৭ : ৮৮)।

চূড়ান্ত সত্যকে উপলব্ধির ক্ষেত্রে মানবিয় প্রত্যক্ষণ হবে দৃষ্টির ঊর্ধ্বে। এমন সব লোক আছে যারা জ্ঞান অর্জনে তাদের ইন্দ্রিয়ের ওপর নির্ভর করে এবং তার বাইরের

বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে। তারা নিন্দিত, কারণ তাদের জ্ঞান বাস্তবতার পরিবর্তে দেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

www.pathagar.com

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ

ওরা পার্থিব জীবনের বাইরের দৃশ্য সম্বন্ধে অবগত। (উদাহরণস্বরূপ, তাদের জীবনযাত্রার বিষয়াদি যেমন- সেচ করা, অথবা বীজ বপন অথবা ফসল পাকান ইত্যাদি) এবং আখিরাত সম্বন্ধে ওরা গাফিল (আর-রূম : ৭)।

আমরা কিভাবে বহিঃজগতকে প্রত্যক্ষণ করি তার সাধারণ প্রক্রিয়ার অধিকাংশ উপাদানই মনে হয় প্রকৃতপক্ষে সর্বজনীন ও যথাযথ। আমরা যা দেখি তাতে কঠিনভাবে বিশ্বাস করতে চাই। আমাদের প্রতিদিনের অভিব্যক্তি এই দাবিকে সমর্থন করে। আমরা আমাদের মতামত ব্যক্ত করি এবং যা আমরা বিশ্বাস করি, অবলোকন অথবা আমি দেখি কিংবা প্রত্যক্ষ দর্শন এবং এরকমের পরিভাষায়। তবে, ইন্দ্রিয়জাত প্রত্যক্ষণ বিষয়ে গবেষণা এই প্রবণতা শুদ্ধকরণে প্রকৃত অবদান রেখেছে। আমাদের চোখ কখনও ফাঁকি দেয়। এমন অবস্থাও হয় যখন আমরা দেখি যা আমরা দেখতে চাই সেখানে প্রকৃতই কি রয়েছে তার পরিবর্তে। এই প্রপঞ্চের ফলাফল সহজাত বাস্তবতা এবং আমাদের নিকট প্রতীয়মান বাস্তবতার মধ্যে এক প্রকার মিথষ্ক্রিয়া। এর বিশ্লেষণে আসুন উদাহরণ পেশ করি।

নিবিড়ভাবে এই নকশাটির দিকে দেখুন, আপনি হারম্যান গ্রিড নামে পরিচিত প্রতিচ্ছেদগুলোর ধুসর এলাকা দেখবেন।

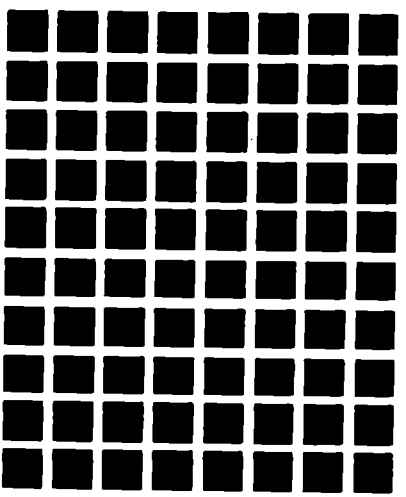

www.pathagar.com

আরো কিছু দৃষ্টিসংক্রান্ত বিভ্রান্তি সাংস্কৃতিকভাবে পরিবর্তনশীল মনে হয়। একটি উদাহরণ হচ্ছে মূলার-লায়ার জাদু ...।

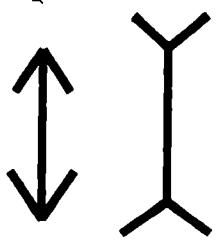

এই জাদু (illusion) টি সুপরিচিত। আমরা প্রায় সবাই সজাগ যে উল্লম্ব রেখা এখানে প্রকৃতপক্ষে একই আকৃতির, কিন্তু ডান-দিকের রেখাটিকে প্রকৃতপক্ষেই লম্বা দেখায়। কেন ডানদিকের রেখাটিকে এত লম্বা দেখাচ্ছে তার একটি ব্যাখ্যা ছবিটিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণের মধ্যে নিহিত রয়েছে। ডানদিকের ছবিটিকে সহজেই কোনো কক্ষের ভেতরকার কোণা বলে বিশ্লেষণ করা যায়। যেখানে তীরের মতো বামদিকের ছবিটিকে দালানের বাইরের দিকের কোণা হিসেবে দেখা যায়। ভেতরের কোণা হিসেবে ডানদিকের ছবিটিকে নিকটতর মনে হতে পারে (এবং তাই বৃহত্তর) বাইরের কোণার চেয়ে।

ঊর্ধ্বমুখী বিভ্রমটি (illusion) নিম্নে দেখানো হলো।

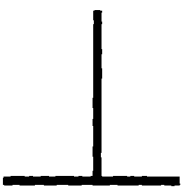

রেখাগুলো সমান লম্বা কিন্তু ঊর্ধ্বমুখী রেখাটিকে দীর্ঘতর মনে হয়। এমন হতে পারে, কারণ ঊর্ধ্বমুখী রেখাটিকে গভীরতায় মিলিয়ে গেছে মনে হয়। এই বিভ্রমটি ঐসব লোকের জন্য শক্তিশালী হতে পারে যারা একটি বিবেচনাযোগ্য দূরত্বে প্রোথিত সরল রেখার সাথে পরিচিত। এমন যুক্তি দেখানো হয়েছে যে যেসব লোকেরা পরিবেষ্টিত এলাকা যেমন জঙ্গলে বাস করে যারা বিশাল উন্মুক্ত স্থানে অভ্যস্ত নয় এবং যাদের সামান্যই সুযোগ ঘটে দিগন্ত দেখার। কিংবা বিশাল দূরত্বের কারণে ঊর্ধ্বমুখী-দিগন্তরৈখিক বিভ্রম সম্পর্কে দীর্ঘ বাধাহীন দৃশ্য দেখার সুযোগ পায় এমন লোকদের চেয়ে কম সংবেদনশীল হবে।

www.pathagar.com

পরবর্তী নকশাটি দেখুন ...

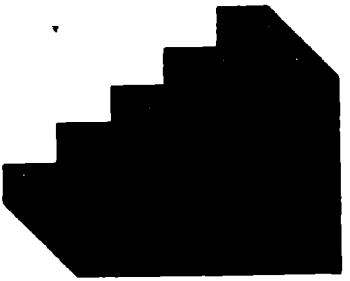

এই নকশাটির (image) দ্রুত বর্ণনা চাওয়া হলে অনেক লোকই বলবে ঊর্ধ্বগামী কতকগুলো সিঁড়ি। কিন্তু আপনি অবশ্যই সিঁড়িগুলোর ওপরে দু'পথেই যেতে পারবেন। বাম হতে ডানে পড়ার পাশ্চাত্য শৈলী দ্বারা এই জবাব প্রভাবিত মনে হতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আরবরা এটাকে নিচে ধাবমান সিঁড়ির (ডান হতে বামে) সমাহার হিসেবে পড়বে।

এখানে একটি বিখ্যাত অসম্ভব বস্তু (impossible object) রয়েছে, সময়ে এটি শয়তানের কালো কাঁটা (Devil's Pitchfork) নামে পরিচিত ...।

এটির দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকানোর পর মুখ ফিরিয়ে নিন এবং এটিকে আঁকার চেষ্টা করুন। সেখানে কি তিনটি দণ্ড আছে, না কেবল দুটি? বিস্ময়করভাবে নয়, মাঝেমাঝে দুই-দণ্ডের ত্রিশুল বলে এই ছবিটির স্ববিরোধী অথচ সত্য নাম দেওয়া হয়। এটি একটি অসম্ভব বস্তু কারণ তিন মাত্রায় এটিকে গঠন করা যাবে না-প্রথম দৃষ্টিতে কেবল এটিকে তিন মাত্রায় প্রতীয়মান হবে। এটিকে উপলব্ধি করার জন্য আপনাকে পুরাপুরি সাবধানতার সাথে দেখতে হবে। অনেক পাশ্চাত্য পর্যবেক্ষককে এই চিত্রটি ধোঁকায় ফেলেছে। এটিকে ত্রি-মাত্রিক চিত্র বলে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হতেই এ ধোঁকার উৎপত্তি।

www.pathagar.com

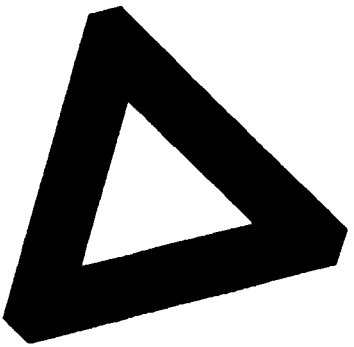

এমন মনে হতে পারে যে একই প্রক্রিয়ার অনেকটাই এখানে কাজ করছে। যখন এর প্রতিটি ছেদক—অংশ এর নিজস্ব ভাব তৈরি করে, অংশগুলো দৈহিকভাবে একত্রে সংযোজিত করা যাবে না। আমাদের ত্রিমাত্রিকতার একটি শক্তিশালী বিভ্রান্তি রয়েছে। কারণ আমরা প্রাথমিকভাবে এটা লক্ষ্য করি না কিভাবে অংশগুলো পরস্পর সম্পৃক্ত।

দর্শনগত প্রত্যক্ষণ সূত্রাদি

ঐ সূত্রসমূহ জেসট্যাল্ট-এর (Gestalt) গোষ্ঠীকরণ সূত্র (Grouping) নামে পরিচিত। এগুলো আমাদের প্রতিষ্ঠিত নকশার ব্যাখ্যা দেয় কিভাবে আমরা আমাদের সম্মুখের বস্তু দেখি। পরিবর্তনের সামর্থ্য অথবা প্রত্যক্ষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত নকশা অতিক্রমণ হতে সৃজনশীলতার আবির্ভাব ঘটে। যদিও এখানে আমাদের আলোকপাত দর্শনগত প্রত্যক্ষণের ওপর, অন্য ধরনের প্রত্যক্ষণ প্রক্রিয়াও একই অতিক্রমণ নকশাকরণ সূত্রের অধীন হতে পারে। এখানে এমন কতকগুলো সূত্রের বর্ণনা দেওয়া হলো।

সূত্র -১ : নিকটতমের সূত্র (Law of Proximity)

নিকটতমের (Proximity) সূত্র মতে, যেসব বস্তু পরস্পরের নিকটবর্তী, সেগুলোকে গোষ্ঠী হিসেবে খুবই দৃশ্যমান মনে হতে পারে। নিচের ছবিতে ঐ বাক্সগুলোকে আমরা গোষ্ঠী হিসেবে প্রত্যক্ষ করতে পারি যেগুলো একে অপরের নিকটতম। মনে রাখতে হবে যে আমরা বাম দিক হতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাক্সগুলোকে জোড়া হিসেবে দেখি না, কারণ তাদের মাঝখানে যথেষ্ট ফাঁক রয়েছে।

www.pathagar.com

সূত্র-২ : সমরূপতার সূত্র (Law of Similarity)

সমরূপতার সূত্র আমাদের দর্শন-সংক্রান্ত ক্ষেত্রের অংশসমূহকে একত্রে সংযুক্ত করতে সাহায্য করে, যেগুলোর মধ্যে রং, উজ্জ্বলতা, বয়নবিন্যাস, আকৃতি, কিংবা অন্যান্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। একারণেই নিম্নের ছবিতে আমরা বস্তুর স্তম্ভ কিংবা অন্য বিন্যাসের পরিবর্তে সারি প্রত্যক্ষ করি।

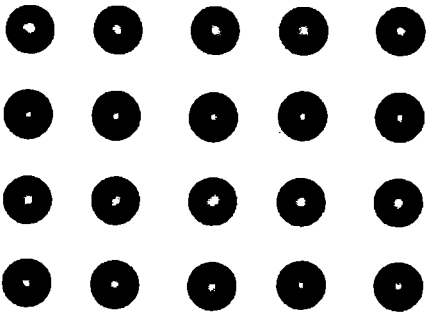

সূত্র- ৩ : লাগাতারের সূত্র (Law of Continuity)

অবিচ্ছিন্নতার বা লাগাতার-এর সূত্র আমাদেরকে একটি রেখার দিকে চালিত করে যা একটি বিশেষ দিকে লাগাতারভাবে চলমান, উল্টোদিকে দিক পরিবর্তন-এর পরিবর্তে। নিচের চিত্রের বামদিকেরটি অংকনে আমরা দেখি বৃত্তাকার রেখাসহ একটি সোজা রেখা যা একে ভেদ করে গেছে। লক্ষ্য করুন যে ডানদিকের চিত্রটিকে আমরা দু'টুকরা নিয়ে গঠিত চিত্র হিসেবে দেখি না।

www.pathagar.com

সূত্র- ৪ : সরলতার সূত্র (Law of Simplicity)

নিচের চিত্র দেখুন। আপনি বিচিত্র পথে এটিকে প্রত্যক্ষণ করতে পারেন। তিনটি অংশত আবৃত চাকতি হিসেবে; একটি পূর্ণ চাকতি এবং দুটো আংশিক চাকতি হিসেবে যাদের ডানদিকের বহির্ভাগে ফালি কেটে বাদ দেওয়া : অথবা এমনকি ত্রি-মাত্রিক, বেলুনাকার বস্তুর ওপরিভাগের দৃশ্য হিসেবে। সরলতার সূত্র বলে যে, আপনি বিস্তারটি দেখবেন তিনটি অংশত আবৃত চাকতি হিসেবে, কারণ এটাই সরলতম ব্যাখ্যা। আপনি লক্ষ্য করতে পারেন এই চিত্রটি অবিচ্ছিন্নতার সূত্রেও খাটে।

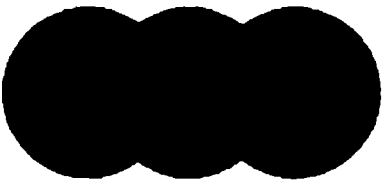

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

যুক্তিপ্রদর্শন (Argumentation)

বক্তব্যের প্রকার

যৌক্তিক বিবেচনা কী (What is Reasoning)

আমাদের বক্তব্য হচ্ছে একপ্রকার ক্রমবদ্ধ বাক্যসমূহ অথবা বক্তব্যের পরম্পরা। ঐসব বাক্য যেভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয় তা গবেষণার এক ক্ষেত্র হতে অন্য ক্ষেত্রে পৃথক। ব্যাকরণে, বাক্যসমূহকে বিভক্ত করা হয়েছে :

আদেশমূলক (Imperative) : অর্থাৎ এই বাক্য আদেশ জারি করায় ব্যবহৃত হয়।

ঘোষণামূলক : (Declarative) : এমন বাক্য যা সত্যতা দাবি করে বা তথ্য পৌঁছে দেয়।

প্রশ্নবাচক (In terrogative) : এটি সেই বাক্য যা প্রশ্ন করতে ব্যবহৃত হয়।

যুক্তিবিদ্যায় অবস্থা একই রকম; একটি বক্তব্য ঘোষণা মূলক এবং হ্যাঁ-বাচক বাক্য যা দাবি করে যে প্রদত্ত তথ্য সত্য বা মিথ্যা হওয়ার জন্য দায়ি।

আরো অনেক ধরনের বাক্য রয়েছে ব্যাকরণবিদদের দ্বারা পৃথকীকৃত, যেগুলো বর্তমান অধ্যয়ন সীমার বহির্ভূত।

যে কোনো বাক্যই হয় সরল না হয় যৌগিক।

সরল বাক্য দ্বারা আমরা এমন বক্তব্য বুঝি যা একটি ভাব প্রকাশ করে। উদাহরণটি নিম্নে দেওয়া হলো :

আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়ায় অবস্থিত

এই বাক্যে, মাত্র একটি দাবি প্রকাশিত হয়েছে।

এই উদাহরণটি বিবেচনা করুন :

www.pathagar.com

আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়ায় অবস্থিত।

অতএব, এটি কোনো ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় নয়।

এটি একটি যৌগিক বাক্যের দৃষ্টান্ত, যা দুই বা ততোধিক সরল বাক্যকে সমন্বয়কারী অব্যয় দ্বারা সংযুক্ত হয়। এই সমন্বয়কারী অব্যয় ওপরের দৃষ্টান্তমূলক বাক্যে : অতএব (therefore)।

দুটি বাক্য হচ্ছে :

১. আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়ায় অবস্থিত।

২. এটি কোনো ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় নয়।

সংযোগকারী অব্যয় *অতএব* ব্যবহার দ্বারা, আমরা অনুভব করি যে প্রথম হতে দ্বিতীয় বাক্যে একটি যৌক্তিক চলন রয়েছে। এ স্থানান্তর মানসিক; কারণ আমরা একথা বলার জন্য কারো প্রয়োজনবোধ করি না যে বিশ্ববিদ্যালয়টি ইউরোপীয় নয়। আমরা প্রথম বক্তব্যের ওপর নির্ভর করেই কেবল আসতে পারি। এটাই তাই যাকে আমরা যুক্তি বলি যেমনটি আমরা পরে দেখবো।

যে কোনো দুই বা ততোধিক সরল বাক্য একত্রে কোনো সংযোজক দ্বারা যুক্ত হলে তাকে বলা হয় যুক্ত বাক্য (congests)।

আমরা যাকে কথোপকথন বলি তা গঠন করে যৌগিক বাক্যসমূহ। তার মানে এ নয় যে, যে কোনো কথোপকথনই যুক্তি (reasoning) ধারণ করবে। কেবল কথোপকথন যেখানে বক্তব্যের দাবি উপস্থাপন করে অথবা যুক্তিদ্বারা বর্ণিত ঘটনাকে যুক্তি নির্ভর কথোপকথন বিবেচনা করা হয়। মনে রাখতে হবে যেকোনো যুক্তিই হচ্ছে কোনো বক্তব্যে কিছুটা নির্ভর করা। এক ভাব হতে অন্য ভাবে চলে যাওয়া যা নিয়ে কথোপকথন তৈরি হয়। এ ধরনের চলে যাওয়া বা চলনের অভাব মানেই যুক্তির অভাব।

যুক্তিসমূহ (Arguments)

যাকে আমরা যৌক্তিক (reasoning) বিবেচনা এবং যুক্তি বলি, আমাকে যদি এদের মধ্যে তুলনা করতে হতো, আমি বলতাম যে এক বক্তব্য হতে আরেক বক্তব্যে যৌক্তিক চলনের প্রক্রিয়াই হচ্ছে যৌক্তিক বিবেচনা। এভাবে, যৌক্তিক বিবেচনা (reasoning) শব্দটি ভাষাগত কাঠামো কিংবা বক্তব্যের আনুষ্ঠানিক সাজসজ্জার

www.pathagar.com

চেয়ে মানসিক ক্রিয়াকলাপের সাথেই বেশি সম্পর্কযুক্ত। একই সাথে যুক্তি হচ্ছে অধিকতর কাঠামো সংক্রান্ত যাতে কথোপকথন চলে। যুক্তি শব্দটি দ্বারা, আমরা যেকোনো কথাবার্তা বোঝাতে পারি যার একটা নির্দিষ্ট যৌক্তিক কাঠামো রয়েছে। এ কাঠামোর মধ্যে কমপক্ষে একটি বক্তব্য থাকবে একই সংলাপের সমর্থনে কিংবা তাতে প্রযোজ্য সম্ভাব্যতা তৈরি বা বাতিলকরণের উপাদান হিসেবে। যৌক্তিক বিবেচনা যুক্তির চেয়ে পৃথক— ওপরে প্রদত্ত ব্যাখ্যার এ সত্যতা সত্ত্বেও এ দুটো পরিভাষা প্রায় অভিন্ন অর্থই নির্দেশ করে। এ কারণেই আমি এরপর থেকে এ দুটোর একটিকে অন্যটির বিনিময়ে ব্যবহার করতে থাকব।

মনে রাখতে হবে যে আমাদের সাধারণ ভাষা যুক্তি শব্দটির না-বাচক অর্থ প্রকাশ করে। এটা সাধারণত বাকযুদ্ধ, ঝগড়ার ক্ষেত্রে এবং এমন কথোপকথনে ব্যবহৃত হয়। যার মধ্যে যুক্তি ও বিবেকবোধের অভাব রয়েছে। যুক্তির এই সাধারণ অর্থ এখানে বিবেচনার অবকাশ নেই। যুক্তি গঠন করার জন্য আমাদের কারো ঝগড়া বা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার দরকার নেই। আমাদের যা প্রয়োজন তা হচ্ছে এমন বক্তব্য গঠন করা যা নির্ভুলভাবে আমাদের দাবিকে সমর্থন করে কিংবা আমাদের প্রতিপক্ষের দাবিকে যুক্তিপূর্ণভাবে বাতিল করে দেয়। এবং সর্বোপরি কোনো বিবাদ বা চিৎকারের প্রয়োজন নেই।

যেকোনো যুক্তিরই দুটো অংশ রয়েছে : যৌক্তিকতা ও উপসংহার।

যৌক্তিকতা (Reason)

কোনো কিছু প্রতিপন্ন করতে, কোনো ঘটনা বা দাবি সমর্থন বা ব্যাখ্যায় উপস্থাপিত বক্তব্যকে (টমাস, পৃষ্ঠা ১১) যৌক্তিকতা বলা হয়। তবে সব যৌক্তিকতাই কোনো প্রদত্ত দাবিকে প্রতিপন্ন করতে পারে না কতকগুলো শর্ত পূরণ না করা পর্যন্ত, যার প্রথমটি হচ্ছে সত্য কারণ থাকা এবং মিথ্যা না হওয়া।

সত্য কারণ এবং একটি মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে হলে নিম্নের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা যায় :

যেহেতু আমি অসুস্থ আমি আমার সান্ধ্যকালীন ক্লাসে উপস্থিত থাকতে পারব না।

এখানে যে কারণ উপসংহারকে সমর্থন করে তা হচ্ছে একটি সত্য কারণ, এই হেতু যে আমরা জানি অসুস্থতা ক্লাসে উপস্থিতির পথে একটি বাধা। তা সত্ত্বেও, আমি সত্যিই অসুস্থ নাকি ঠিক অসুস্থতার ভান করছি তা তাদের আওতার বাইরে যারা আমার বক্তব্য মূল্যায়নে আগ্রহী।

www.pathagar.com

যেহেতু আগামীকাল বৃষ্টি হবে, আমি আমার পরীক্ষায় পাশ করব।

এ বাক্যের প্রথম অংশ : যেহেতু আগামীকাল বৃষ্টি হবে-এটা নিমিত্ত, কারণ এটি বাক্যের দ্বিতীয় অংশকে সত্য বলে প্রতিপন্ন করে ও সমর্থন করে তা হলো : আমি আমার পরীক্ষায় পাশ করব। তবে এই হেতুটিকে অস্বাভাবিক মনে হয়, কারণ বৃষ্টি ও পরীক্ষায় পাশ করার মধ্যে কোনো যুক্তিসংগত সম্পর্ক নেই, যতক্ষণ না এমন দাবির পেছনে ব্যক্তিগত কোনো কারণ না থাকে। যাতে আমরা বক্তার সাথে অংশ নিতে অসমর্থ। এ ঘটনায় বিষয়টি যুক্তির বাইরে পড়ে, এমনকি এমনও ঘটবে যে প্রত্যাশা অনুযায়ী বৃষ্টি হয়েছে এবং দাবি অনুযায়ী আমি পাশ করেছি, যুক্তিটি বৈধ নয়। এর অর্থ হচ্ছে কোনো দাবির সমর্থনে প্রদত্ত যুক্তির সবগুলোই বৈধ যুক্তি নয়, এবং সব সত্য কারণই বৈধ কারণ নয়। অতএব, যুক্তিবিদ্যা অধ্যয়নের অংশ হচ্ছে ভালো কারণ ও মন্দ কারণের মধ্যে কিভাবে পার্থক্য করতে হয় তা জানা।

প্রতিদিনের যোগাযোগে আমরা অনেক শব্দ ব্যবহার করি যা যুক্তি প্রদর্শন করে। এগুলো প্রায় যুক্তির আগে থাকে এবং সিদ্ধান্ত নির্দেশকের ভূমিকা পালন করে। যেহেতু (as) ... অতঃপর (since) ... এজন্য যে (for) ... কারণ (because) কারণ যে (because that) ... এ কারণে যে (for this reason that) ... এ ঘটনার দৃষ্টিকোণ হতে যে (in view of the fact that) ... শুদ্ধ অনুমানের ভিত্তিতে যে (on the correct apposition that) ... যেমন আমরা ধরে নিতে পারি যে (assuming as we may that)...

উপসংহার

কারণ উল্লেখ করে আমরা যা সমর্থন করি কিংবা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করি তাই উপসংহার। এর অর্থ হলো যুক্তি হতেই উপসংহার আসে। কোনো মিথ্যা অজুহাত কেন মিথ্যা উপসংহারে উপনীত করে তার কারণ এটাই। যুক্তিবিদ্যার কারণ বা উপসংহার পৃথকভাবে কি বলে তা কোনো বিষয় নয়, বরং তাদের মধ্যে সম্পর্কই গুরুত্ব দাবি করে।

আরো অন্যান্য শব্দ রয়েছে যা উপসংহার ব্যক্তকরণে সিদ্ধান্ত নিদের্শক হিসেবে কাজ করে। তারা সর্বদাই কোনো প্রদত্ত যুক্তির উপসংহারের পূর্বগামী।

এখান থেকে (hence)... অতএব (therefore)... তদনুযায়ী (accordingly) ... সুতরাং (so)... প্রমাণ করে যে (proves that)... ইঙ্গিত দেয় যে (implies

www.pathagar.com

that)... প্রদর্শন করে যে (demonstrates that)... তারপর (then)... এভাবে একজন দেখে যে (in this way one sees that)... আমি এভাবে শেষ করব যে (I conclude that)...

যুক্তির কাঠামো (Structure of an Argument)

যুক্তি এবং নিছক মতামত অথবা অন্যান্য অ-যুক্তিসম্মত কথাবার্তার মধ্যে পার্থক্যের ক্ষেত্রে আমাদের এ দাবি পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে, এই দাবি সমর্থনের দায় কমপক্ষে একটি বৈধ কারণ দ্বারা সমর্থিত কিনা, যার ওপর ভিত্তি করে নিয়মানুযায়ী উপসংহারে পৌঁছানো যায়। এই পরীক্ষা প্রামাণ্য আকারে, যা বলতে যুক্তি বোঝায়, কোনো দাবি পুনর্গঠনের পরামর্শ দেয়। আমরা ২৮ অক্টোবর, ১৯৯৯ সালে পারমাণবিক শক্তির উন্নয়ন[২৩৯] বিষয়ে আমেরিকান সিনেটর জেফ্ সেশনস্ প্রদত্ত বক্তৃতা হতে কিছু নির্যাস দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। তিনি বলেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদিত শক্তির ২০% ভাগ উৎপাদিত হয় পারমাণবিক শক্তি দ্বারা। ফ্রান্সে ৮০% ভাগ। তারা নিয়মিতভাবে শক্তিকেন্দ্র নির্মাণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে...। আমাদের কাম্যতা কোম্পানিগুলো ১৯৭০ এর দশক হতে কোনো নতুন কেন্দ্র চালু করেনি ...। অন্যান্য শিল্পসমৃদ্ধ রাষ্ট্র এগুলোর নির্মাণ চালিয়ে যাচ্ছে, যেমন : ফ্রান্স, জার্মানি ও জাপান ... বলছে চীনের পারমাণবিক শক্তি থাকতে পারে কিন্তু কেন আমাদের নয়? এখন আমরা পরীক্ষা করে দেখতে চাই এখানে কোনো যুক্তি আমাদের সামনে আছে কিনা। যেমন আমরা আগেই বলেছি যুক্তি হতে হলে তাকে নিম্নলিখিত শর্তসমূহ পূরণ করতে হবে :

প্রথমত, এটাকে দাবি হতে হবে (কোনো অনুরোধ, কিংবা আদেশ বা বর্ণনা নয়)।

দ্বিতীয়ত, এ দাবির সমর্থনে কমপক্ষে এক টুকরো সাক্ষ্য প্রমাণ থাকতে হবে কারণ হিসেবে যা দাবির বিষয়বস্তু প্রতিপন্ন করবে।

তৃতীয়ত, একটি সিদ্ধান্ত অবশ্যই থাকতে হবে হয় ব্যক্ত না হয় প্রযোজ্য।

উপরে উদ্ধৃত বক্তৃতায় দাবি হচ্ছে আমেরিকার উচিত পরমাণু শক্তির উন্নয়ন সাধন।

কারণ হচ্ছে : অনেক শিল্পসমৃদ্ধ দেশ তাদের পরমাণু শক্তির উন্নয়ন করেছে।

---

[২৩৯] Criticalthinking and Communication in use of Reason in Argument, (Edward, S. Inch & Barbara Warnick) Allyn and Bacon, ২০০২, পৃষ্ঠা ১৪।

www.pathagar.com

সিদ্ধান্ত হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেরও কর্তব্য এর পরমাণু শক্তির উন্নয়ন সাধন করা (এটা দাবির মধ্যেই রয়ে গেছে)।

এখানে আমরা যুক্তির একটা প্রামাণ্য রূপ পাই, সেটা হচ্ছে :

দাবি (Claim)

কারণ (Reason)

সিদ্ধান্ত (Conclusion)

মনে রাখতে হবে যে, আমরা এই যুক্তির বৈধতা পরীক্ষার প্রক্রিয়ায় নেই। কারণ এক্ষেত্রে আমাদের যাচাই করতে হবে এই দাবির পক্ষে আনীত সাক্ষ্যের সত্যতা। আমরা যদি ওপরের দাবির বিপক্ষে যুক্তি পেশ করি তাহলে আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে সাক্ষ্য সত্য নয়। এটা সফলভাবে করলে সিনেটরের দাবি ভুল প্রতিপন্ন হবে। যদিও তার যুক্তির আনুষ্ঠানিক কাঠামো পূর্ণাঙ্গ।

যেকোনো যুক্তি প্রদানমূলক বিতর্কে আমাদের অন্যদের দাবির বিরুদ্ধে দু'ধরনের যুক্তি প্রদান হতে সাবধান থাকতে হবে।

প্রথমটি, সেটাই যাকে আমরা আদর্শমূলক পথ বলি : এখানে আমরা চেষ্টা করি একটি যুক্তিকে মিথ্যা প্রমাণের জন্য এর আনুষ্ঠানিক কাঠামোর সমালোচনা করে কিংবা এর সাক্ষ্যের সত্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন উপস্থাপন করে।

দ্বিতীয়টি, যেটিকে আমি বিতর্কিত পদ্ধতি বলি, তাহলো, যখন আপনি একটি উঁচু, কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক যুক্তির আশ্রয় নেন।

দৃষ্টান্ত : সিনেটরের বিপক্ষে এই বলে এ যুক্তি উপস্থাপন অযথার্থ, যেমন :

ফ্রান্স ও চীন পারমাণবিক শক্তির উন্নয়ন ঘটাচ্ছে এটা যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে-এর উন্নয়নের কোনো যুক্তি নয়। কারণ এটা একই কথা বলা যে যদি ফ্রান্স বা চীন অন্য দেশ আক্রমণের পরিকল্পনা করে, যুক্তরাষ্ট্রেরও তাই করা উচিত। এরকম প্রতিযুক্তি নৈতিক ও তর্কের দিক থেকে শক্তিশালী। কিন্তু এটা শক্তি অর্জনে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার অবস্থায় অপ্রাসঙ্গিক, কারণ যেকোনো দেশেরই তার পরমাণু শক্তি উন্নয়নের অধিকার রয়েছে তার নিজ নিরাপত্তার জন্য এতদ্‌সত্ত্বেও, আমরা জানি যে, পারমাণবিক শক্তি উন্নয়নের দৌড় বিধ্বংসী ফল বয়ে আনতে পারে। এই প্রতিউত্তরের অবৈধতা এর কাঠামো বা যৌক্তিক রূপের চেয়ে প্রাসঙ্গিকতার ধারণার মধ্যে নিহিত।

www.pathagar.com

এর ওপর আরো আলো ফেলতে হলে, নিম্নের সংলাপটি বিবেচনা করুন :

পুত্র : বাবা, আমি শিল্পকলা (art) পড়ব।

পিতা : না, আমি তোমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে দিতে পারি না। তুমি কি বেকার থাকতে চাও?

পুত্র : আমাদের প্রতিবেশী হামিদ শিল্পকলা পড়েছে এবং সে একটা খুব ভালো চাকরি পেয়েছে।

পিতা : তুমি কি আমাকে একথা বলছ যে যদি হামিদ নিজেকে আগুনে নিক্ষেপ করে থাকে তুমি তাকে অনুসরণ করবে?

এখানে বাবার প্রতিযুক্তি নিম্নরূপ :

যেহেতু তুমি হামিদকে অনুসরণ করতে পারো না যদি সে নিজেকে আগুনে নিক্ষেপ করে, তুমি তার অধ্যয়ন ক্ষেত্র অনুসরণের পথ ধরতে পারো না। এ যুক্তি অপ্রাসঙ্গিক এ কারণে যে শিল্পকলা অধ্যয়ন করলে নিজেকে আগুনে নিক্ষেপ ছাড়া কিছুই করার থাকবে না, এর স্বাভাবিক কাঠামো বৈধ হলেও।

যুক্তির পূর্ণতা ও বৈধতা (Soundness and Validity of Arguments)

কোনো যুক্তিকে বৈধ ও পূর্ণ হতে হলে নিম্নলিখিত শর্তসমূহ পূরণ করতে হবে :

প্রথম, দাবির সমর্থনে আনীত কারণগুলোকে অবশ্যই সত্য হতে হবে।

দ্বিতীয়, সিদ্ধান্তের সাথে কারণের সংযোগ যৌক্তিক ও বৈধ হওয়া উচিত। এর অর্থ হচ্ছে এই যৌক্তিক সম্পর্ক অবশ্যই এমন হবে যে যদি কারণসমূহ সত্য হয়, তাহলে সেগুলো সিদ্ধান্তের সত্যতার নিশ্চয়তা বিধান করবে।

প্রথম শর্তটির কারণসমূহের উপাদান নিয়ে করার রয়েছে; এখানে উপাদানের কোনো পরীক্ষা এ উপাদান গঠনে ভরের সত্যতামূল্যের ওপর জোর দেবে। সাধারণত বাস্তবতায় উপনীত হতে এটা করা হয় যাতে কারণসমূহ সত্যিকার ভাবে বাস্তবতাকে ব্যক্ত করে।

আসুন আমরা এই যুক্তিটি বিবেচনা করি

মুসলিমগণ সন্ত্রাসী

আবদুল্লাহ একজন মুসলিম

www.pathagar.com

অতএব আবদুল্লাহ একজন সন্ত্রাসী

এই যুক্তিটির : প্রত্যেক P ও Q এর যৌক্তিক রূপ রয়েছে।

S হলো P

- S হলো Q

যুক্তির এই কাঠামো বৈধ। বলতে গেলে এই কারণ ও সিদ্ধান্তের মধ্যকার সম্পর্ক যৌক্তিকভাবে বৈধ। তবে এই অনুমানের সত্যতামূল্য প্রশ্নসাপেক্ষ কমপক্ষে ঐ সব মুসলিমের দ্বারা যারা সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত হতে চায় না। তাহলে এই যুক্তি বৈধ, কিন্তু এটা পূর্ণাঙ্গ নয়।

যুক্তিবিদ্যায়, বৈধ (valid) শব্দটি ব্যবহৃত হয় একটি বিশেষ প্রায়োগিক পরিভাষা হিসেবে, দ্বিতীয় শর্তটিকে প্রথম শর্ত হতে পৃথকভাবে উপস্থাপনের জন্য। কোনো যুক্তিবিচার দ্বিতীয় শর্তের সাথে সম্পৃক্ত হলে বলা হয় বৈধ (valid) এটা প্রথম শর্ত পূরণ করুক আর না-ই করুক[২৪০]।

এভাবেই, যেকোনো যুক্তি পূর্ণাঙ্গ হতে হলে ওপরে বর্ণিত প্রথম দাবি পূরণ করতে হবে, তা হচ্ছে কারণ বা কারণসমূহের সত্যবাদিতা।

শর্তযুক্ত যুক্তিবিচার (Conditional Reasoning)

পূর্ববর্তী পর্বে আমরা ঘোষণামূলক বাক্য নিয়ে আলোচনা করেছি যা বক্তব্য হিসেবে একটি দাবি উপস্থাপন করে, হতে পারে তা সত্য অথবা মিথ্যা। আরেক ধরনের বক্তব্য রয়েছে যা দুটি সম্পর্কযুক্ত বাক্যের আকারে দাবি উপস্থাপন করে। এই সম্পর্ক এমন যে যদি প্রথমটি সত্য বা পূর্ণাঙ্গ হয় তাহলে তদনুযায়ী দ্বিতীয়টি অবশ্যই সত্য হবে। দৃষ্টান্ত হিসেবে :

১. যদি তুমি এই প্রাণনাশক বিষ পান করো, ২. তুমি মারা যাবে।

এখানে যদি ১. সত্য বা পূর্ণাঙ্গ হয়, তাহলে ২. অবশ্যই সত্য হবে।

১. কে বলা হয় পূর্বগামী এবং ২. অনুগামী

১. ও ২. নিয়ে গঠিত বাক্যের লেবেল : একটি শর্তযুক্ত বাক্য।

---

[২৪০] Practical Reasoning in Natural Language, Stephen Naylorthomas, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৬, Printice Hall, পৃষ্ঠা ১১২।

www.pathagar.com

এখানে, শর্তযুক্ত বাক্য গঠিত হয় দুটি অংশ নিয়ে : একটি পূর্বগামী (antecedent) এবং একটি অনুগামী (consequent)। সংজ্ঞার দিক দিয়ে একটি শর্তযুক্ত বাক্য হচ্ছে দুটি বাক্যের এমন সমাহার যে যদি পূর্বগামী বাক্যটি সত্য বা পূর্ণাঙ্গ হয়, তবে অবশ্যই অনুগামীও এমনই হবে।

শর্তযুক্ত বাক্যের আনুষ্ঠনিক কাঠামো হলো :

১. যদি P হয় তাহলে Q হবে ২. P (৩) তারপর Q

১. P পূর্বগামী বাক্যের পরিবর্তে এবং Q অনুগামী বাক্যের পরিবর্তে। তারপর (১) এভাবে : যদি পূর্বগামী থাকে তাহলে অনুগামী থাকবে।

২. এর অর্থ হচ্ছে পূর্বগামী বাক্য সত্য বা পূর্ণাঙ্গ।

৩. হচ্ছে সিদ্ধান্ত। অর্থাৎ যখন পূর্বগামী P সত্য হবে, তখন অনুগামী Q তদনুযায়ী সত্য।

পূর্বগামী অংশ অনুগামী অংশের সত্যবাদিতা নিশ্চিত করে। উদাহরণস্বরূপ :

যদি আপনি ফরাসি হন, তাহলে আপনি ইউরোপীয়।

এখানে অনুগামী অংশটিও সত্য না হলে পূর্বগামী অংশটি সত্য হতে পারে না। যদি আপনার জাতীয়তা ফরাসি বাক্যটির মধ্যে একটি শক্ত মাত্রার যুক্তিবাদী অবরোহ রয়েছে। কারণ আমরা জানি যে ফ্রান্স একটি ইউরোপীয় দেশ, এটি মেনে চলে যে ফরাসি জাতীয়তার যে কেউ অবশ্যই ইউরোপীয় হবে। অন্তর্নিহিত সিদ্ধান্তসূত্র এভাবে ব্যক্ত করা যায় :

যেহেতু (Since) ফ্রান্স একটি ইউরোপীয় দেশ এবং যেহেতু যেকোনো ফরাসি লোক ফ্রান্সের নাগরিক।

অতএব, যে কোনো ফরাসি ব্যক্তিই ইউরোপীয়।

এ ধরনের শর্তযুক্ত বাক্য নিম্নলিখিতটির চেয়ে পুরাপুরি ভিন্ন :

যদি আবদুল্লাহ আমাকে তার মোটরবাইক দেয়, আমি বাড়ি যাব। এখানে মোটরবাইকে চড়া এবং বাড়ি যাওয়ার মধ্যে কোনো যৌক্তিক সম্পর্ক নেই। যুক্তির বিচারে, এরা, দুটি পৃথক বাক্য। কারণ মোটর বাইকে না চড়েও আমি বাড়ি যেতে পারি। তবে এই শর্তযুক্ত বাক্য সেক্ষেত্রে সত্য হবে যখন আবদুল্লাহ আমাকে তার মোটরবাইক দিয়েছে এবং ঐটির কারণেই বাড়ি গিয়েছি। তাই এটা মনে রাখা

www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ যে একটি শর্তযুক্ত বাক্য সচরাচর জোর দেয় যে, এর অনুগামীগুলো সত্য হবে এর পূর্বগামী সত্য হলে তবেই। একটি শর্তযুক্ত বাক্য জোর দিয়ে বলে না যে অনুগামী যুক্তিসঙ্গতভাবে পূর্বগামী হতে অনুসরণ করবে। একটি প্রকৃত শর্তযুক্ত বাক্যের ক্ষেত্রে এর অনুগামীর জন্য পূর্বগামী হতে যুক্তিসংগতভাবে এর অনুসরণ কাম্য নয়। এখানে যা ঘটে তাহলো যদি পূর্বগামী পূর্ণাঙ্গ হয় এবং অনুগামী পূর্বগামীর দ্বারা শর্তযুক্ত হয়, তাহলে শর্তযুক্ত বাক্যকে সত্য বলা হবে।

বিপরীতভাবে, যদি পূর্বগামী সত্য হয় কিন্তু অনুগামী সত্য না হয় বা না হতে পারে তাহলে এরপর শর্তযুক্ত বাক্যটি যৌক্তিকভাগে মিথ্যা হবে। উদাহরণ :

আমি যদি এই জাদুমন্ত্র পড়ি, তুমি বানরে পরিণত হবে

তবে যখন জাদুমন্ত্র পড়া হলো কিছু ঘটল না। এক্ষেত্রে শর্তযুক্ত বাক্য মিথ্যা।

অবরোহমূলক যুক্তি (Deductive Argument)

অবরোহ বলতে আমরা বুঝি একটি সাধারণ সূত্র হতে বিশেষ অবস্থার সিদ্ধান্ত গ্রহণ[২৪১]। অবরোহ আরোহের বিপরীত যা- যেমন আমরা পরে দেখব- বিশেষ অবস্থা হতে সাধারণ সূত্র গ্রহণের একটি পদ্ধতি।

বারংবার প্রদত্ত বিখ্যাত উদাহরণটি গ্রিক দার্শনিক সক্রেটিসের সময় অবরোহমূলক যুক্তি বিন্যাসে পূর্ণ। এটি নিম্নলিখিত কাঠামো নিয়ে গঠিত :

১. সব মানুষ মরণশীল

২. সক্রেটিস একজন মানুষ

৩. অতএব, সক্রেটিস মরণশীল

এখানে দুটো সূত্র ১. ও ২. তাহলে সিদ্ধান্ত ৩. তদনুযায়ী অবশ্যই সত্য। প্রথম সূত্র সর্বজনীনভাবেই সত্য বলে গৃহীত। কারণ ব্যতিক্রম ছাড়াই সব মানুষের প্রতি এটি প্রযোজ্য।

সব মানুষ মরণশীল একটি ঘোষণা যেটা একটা সূচনাস্থল হিসেবে অন্যান্য অনিষ্পত্তিকৃত বক্তব্যের সত্যতা প্রতিষ্ঠায় কাজ করে। প্রথম সূত্রটি আনুষ্ঠানিক রীতিতে এভাবে লেখা যায় :

সকল P হচ্ছে Q

---

[২৪১] The Oxford English Reference Dictionary.

www.pathagar.com

এর অর্থ হচ্ছে P শ্রেণি A শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। তদনুযায়ী, P মানুষের একটি শ্রেণি যা অন্য শ্রেণি Q-এর অন্তর্ভুক্ত। অন্য কথায়, P এসেছে A শ্রেণির সদস্য হতে।

দ্বিতীয় সূত্র সক্রেটিস একজন মানুষ একজন ব্যক্তিকে অথবা P শ্রেণির একজন বিশেষ সদস্যকে নির্দেশ করার দ্বারা অবস্থাকে সংকুচিত করে এনেছে। এই উদাহরণে ব্যক্তি হচ্ছেন সক্রেটিস এবং P শ্রেণি হচ্ছে মানুষ।

সিদ্ধান্তে সম্মিলিত হচ্ছে ১ ও ২ সর্বজনীনের ভিত্তিতে ব্যক্তিকে বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন করা উদ্দেশ্যে। এখানে সক্রেটিস তার সর্বজনীন শ্রেণির মতো একই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবেন। একটি অবরোহমূলক যুক্তির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত আসবে সূত্র হতে প্রয়োজনীয়ভাবে বা সম্ভাবনার দিক থেকে।

নিম্নের দুটি উদাহরণ বিবেচনা করুন :

১. সকল আরব মুসলিম

আহমাদ একজন আরব

অতএব, আহমাদ একজন মুসলিম

এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত আসছে সূত্র ধরে। কল্পনা করলে, যদি সূত্র নিম্নের দাবি মোতাবেক হয় তবুও ভিন্ন সিদ্ধান্ত সত্য বলে আনয়নের অন্য কোনো সম্ভাবনা নেই।

২. অধিকাংশ আরব মুসলিম

আহমাদ একজন আরব

অতএব, অতি সম্ভবত আহমাদ একজন মুসলিম

প্রথম দুটি পৃথক নির্দেশক সকল এবং অধিকাংশ বাদ দিলে দুটি দৃষ্টান্তকে একই রকম মনে হয়। প্রথম দৃষ্টান্তে, যদি এটা সত্য হয় যে সকল আরবই মুসলিম (যা বাস্তবে সত্য নয়) এবং আহমাদ একজন আরব (আমরা মনে করে নিই এ দাবি সত্য) তাহলে আহমাদ একজন মুসলিম-এ সিদ্ধান্ত অবশ্যই প্রথম সূত্রকে অনুসরণ করবে। যখন দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে নিশ্চয়তার কোনো দাবি নেই যে প্রত্যেক আরব লোক একজন মুসলিম যা সূত্র বলে তা হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ আরব মুসলিম (যা প্রকৃতপক্ষে সত্য) এবং যেহেতু, দাবি অনুযায়ী, আহমাদ আরব-তাহলে এটি পরিণত হচ্ছে একটি সম্ভাব্য, কিন্তু শক্তিশালী সিদ্ধান্তে যে, খুব সম্ভব আহমাদ একজন মুসলিম। এ ক্ষেত্রে এর সত্যতার মূল্য সম্ভাব্যতার পর্যায়ে, এখানে সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেছে সূত্রকে।

www.pathagar.com

গণিতে অবরোহ পদ্ধতির দৃষ্টান্ত

ইউক্লিড-এর মূলসূত্রের প্রথম উপপাদ্য জনগণের প্রশংসিত যুক্তিবিচার পদ্ধতির ভালো দৃষ্টান্ত।

মনে করি আমরা এভাবে একটি ত্রিভুজ আঁকি : ১. A বিন্দুকে কেন্দ্র করে একটি বৃত্ত আঁকি। বৃত্তের পরিধি রেখায় B চিহ্ন দিই এবং A হতে B পর্যন্ত রেখা আঁকি। B কে কেন্দ্র করে A কে ভেদ করে দ্বিতীয় বৃত্ত আঁকি। যেখানে বৃত্ত দুটি পরস্পরকে C বিন্দুতে ছেদ করে এখন C হতে A এবং C হতে B পর্যন্ত রেখা আঁকি।

উপপাদ্য : ত্রিভূজের তিনবাহু ABC সমান দৈর্ঘবিশিষ্ট।

প্রমাণ : |AB| বাহুকে AB রেখাংশের দৈর্ঘ চিহ্নিত করতে দেওয়া হোক, এবং এভাবেই

ধাপ- ১ : |AB| = |AC| কারণ এরা A কেন্দ্রিক বৃত্তের ব্যাসার্ধ।

ধাপ- ২ : |BA| = |BC| যেহেতু এরা B কেন্দ্রিক বৃত্তের ব্যাসার্ধ।

ধাপ- ৩ : |AB| = |BA| যেহেতু AB এবং BA একই রেখা নির্দেশ করে।

ধাপ- ৪ : |AC| = |BC| যেহেতু এরা প্রত্যেকে একই বিষয়ের (যেমন |AB|) সমান।

ধাপ- ৫ : অতএব, |AB| = |AC| = |BC| এক হতে চার ধাপ পর্যন্ত।

অবরোহমূলক যুক্তির সীমাবদ্ধতা

যে কোনো মানবিয় কাজের মতো, অবরোহমূলক যুক্তিরও পূর্ব সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তবে, এটির অভিমত এ নয় যে, এ ধরনের যুক্তিবিচার নির্ভরযোগ্য জ্ঞান প্রদান করে না। নিম্নের উদাহরণ বিবেচনা করুন :

১. আবদুল্লাহ একজন অবিবাহিত; সুতরাং তার স্ত্রী নেই। এই দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্ত সূত্র হতে আপনা আপনিই বের হয়ে আসে। এ ধরনের যুক্তির বৈধতা পুরাপুরিভাবে সূত্রের মূল্য এবং ব্যাচেলর শব্দটির প্রচলিত ভাষাগত অর্থের ওপর নির্ভর করে। এমনকি এ যুক্তিটির কাঠামোও এই ভাব প্রকাশ করে যে, সিদ্ধান্ত সূত্র হতে কিছুটা পৃথক কথা বলে। তবে, এটি কোনো নতুন তথ্য প্রদান করে না কিংবা

www.pathagar.com

সূত্রে ইতিমধ্যে যা বলা হয়েছে তার সাথে কিছু যোগও করে না। কারণ অবিবাহিত থাকার বিষয়টি কোনো যৌক্তিক সূত্র ছাড়াই বোঝায় যে, ব্যক্তির কোনো স্ত্রী নেই। এটা ইংরেজি শব্দকোষ সম্বন্ধে নিছক পরিচয় থাকলেই জানা যায়। যদি শব্দ হতে এর অর্থের দিকে চলনকে তুচ্ছ সূত্র বলে বিবেচনা করা হয়, এ ধরনের যুক্তি আমাদের পূর্ব উপলব্ধিতে কোনো নতুন তথ্য যোগ করে না। অবগতির জন্য এই সূত্রে সিদ্ধান্তটি ইতোমধ্যেই অন্তর্নিহিত।

২. সকল মানুষ মরণশীল

সক্রেটিস একজন মানুষ

অতএব, সক্রেটিস মরণশীল

প্রথম সূত্রটি একটি সর্বজনীন বিবৃতি বা সাধারণীকরণ। মানুষ : এই শ্রেণির সকল সদস্যের ক্ষেত্রে এটি সত্য বলে প্রমাণিত, তাই, এই সূত্রের মধ্যেই সিদ্ধান্তটি অন্তর্নিহিত। যেহেতু সকল মানুষই মরণশীল আমরা ইতোমধ্যেই জানি যে সক্রেটিস বা যে কোনো ব্যক্তিই মরণশীল।

তদনুযায়ী, অবরোহমূলক যুক্তির সিদ্ধান্ত হচ্ছে একটি ভিন্নরূপে ব্যক্ত অথবা তথ্যের পুনর্মিলন যা সূত্রের মধ্যেই রয়েছে। এর অর্থ হলো অবরোহমূলক যুক্তিতে আমরা কোনো নতুনভাবে উপনীত হই না। এই বাস্তবতা অবরোহমূলক যুক্তির সীমাবদ্ধতা হিসেবে পরিচিত। এতদ্‌সত্ত্বেও, যুক্তির কাঠামো নির্মাণ প্রক্রিয়ায় অবরোহের গুরুত্ব প্রশ্নাতীত এজন্য যে এটা অস্পষ্ট/পরোক্ষকে স্পষ্ট/প্রত্যক্ষ করে/ এবং সর্বোপরি, সব লোকই সূত্র হতে সরাসরি সিদ্ধান্ত চয়নের সামর্থ্যের ক্ষেত্রে সমান নয়। আমাদের দৃষ্টিতে, নতুনভাবে সত্য বলা প্রথমবারের মতো, তা আবিষ্কারের চেয়ে কোনো অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

আরোহমূলক যুক্তি (Inductive Argument)

আরোহমূলক যুক্তিবিদ্যা ছিল প্রণালীবদ্ধ আশংকার ফসল যা মুসলিম পণ্ডিতদের দ্বারা অবরোহমূলক যুক্তিবিদ্যার পর্যায়ে আনা হয়েছে। ইউরোপীয় রেনেসাঁ নিজেকে ইতিবাচকভাবে অ্যারিস্টটলীয় যুক্তিবিদ্যা বিষয়ে মুসলিম সমালোচনায় উপনীত করেছে সেই সীমা পর্যন্ত যাতে তারা জ্ঞান অনুসরণের একটি নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে, আরোহমূলক যুক্তিবিদ্যা ছিল যার হাতিয়ার ও বাহন। ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৭) কে প্রথম পশ্চিমা দার্শনিক মনে করা হয় যিনি পাশ্চাত্যে এই নতুন

www.pathagar.com

পদ্ধতির পরিচয় ঘটান এবং এর একটি ব্যবস্থিত বর্ণনা প্রদান করেন। তিনি তার গ্রন্থ : নোভাম অরগ্যানাম (Novum Organum)-এ এমনটি করেন। ইবনে তাইমিইয়ার মতো- যেমনটা আমরা পরে দেখব- বেকন তার সময়ের চিন্তাশৈলীর সমালোচনা করেছেন আরোহমূলক যুক্তিবিদ্যার ওপর এর নির্ভরতার জন্য। তিনি এই মত পোষণ করতেন যে আরোহই হচ্ছে সর্বোত্তম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। একটি বিকাশমান পরীক্ষামূলক মতোবাদ হতে বেকন দাবি করেন যে, বস্তু সম্পর্কে সত্যতা থাকে মনের বাইরে। তার মতে, মানব মন পূর্ণাঙ্গ চিন্তনের পথে অন্তরায় কারণ তা বাস্তবতাকে বিকৃত করে। পরে আরোহমূলক পদ্ধতি জন স্টুয়ার্ট মিল এবং ডেভিড হিউম-এর মতো ব্যক্তিদের দ্বারা আরো উন্নত হয়।

আরোহ হচ্ছে নির্দিষ্ট ঘটনা হতে সাধারণ সূত্রে উপনীত হওয়ার প্রক্রিয়া। এটা যুক্তি কাঠামোবদ্ধ করার অন্য এক পদ্ধতি। যদিও এ ধরনের যুক্তিবিদ্যা এখনো বিধিমালা ও সংজ্ঞার একটি সঙ্গতিপূর্ণ ব্যবস্থায় রূপ লাভ করেনি, সত্যে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে এটা সবচেয়ে শক্তিশালী ফলিত পদ্ধতি হিসেবে রয়ে গেছে। আরোহের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে সীমাহীন যুক্তি যা অবরোহের ভূ-খণ্ডের বাইরে পড়ে, এবং সেজন্য আরোহমূলক যুক্তি হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে। এটা বলা নিরাপদ যে আরোহমূলক যুক্তিবিচার (reasoning) কোনো সংজ্ঞার উদ্যোগের জন্য সুব্যবস্থিত, সঙ্গতিপূর্ণ বা সহজ নয়। তবে, আরোহ সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা পাওয়ার লক্ষ্যে আমরা কিছু আরোহমূলক কৌশল অবলম্বন করব এদের কিছু দিক নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে।

সর্বপ্রথম, পূর্ববর্তী সংজ্ঞায় যেমনটি প্রতিফলিত হয়েছে, আরোহ হচ্ছে বিবৃতি বা সাধারণীকরণ সম্পর্কিত, এভাবে আরোহ হচ্ছে একগুচ্ছ যুক্তি এই মর্মে যে, সবকিছু বা অনেক বস্তু সম্বন্ধে কোনোকিছু হচ্ছে প্রতিপাদ্য, তাদের কিছুসংখ্যক সম্বন্ধে যা লক্ষ্য করা হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে।

এটা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন যে আরোহমূলক বিবৃতি বা সাধারণীকরণ ভিত্তিহীন বিবৃতি বা সাধারণীকরণ বা সংস্কারপূর্ণ অপরিবর্তনীয়তা হতে দূরে স্থাপনযোগ্য।

এই উদাহরণ বিবেচনায় আনুন :

বুশের সম্মেলনে আমি যেসব আমেরিকানের সাথে দেখা করেছি তারা ইরাক যুদ্ধের বিরোধী, অতএব; সকল আমেরিকান যুদ্ধের বিরুদ্ধে।

www.pathagar.com

এর বৈধতা ও যৌক্তিক শক্তি থাকা সত্ত্বেও এই যুক্তিটি একটি আরোহমূলক যুক্তিকাঠামো বিন্যাস করে :

১. গোষ্ঠীর সকল সদস্য কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠদের সম্বন্ধে একটি সিদ্ধান্ত যাতে উপনীত হওয়া গেছে।

২. কথিত গোষ্ঠীর একটি নির্দিষ্ট অংশ ঐ গোষ্ঠীর একটি উপ-সেট বর্ণনা করে। এটাকে নমুনা বলে।

৩. নির্দিষ্ট অংশসমূহের বা নমুনাসমূহের বৈশিষ্ট্য বিবৃতি বা সাধারণীকরণ।

ওপরের দৃষ্টান্তে, যে আমেরিকানদের সাথে আমি সাক্ষাৎ করেছি তারা নমুনা। কারণ আমার জন্য সকল আমেরিকান নাগরিকের কাছ থেকে এই যুদ্ধের পক্ষে বা বিপক্ষে মতামত সংগ্রহ করা অসম্ভব। আমার সাধারণীকরণের লক্ষ্যের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যুদ্ধের বিরুদ্ধে থাকা যেখানে সব আমেরিকান হচ্ছে সেই জনসংখ্যা আমার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া আমেরিকানরা যার উপ-সেট।

আরোহমূলক যুক্তিবিদ্যায়, যদিও আমরা একটি প্রদত্ত জনসংখ্যার সকল উপাদান পর্যবেক্ষণ করিনি, আমরা এর সম্বন্ধে কিছু বৈশিষ্ট্য সাব্যস্ত করতে পারি ঐ জনসংখ্যার কিছু নমুনা সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে।

আরোহমূলক যুক্তির আরেকটি উদাহরণ জরিপে বারংবার মাঝখানে চলে আসে। নিচেরটি বিবেচনা করুন :

যে ৮০% মালেয়েশিয়র সাক্ষাৎকার আমি গ্রহণ করেছি তারা শান্তির পক্ষে, অতএব ৮০% মালয়েশিয় শান্তির পক্ষে;

এ ধরনের বিবৃতি বা সাধারণীকরণ পরিসংখ্যানগত। এটি সম্ভাব্যতা প্রমাণ করে, বাস্তবতা নয়।

ইসলামি পরিভাষায়, আরোহকে ইসতিকর (istiqra) বলা হয়। অনেক মুসলিম পণ্ডিতের মতে, এ ধরনের যুক্তিবিচার, দু'ভাগে বিভক্ত : ইসতিক্রা তা-ম (পূর্ণ আরোহ) এবং ইস্তিকরা নাকিস (অপূর্ণ আরোহ)। প্রথমটির ফলাফল ক্বা'তী (qati) বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান, পরেরটি উৎপাদন করে যান্নী (zanni) বা সম্ভাব্য জ্ঞান।

www.pathagar.com

আরোহের পদ্ধতিসমূহ

যুক্তির পদ্ধতি

এই পদ্ধতিটি বেকন-এর উপস্থিতি ও অনুপস্থিতির ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত। তার মতে, একটি প্রপঞ্চকে বোঝতে আপনার প্রয়োজন এর সাথে সম্পর্ক থাকতে পারে এমন উপাদানসমূহের তালিকা করা। এ উপাদানগুলোকে উপস্থিতির সারণীতে তালিকাভুক্ত করতে হবে। অর্থাৎ, যখন কোনো প্রপঞ্চ (phenomenon) ঘটে তখন উপাদানগুলো উপস্থিত থাকে। আরেকটি সারণীতে থাকবে প্রপঞ্চের অনুপস্থিতিকালে অনুপস্থিত উপাদানগুলো। সমন্বয়ের পদ্ধতির নিম্নবর্ণিত আনুষ্ঠানিক রূপ দেখা যায় :

প্রপঞ্চ A, B এবং C ঘটে X, Y এবং Z এর সাথে

প্রপঞ্চ A, K ও R ঘটে M, N এবং Z এর সাথে

অতএব A হচ্ছে Z এর কারণ।

এটাকে বোঝতে একটি প্রকৃত উদাহরণ পেশ করা যাক।

বিমানবন্দরে মাদক চোরাচালানের তিনটি প্রচেষ্টা সম্পর্কে রিপোর্ট দেওয়া হয়েছিল। সমস্যা হচ্ছে যে কর্তৃপক্ষ জানত না কে দায়ি। কারণ কোনো যাত্রীই স্বীকার করেনি যে মাদকটি তার (স্ত্রী/পুরুষ) ছিল। প্রত্যেকটি যাত্রীকে আনুপূর্বিক তদন্তের পর, তদন্তকারী লক্ষ্য করলেন যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই X দেশ হতে একজন যাত্রী রয়েছে। তারা উপলব্ধি করলেন যে ঐ দেশ হতে ভ্রমণকারী এই ঘটনার জন্য দায়ী।

এই উদাহরণে আমাদের প্রপঞ্চ (P) মাদক চোরাচালানের জন্য দায়ী।

এখানে উপাদান হচ্ছে বিভিন্ন দেশ হতে আগত ভ্রমণকারীগণ

মনে করা যাক যে, প্রথম চালানে : ভ্রমণকারীগণ A, B, C, D, F, G, X এবং R দেশ হতে

দ্বিতীয় চালানে : M, P, K,T এবং X দেশ হতে

তৃতীয় চালানে : ভ্রমণকারীগণ Q, L, Y, X এবং E দেশ হতে

এভাবে X হতে আগত ভ্রমণকারী এর জন্য দায়ী, কারণ সর্বদাই X উপস্থিত যখনই মাদক উদ্ধার করা হয়।

www.pathagar.com

পার্থক্যের পদ্ধতি

এই প্রক্রিয়া অনুপস্থিতির উপাদানকে বিবেচনায় নেয়। ওপরে উদ্ধৃত উদাহরণে, যদি X অন্যান্য দফার ভ্রমণে অনুপস্থিত থাকে কিন্তু P তথাপি উপস্থিত, তাহলে সেখানে কেবল X কে সন্দেহ করার কোনো যুক্তি নেই। তবে মামলার প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে যখন X অনুপস্থিত তখন P উপস্থিত, এরপর অনুসন্ধানকারীর সব অধিকারই রয়েছে X কে সন্দেহ করার।

অবশিষ্টাংশের পদ্ধতি

লোয়াই সাফী (Loay Safi) এর মতে, এই পদ্ধতির কিছু সম্বন্ধ রয়েছে উসূল আল ফিকহে ব্যবহৃত সাবর ওয়া আল-তাকসীম (Sabar wa al-taqsim) পদ্ধতির সাথে। হুক্‌ম[২৪২] (জ্ঞানের ভিত্তি)-এর কার্যকর কারণ চিহ্নিতকরণ উদ্যোগে এটি প্রয়োগ করা হয়।

গাণিতিক আরোহ

এটা সত্য যে গণিত সেই ক্ষেত্র যাতে আরোহ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তাত্ত্বিক জ্ঞান হিসেবে এটা স্মরণাতীত কাল হতে মনে করা হয় যে, গণিতের সর্বোত্তম পদ্ধতি হচ্ছে অবরোহমূলক যুক্তিবিদ্যা। তবে, আল-কারখী'র মতো গণিতবিদগণ আরোহ পদ্ধতিও গ্রহণ করেছেন, যা আমরা পরে দেখব।

উদাহরণ

নিম্নের সংখ্যাগুলো দেখুন :

১ + ১ = ২

৩ + ১ = ৪

৫ + ৩ = ৮

৭ + ৩ = ১০

২১ + ১৯ = ৪০

এখানে রয়েছে বিভিন্ন সংখ্যা/উপাদান বা অংশ/পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমরা ঐসব অংশ/সংখ্যা/উপাদান হতে একটি সাধারণ সূত্র গঠন করতে পারি তা হল :

---

[২৪২] Foundation of Knowledge.

www.pathagar.com

প্রতি দুইটি বেজোড় সংখ্যার যোগফল জোড় সংখ্যা।

আমরা একই ফলাফল পাবার জন্য অবরোহ পদ্ধতিও ব্যবহার করতে পারি।

মনে করি, x ও y দুটি বেজোড় সংখ্যা

তাহলে $x = 2j + 1$ $y = 2k + 1$ (j ও k হল দুটি পূর্ণসংখ্যা)

$$x + y = (2j + 1) + (2k + 1)$$
$$= 2j + 2k + 2$$
$$= 2 (j + k + 1)$$

যদি (j+k+1) S এর সমান হয়

তাহলে $x + y = 2S$

এভাবে x + y জোড়াসংখ্যা, যেহেতু যে কোন জোড় সংখ্যা 2S এর রূপে হবে (S একটি পূর্ণসংখ্যা)

সংক্ষেপে আরোহ ও অবরোহ প্রদত্ত যুক্তিসঙ্গত ফলাফলে উপনীত হতে একত্রে কাজ করতে পারে।

সাদৃশ্য হতে যুক্তি (Argument from Analogy)

সমরূপতাসমূহের ওপর ভিত্তি করে সম্মিলিতকরণের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রক্রিয়া হচ্ছে সাদৃশ্য। সংজ্ঞার দিক হতে একটি হচ্ছে পর্যবেক্ষণকৃত বস্তুসমূহের মধ্যে অভিন্নতা বা সাদৃশ্য নির্ণয়ের প্রক্রিয়া। যুক্তিবিদ্যা, ব্যবহারশাস্ত্র এবং সাহিত্য তাদের নিজ নিজ আলোচনার রীতি কাঠামোবদ্ধকরণের প্রচেষ্টায় সাদৃশ্যের ওপর নির্ভর করে। একদিকে যুক্তিগত ও আইনগত সাদৃশ্য এবং অন্যদিকে কাব্যধর্মী সাদৃশ্যের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে তাই যাতে পরেরটি বিস্ময়কর, সুক্ষ্ম ও বুদ্ধিদীপ্ত, সেই সীমা পর্যন্ত যে মাত্র কিছুসংখ্যক সহজাতগুণসম্পন্ন ব্যক্তিই তাদের সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে পারে। এক্ষেত্রে প্রথমটি হচ্ছে সাধারণত এবং ঔচিত্যের বিচারে স্পষ্ট এবং অভ্রান্ত।

সাদৃশ্যভিত্তিক যুক্তি সমরূপতা বর্ধনের ভিত্তিতে হয়; এর অর্থ এই যে, দফা যেগুলো পর্যবেক্ষণকৃত পদ্ধতিতে সমরূপ, কিছু অপর্যবেক্ষণকৃত বিষয়েও সমরূপ। এ ধরনের যুক্তিপ্রমাণ প্রকৃত বিজ্ঞানে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, অনেক পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলই, যা পরীক্ষাগারে জীবজন্তুর ওপর পরিচালনা করা হয়, যেমন

www.pathagar.com

বলতে গেলে ইঁদুরের ওপর প্রাপ্ত ফলাফল বর্ধিত করে একইভাবে মানুষের ওপরও প্রয়োগ করা যায়। ফলাফলের এই বিস্তৃতি সাধন এই অভিমতের ভিত্তিতে অনুমোদন করা যায় যে, কিছু কিছু শ্রেণির পশুর শারীরিক কাঠামো মানুষের মতোই সমরূপ। পশু হতে মানুষের দিকে পরিবর্তন করা হয় সাদৃশ্যের দ্বারা। এ ধরনের যুক্তির আনুষ্ঠানিক গঠন নিম্নরূপ :

X শ্রেণির বস্তুর উপাদান হচ্ছে : A, B এবং C ...

Y শ্রেণির বস্তুর উপাদান হচ্ছে : A, B, C এবং Z ...

অতএব, বস্তু X এর উপাদান একইভাবে Z

এ ধরনের যুক্তির আরো ব্যাখ্যার জন্য মনে করা যাক যে, একধরনের বৈশিষ্ট্য ইঁদুরের মানসিক সামর্থ্য প্রভাবিত করে বলে বিশ্বাস করা হয়। এর অর্থ এই যে, ইঁদুরের মধ্যে নিম্নলিখিত উপাদানগুলো রয়েছে :

১. তাদের মস্তিস্ক রয়েছে

২. তাদের রক্তপ্রবাহ রয়েছে

৩. তাদের দেহ মাংস, রক্ত এবং হাড় নিয়ে গঠিত

৪. পরীক্ষায় পাওয়া গেছে, তাদের মানসিক সামর্থ্য X নামক এক প্রকার জীবাণু দ্বারা প্রভাবিত।

যেহেতু মানুষেরও একইরকম ১, ২, ৩ ক্রমিকভুক্ত উপাদানগুলো রয়েছে, সাদৃশ্য পদ্ধতির দ্বারা আমরা আগাম উপলব্ধি করতে পারি যে, মানুষেরও ৪ নম্বর উপাদান রয়েছে, এমনকি যদিও X জীবাণু নথিবদ্ধ করার সময় কোনো মানুষ উপজীব্য ছিল না।

সাদৃশ্যগত যুক্তির বৈধতা প্রতিষ্ঠা করতে, সত্তাসমূহের মধ্যকার যে অভিন্নতা যুক্তির সূত্র গঠন করে তা শুদ্ধ হতে হবে যদি আমরা এদের কতককে এক সত্তা হতে আরেক সত্তায় বর্ধিত করতে চাই। মনে করা যাক যে, ইঁদুরের দৈহিক গঠন মানুষের অনুরূপ গঠন হতে ভিন্নতর, তাহলে গৃহীত সিদ্ধান্ত অবৈধতার দিকে মোড় নেবে কিংবা কমপক্ষে সত্য বলে গৃহীত হওয়ার ক্ষেত্রে কম সম্ভাবনা থাকবে।

www.pathagar.com

ইসলামি ব্যবহারশাস্ত্রে সাদৃশ্যতা

ইসলামি আইন এবং এর উন্নয়ন উভয়ক্ষেত্র সূত্রবদ্ধকরণে সাদৃশ্যমূলক যুক্তিবিচার মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। মুসলিম পণ্ডিতগণ সর্বসম্মতভাবে এই মতো পোষণ করতেন যে, যে মূলপাঠ হতে কোন নির্দেশনা চয়ন করার প্রত্যাশা থাকবে তা হবে নির্দিষ্ট, যেখানে পরিণতি বা ঘটনাসমূহ হবে অনির্দিষ্ট। যে সমস্যা উত্থাপিত হয় তাহলে কিভাবে অনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণে নির্দিষ্টতাকে অনুমতি দিতে হবে, অর্থাৎ কিভাবে নতুন ঘটনাপ্রবাহের জন্য আইনগত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে যার প্রত্যক্ষ মূলপাঠগত কোন সাক্ষী নেই? প্রকৃতপক্ষে, আল-কুরআন ও সুন্নাহ, প্রমাণাদির মূল উৎস, নতুন ঘটনার ওপর স্বভাবতই সরাসরি হুকম বা নির্দেশ সরবরাহ করতে পারে না। এক্ষেত্রে ঐ নতুন অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ শরিয়াহর রায় আমরা কিভাবে দিতে পারি? এর জবাব মিলেছে উর্বর আইনী হাতিয়ার কিয়াস বা সাদৃশ্যভিত্তিক সিদ্ধান্তের মধ্যে যা মূলপাঠের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রদত্ত নির্দেশনা অন্য ঘটনায় ব্যবহার করা হয় দুটি ঘটনার মধ্যে কিছু সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে, সেই সাক্ষ্যের কিছু দুর্বলতা সত্ত্বেও। কিয়াসের সুবিধা এই যে, পরিবর্তনশীল অবস্থাতেও এটি শরিয়াহর সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করে।

আক্ষরিক অর্থে কিয়াস বলতে বোঝায় কোনো কিছুর সাথে কোনো কিছুর তুলনা করে পরিমাপ ও মূল্যায়ন। এখানে সাদৃশ্যতাসমূহ হলো :

১. আসল (অর্থাৎ সেই বিষয় যা ইতোমধ্যেই কর্তৃত্বমূলক উৎসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে)।

২. হুকম বা নির্দেশনা অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রায়

৩. ইল্লাহ বা যোগ্য কারণ অথবা সেই হুকুমের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নীতি (Ratio decidendi)।

৪. ফার' বা নতুন মামলা যা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অপেক্ষায়, এবং যে বিষয়ে কিয়াস প্রয়োগ করা হয়েছে আসলের হুকুমকে ফার পর্যন্ত বর্ধিত করার জন্য। এই বর্ধন এই সত্যতা দ্বারা স্বীকৃত যে ইল্লাহ বা আস্‌ল-এর হুকম এর পেছনে কারণ ফার-এর ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রয়োগযোগ্য। ইল্লাহ হতে হবে স্পষ্ট এবং সীমাবদ্ধ।

www.pathagar.com

উদাহরণ

মূল পাঠে রয়েছে বিধায় আঙুরের মদ অবৈধ (হারাম) কারণ বা 'ইল্লাহ হচ্ছে মাতলামি (এখানে 'ইল্লাহ স্পষ্ট ও সীমাবদ্ধ)

অতএব, যেকোনো মদমিশ্রিত পানীয় বা উত্তেজক পদার্থ হারাম আঙুরের মদ হচ্ছে আস্‌ল অন্যান্য মদমিশ্রিত ও উত্তেজক উপাদান হচ্ছে ফার হুক্‌ম হচ্ছে অবৈধ (হিরমাহ) 'ইল্লাহ হচ্ছে উত্তেজনা বা মাতলামি।

হুকমকে আসল হতে ফার' পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে কারণ এরা একই 'ইল্লাহ'র অংশীদার। তাই যেকোনো মদমিশ্রিত পানীয় বা অন্য কিছু যা মাতলামিতে নিয়ে যায় তা অবৈধ বলে বিবেচিত যদিও এর হুকম কুরআন বা সুন্নাহয় উল্লেখ করা হয়নি।

এ ধরনের সাদৃশ্যতার আনুষ্ঠানিক কাঠামো হলো :

সকল উত্তেজকই অবৈধ

মদমিশ্রিত পানীয় উত্তেজক

অতএব, মদমিশ্রিত পানীয় অবৈধ

সকল P হচ্ছে Q

S হচ্ছে P

অতএব, S হচ্ছে Q

www.pathagar.com

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

বিভ্রান্তিসমূহ (Fallacies)

বিভ্রান্তির সংজ্ঞা

বিভ্রান্তিকর চিন্তন ততটাই পুরোনো যতটা পুরোনো চিন্তন নিজেই। তবে, বিভ্রান্তি সম্পর্কে নিয়মবদ্ধ বিশ্লেষণ শুরু হয় অ্যারিস্টটল হতে তার গ্রন্থ : কুতর্কমূলক খণ্ডন বিষয়ে (On Sophistical Refutations)। তিনি এই মত দেন যে কুতর্কমূলক যুক্তিসমূহ বা বিভ্রান্তিসমূহ হচ্ছে সেসব যুক্তি যা হয়, সাধারণভাবে গৃহীত বলে কেবল প্রতীয়মান সূত্র হতে এগিয়ে যায় কিংবা যুক্তিবিচার[২৪৩] হতে আসে।

সাধারণভাবে বলতে গেলে, অনুপপত্তি হচ্ছে যুক্তিবিচারে প্রমাদ। এটিকে এমন ভিত্তিহীন যুক্তি বলে অভিহিত করা যায় যা প্রথম দর্শনে যথার্থ মনে হবে। সেজন্য এই যুক্তি কেন ভিত্তিহীন তার কারণ নির্দেশ করার জন্য তীক্ষ্ম বিশ্লেষণ প্রয়োজন। অ্যারিস্টটল কোনো যুক্তিকে যথার্থ হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় তিনটি শর্তের কথা বলেছেন :

১. সিদ্ধান্ত অবশ্যই সূত্রসমূহ অনুসরণে হবে

২. সিদ্ধান্ত অবশ্যই সূত্রসমূহের যে কোনোটি হতে পৃথক হবে

৩. সিদ্ধান্ত হবে সূত্রসমূহের কারণেই

সাধারণত অনুপপত্তি ঘটে এমন শর্তপূরণে যুক্তি দেওয়া হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ব্যর্থ হয়।

অনুপপত্তির সাথে বাস্তব তথ্যমূলক ভুলের পার্থক্য রয়েছে, যা বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে সরলভাবে হওয়া ভুল। আরো সুনির্দিষ্ট হতে গেলে অনুপপত্তি হচ্ছে একধরনের যুক্তি যাতে সূত্রগুলো সিদ্ধান্তের পক্ষে প্রকৃত সমর্থন নিয়ে আসে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে

---

243 Fallacies, Classical and temporary Readings, সম্পাদনা- Hans. V. Hausen and Rober : C. Pinto Pennsylvania State University Press, 1995, পৃষ্ঠা ৩।

www.pathagar.com

এরা সিদ্ধান্তকে সমর্থন দেয় না। অনুপপত্তি সবসময়ই যুক্তির মধ্যে সাবধানী অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন বোধ করে। এই কারণে এর অসারতা আবিষ্কার করতে যে অনুপপত্তির সকল সত্য সূত্র থাকতে পারে এবং তারপরও সিদ্ধান্ত হতে পারে মিথ্যা। ইসলামি পরিবেশে, মিথ্যা যুক্তিবিচার সম্পর্কে আলোচনায় জ্ঞানের দুটি ক্ষেত্র অন্তর্ভুক্ত :

ভাষাতত্ত্ব ও যুক্তিবিদ্যা। প্রথমটিতে অনুপপত্তি ঘটে যখন যুক্তি গঠনের ক্ষেত্রে ভাষাগত নিয়ম ভঙ্গ করা হয়। এ ধরনের অনুপপত্তিকে মোটামুটিভাবে ভাষাগত অনুপপত্তি বলা হয়। পরেরটিতে, অনুপপত্তি ঘটে যখন যৌক্তিক অনুমানসমূহ অপব্যবহৃত হয়।

অ্যাড হোমিনেম এর বর্ণনা (Description of Ad Hominem)

ল্যাটিন হতে ইংরেজিতে অনুবাদের পর অ্যাড হোমিনেম-এর অর্থ দাঁড়ায় মানুষটির বিরুদ্ধে বা ব্যক্তির বিরুদ্ধে।

অ্যাড হোমিনেম হচ্ছে অনুপপত্তির সাধারণ প্রকরণ যাতে কোনো দাবি বা যুক্তি এর প্রণেতা বা ব্যক্তি উত্থাপন করলে তার সম্বন্ধে কিছু অপ্রাসঙ্গিক তথ্যের ভিত্তিতে নাকচ করে দেওয়া হয়। এর অর্থ হলো এই দাবি বাতিলকরণ, দাবি সমর্থনকারী যুক্তি বা যুক্তিসমূহের মুল্যায়নভিত্তিক নয়। অনেক যুক্তিবিদ এ ধরনের অনুপপত্তির কারণে একজন কর্তৃক আরেকজনের দাবি প্রত্যাখ্যানের ওপরেই বেশি আলোকপাত করেন। আমার মতে, অনুপপত্তি এ অবস্থাতেও প্রযোজ্য যেখানে কোনো ব্যক্তি কোনো প্রদত্ত দাবি মেনে নেয় এর পূর্ণতার কারণে নয়, বরং যে ব্যক্তি দাবি করে তার কতকগুলো অপ্রাসঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের কারণে। এখানে, অনুপপত্তির নামে কিছু সংশোধনের পরামর্শ দিতে পারে অথবা আমরা অন্য ধরনের অনুপপত্তি যোগ করতে পারি যাকে বলতে পারি ব্যক্তিটির জন্য।

আদর্শগতভাবে এই অনুপপত্তির দুটো ধাপ রয়েছে। প্রথম, দাবি তৈরিকারী ব্যক্তির চরিত্রের ওপর আক্রমণ করা, তার অবস্থাসমূহ অথবা তার কার্যাবলী যা সম্পাদিত হয়েছে (অথবা দাবি পেশকারী ব্যক্তির চরিত্র, অবস্থা অথবা কার্যকলাপ)। দ্বিতীয়, এ আক্রমণকে আলোচিত ব্যক্তি কর্তৃক তৈরিকৃত বা উত্থাপিত দাবি বা যুক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এ ধরনের যুক্তির গঠন নিম্নরূপ :

www.pathagar.com

১. ব্যক্তি A X দাবি করে

২. ব্যক্তি B ব্যক্তি A'র ওপর আক্রমণ করে

৩. অতএব A'র দাবি মিথ্যা

কেন (যে কোনো প্রকার) অ্যাড হোমিনেম একটি অনুপপত্তি তার কারণ এই যে, কোনো ব্যক্তির চরিত্র, অবস্থা অথবা কার্যাবলী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দাবির সত্যতা বা মিথ্যার ওপর যা প্রদত্ত যুক্তির গুণাগুণের ওপর প্রভাব রাখে না।

অ্যাড হোমিনেম-এর উদাহরণ

মুসতানীর : আমি বিশ্বাস করি যে, গর্ভপাত নৈতিকভাবে অন্যায়। আদনান : অবশ্যই তুমি এটা বলবে, তুমি একটি ধর্মীয় স্কুল হতে স্নাতক হয়েছ। মুসতানীর : আমার অবস্থান সমর্থনে আমার দেওয়া যুক্তির ব্যাপারে কী? আদনান : ওগুলো গণনায় নেই। যেমন আমি বলেছি, তুমি একজন ধর্মীয় স্কুলের স্নাতক, সুতরাং তোমাকে বলতেই হবে গর্ভপাত অন্যায়। অধিকন্তু, তুমি অন্যান্য পণ্ডিতদের ঠিক একজন ভৃত্যস্বরূপ, সুতরাং তুমি যা বল তা আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

অ্যাড হোমিনেম টিউ কোক (Ad Hominemtu Quoque)

এই অনুপপত্তি তখনই করা হয় যখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, একজন ব্যক্তির দাবি মিথ্যা, কারণ ১. এটা একজন ব্যক্তি যা বলেছে তার কিছুর সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ অথবা ২. ব্যক্তি (মহিলা) যা বলেছে তার সাথে তার কাজ অসঙ্গতিপূর্ণ। এর অর্থ এ নয় যে, যুক্তির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকাকালীন কাজগুলো অপ্রয়োজনীয়। ইসলামি দৃষ্টিকোণ হতে, আমাদের দাবির সমর্থনে কাজ চূড়ান্তভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র কুরআন এটাকে স্পষ্ট করে। আয়াতের ভাষ্য :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ

> হে ইমানদারগণ! তোমরা কেন সেই কথা বল যা তোমরা করো না। (সুরা আস সফ ৬১ : ০২)?

এখানে, যথার্থ হতে হলে কথায় কিছু দাবি করাই যথেষ্ট নয়, বরং কোনো কাজের মধ্যে অসঙ্গতিকে যুক্তির দুর্বলতা গণ্য করে। তবে, যুক্তি যেমনভাবে আছে

www.pathagar.com

তেমনিভাবে এর যথার্থতা এবং যে ব্যক্তির কাছে এটা পৌছানো হচ্ছে তার ওপর এর প্রভাব বা প্রতিক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে। এই ক্ষেত্রে, দাবি ও কাজের মধ্যে অমিল যুক্তির সহজাত বৈধতাকে প্রভাবিত করে না; বরং এটি প্রভাবিত করার সামর্থ্য এবং প্রত্যাশিত ফলাফল নিয়ে আসার ক্ষমতাকে দুর্বল করে। এ ধরনের যুক্তি'র গঠন নিম্নরূপ :

১. ব্যক্তি A X দাবি করে

২. ব্যক্তি B দাবি করে যে, ব্যক্তি A'র কাজ বা অতীত দাবি অসঙ্গতিপূর্ণ X-এর দাবির সাথে

৩. অতএব X মিথ্যা

সত্য কথা হচ্ছে কোনো অসঙ্গতিপূর্ণ দাবি করলে কোনো বিশেষ দাবিকেই সে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে না (যদিও অসঙ্গতিপূর্ণ দাবির যেকোনো জোড়ার মধ্যে কেবল একটি সত্য হতে পারে-কিন্তু দুটোই মিথ্যা হতে পারে)। এছাড়াও, তার কাজের সাথে কোনো ব্যক্তির দাবি অসঙ্গতিপূর্ণ হলে তা নির্দেশ করতে পারে যে, সে ব্যক্তি কপট (মুনাফিক)। কিন্তু এটা প্রমাণ করে না তার দাবি মিথ্যা।

অ্যাড হোমিনেম টিউ কোক-এর উদাহরণ

১. বিল : ধূমপান অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর এবং সবধরনের সমস্যা সৃষ্টি করে। তাই আমার পরামর্শ নাও এবং কখনো শুরু করো না।

জিল : ঠিক আছে, আমি নিশ্চয় ক্যান্সার নিতে চাই না।

বিল : আমি ধূমপান করতে যাচ্ছি। দেব, তুমি কি আমার সাথে যোগ দিতে চাও?

জিল : আচ্ছা! আমার মনে হয় ধূমপান অতটা খারাপ নয়। আসল কথা, বিল যখন ধূমপান করে।

২. জিল : আমি মনে করি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ন্ত্রণ আইনকে সমর্থন করা উচিত নয়, কারণ এটা কার্যকর হবে না এবং অর্থের অপচয় হবে।

বিল : ভালো কথা, ঠিক গতমাসেই তুমি আইনটি সমর্থন করেছিলে। সুতরাং আমি মনে করি এখন তুমি ভুল করছ।

www.pathagar.com

৩. পিটার : আমার উপস্থাপিত যুক্তির ওপর ভিত্তি করে, এটা প্রমাণিত যে খাদ্য ও পোষাকের জন্য পশু ব্যবহার নৈতিকভাবে অন্যায়।

বিল : কিন্তু তুমি চামড়ার তৈরি জ্যাকেট পরে আছ এবং তোমার হাতে একটি গরুর রোস্টের স্যাণ্ডউইচ রয়েছে! তুমি কিভাবে বলতে পারো যে খাদ্য ও পোষাকের জন্য পশুর ব্যবহার অন্যায়?

বিশারদ ব্যক্তির কাছে আবেদন

এ ধরনের অনুপপত্তিতে, একটি দাবিকে কোনো বিশারদ ব্যক্তির মতামতের উদ্ধৃতি দিয়ে অনুকূলে বা বিরুদ্ধে সমর্থন করা হয়। এই অনুপপত্তিটি ঘটেছে বলা হয়, যখন ব্যক্তিটি (বিশারদ) উদ্ধৃত করেছে প্রকৃতপক্ষে ঐ বিষয়ে বিশারদ নয় কিংবা কিছু কারণে তার ওপর নির্ভর করা উচিত নয়[২৪৪]।

ইসলামি প্রেক্ষিত হতে নিলে বিশারদ ব্যক্তির নিকট আবেদনকে অনুপপত্তি বিবেচনা করা হয় এমনকি যদি আবেদনকারী ব্যক্তি এক্ষেত্রে প্রকৃত বিশারদ হয়ে থাকে। কারণ ইসলামি রীতিতে যা ঘটে তা হলো দাবির পক্ষে আনীত সমর্থন এবং সেভাবে বিশারদকে সমর্থন নয়। গ্রহণযোগ্যভাবে, কোনো ক্ষেত্রে বিশারদ তাদের নিজ বিশেষজ্ঞ জ্ঞানের কোনো বিষয়ে অন্য কোনো ব্যক্তির চেয়ে পক্ষে কিংবা বিপক্ষে অধিক নির্ভরযোগ্য। এতদসত্ত্বেও, বিশারদ ব্যক্তি একাই যথেষ্ট নয়। একটি দাবিকে সমর্থন বা প্রত্যাখ্যানের প্রমাণাদি এমনকি আমাদের নিকট অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অন্য কারো চেয়ে তা সে যেই হোক না কেন। আলী ইবনে আবু তালিব (আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওপর সন্তুষ্ট হোন) এমন বলেছেন বলে বলা হয়, তোমাদের (মুসলিমগণের) সত্যের দ্বারা সত্যকে সমর্থন করা উচিত এবং এমন লোকদের মাধ্যমে সমর্থন করো না যাদের তোমরা বিশারদ মনে কর[২৪৫]।

উদাহরণ : X : আমি মনে করি ইসলামে গান শোনা অনুমোদিত, কারণ আল-আজহারের মুহাম্মদ আল-গাজ্জালী এমন বলেন।

---

[২৪৪] Foundation Reasoning, ৪র্থ সংস্করণ, Robert M. Johnson, 2002, Wadsworth, পৃষ্ঠা ২৬৪।

[২৪৫] The Foundation of Knowledge, a Comparative Study in Islamic and Western Methods of Inquiry, Louay Safi, IIU Press, 1996, পৃষ্ঠা ৬৭।

www.pathagar.com

এই প্রযুক্তির ধরন হচ্ছে :

বিশারদ P দাবি করছে ওটা Q, অতএব Q

তবে ওপরের উদাহরণের বিষয়ে আল-গাজ্জালীর পাণ্ডিত্যের নিকট ইসলামে সঙ্গীত সমর্থনযোগ্য কিনা সে বিষয়ে আবেদনকে X কর্তৃক উত্থাপিত দাবি সমর্থনে শক্তিশালী ভিত্তি বিবেচনা করা হয়, কিন্তু আমার মতে এই যুক্তিকে আমরা যদি যৌক্তিকভাবে শক্তিশালী হিসেবে চাই তাহলে কতক শর্ত পূরণ করতে হবে :

১. আল-গাজ্জালীর নিজেকে তার অবস্থানের সমর্থনে যথেষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে।

২. X কে সত্যিকারভাবেই আল-গাজ্জালীর মতামত গ্রহণ করতে হবে

৩. যে প্রমাণের ওপর আল-গাজ্জালী তার অভিমত গঠন করেছেন X কে তা উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

জনগণের নিকট আবেদন

এটা পূর্ববর্তী অনুপপত্তি হতে ভিন্ন। এটা এই যুক্তি দ্বারা গঠিত যে কিছু দাবি C সত্য, কারণ অনেক লোক এটা সত্য বলে বিশ্বাস করে। অন্যেরা পোষণ করেছে বলেই পবিত্র কুরআন কোনো অভিমত পোষণ করার উদ্যোগ প্রত্যাখ্যান করে।

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

এবং যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথা মান্য কর, তারা তোমাকে আল্লাহ তায়ালার পথ হতে বহু দূরে নিয়ে যাবে। তারা কেবল অনুমানের অনুসরণ করে, এবং তারা মিথ্যা ছাড়া কিছুই বলে না (সুরা আন'আম ৬ : ১১৬)।

শরীআতে ইজমা' (ঐকমত্য)-এর ধারণা অন্যদের বিশ্বাসের প্রতি অন্ধ সমর্থন হতে ভিন্ন। ইজমাকে একটি উৎস বিবেচনা করা হয় যেখান থেকে আইনী নির্দেশনা পাওয়া যায়। তবে, এটা এমন বোঝায় না যে, ইজমার অনুসরণ প্রমাণাদির ভিত্তিতেই করা হয়। যে কোনো ইজমা শক্ত প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা তা-ই যা একই বিষয়ে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক পণ্ডিতকে গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে। এটা প্রমাণাদির

www.pathagar.com

আয়াসসাধ্য মূল্যায়নের মাধ্যম যাতে পণ্ডিতগণ ঐকমত্যে পৌঁছান। এভাবে প্রাথমিক যুগের ইজমা কেবল ততদূর পর্যন্ত ধারণ করবে যেমন অভিমত বা নির্দেশনা সমর্থিত হয় বা সমর্থিত হতে থাকে বিজ্ঞানসম্মত সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা। তবে যখন এটা দেখানো হয় যে, সাক্ষ্যপ্রমাণের অভাব রয়েছে, ইজমা তার শক্তি হারিয়ে ফেলে এবং অবশ্যই তা বাতিল হয়ে যাবে।

উদাহরণ

X- এই বইটি তোমার পড়া উচিত, কারণ এটা সর্বাধিক বিক্রিত।

প্রকৃতপক্ষে এটি একটি অনুপপত্তি, ঘটনার কারণ এই যে, বইটি সর্বাধিক বিক্রিত হয়েছে বলে এটা অপরিহার্য নয় যে এটা পাঠের জন্য মূল্য বহন করবে।

শক্তির প্রতি আবেদন

অনেক পরিস্থিতিতে কিছু লোক শক্তির আশ্রয় নেয় কিংবা বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে অন্যদেরকে ভয় দেখিয়ে বশে আনা এবং বাধ্য করার জন্য কিছু অভিমত বাতিল করে দেয় বা কমপক্ষে অসম্মত হয় তা মেনে নিতে। এমনটা সচারচর তখনই ঘটে যখন যুক্তিসমূহ ততটা শক্তিশালী হয় না বা অন্যদেরকে বোঝাবার মতো যথেষ্ট হয় না। শক্তির আশ্রয় নিয়ে, যুক্তি পেশকারী স্বমতে আনার চেষ্টা করে পরোক্ষভাবে তার ক্ষমতার কথা উল্লেখ করে এবং সে যা বলে বা যা চায় তার সাথে সম্মত না হলে অন্যদের ক্ষতি করার ক্ষমতার কথা বলে।

উদাহরণ

X- যদি আপনি তাকে মৃত্যুদণ্ড না দেন, তাহলে আপনি হবেন তার পরবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত।

বাস্তবে, এই রকম পূর্বাভাস দেওয়া যে জুরির সদস্যগণ সম্ভবত সন্দেহভাজনের পরবর্তী লক্ষ্য-এটা জল্পনা-কল্পনা ছাড়া কিছুই নয় যা মিথ্যায় পর্যবসিত হতে পারে। এবং এমনকি যদি এমন সম্ভাবনা থাকে যে, জল্পনাই সঠিক, এটা কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পক্ষে ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করানো যায় না। কারণ, ভবিষ্যতে কি করার আশা আছে এজন্য লোকদেরকে শাস্তি দেওয়ার কোনো যুক্তি নেই।

www.pathagar.com

দয়ার প্রতি আবেদন

এ ধরনের অনুপপত্তিতে, আপনার অভিমতের নিকট কাউকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করতে হুমকি দেওয়ার পরিবর্তে, আপনার দয়ার আশ্রয় নেবেন। অন্য কথায়, আপনি আপনার যুক্তিকে সমর্থনের জন্য তাদেরকে আবেগের মধ্যে ঠেলে দিতে পারেন, তাদের মধ্যে আপনার প্রতি সহানুভূতি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা হিসেবে।

উদাহরণ : ছাত্র তার শিক্ষকের প্রতি। স্যার, আপনি এই কাজের জন্য আমাকে $গ^{+}$ দিতে পারেন না, আমি এটা করতে সারারাত্রি ব্যয় করেছি।

প্রকৃতপক্ষে, কোনো কিছু করতে সারারাত্রি জাগরণ দ্বারা কৃত কাজের মান নির্ণয়ে কিছুই করার নেই। এখানে, ছাত্রটি তার শিক্ষক যাতে তার গ্রেড বাড়িয়ে দেন সে ব্যাপারে শিক্ষকের আবেগ বৃদ্ধির চেষ্টা করছে।

অজ্ঞতার নিকট আবেদন

যখন আমরা দাবি করি যে কিছু বক্তব্য S সত্য কেবল এই কারণে যে আমাদের প্রতিপক্ষ S কে মিথ্যা প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছে আমরা তখন অজ্ঞতার নিকট আবেদন করার অনুপপত্তি করি। এটাকে অনুপপত্তি গণ্য করার কারণ এই যে কোনো কিছু ভুল প্রমাণে ব্যর্থতা কোনক্রমেই তা সত্য বলে গ্রহণ করার বৈধ কারণ নয়। এ ধরনের অনুপপত্তির দুটো যৌক্তিক গঠন নিম্নরূপ :

১. যদি আপনি না জানেন S মিথ্যা, তাহলে S সঠিক।

২. যদি আপনি না জানেন যে S সত্য, তাহলে S মিথ্যা।

উদাহরণ

১. X-যেহেতু আপনি এটা প্রমাণে ব্যর্থ হয়েছেন যে প্রেতাত্মার অস্তিত্ব রয়েছে, তাদের অস্তিত্ব নেই।

২. আপনি আপনার সাধ্যমতো এটা প্রমাণের চেষ্টা করেছেন যে, আমার মক্কেল এ অপরাধ করেছে, কিন্তু আপনি এমনকি এক টুকরো প্রমাণ দিতেও ব্যর্থ হয়েছেন, এ দ্বারা দেখা যায় যে, আমার মক্কেল নির্দোষ।

১ নম্বর উদাহরণে প্রেতাত্মার অস্তিত্ব প্রমাণে ব্যর্থতা তাদের অস্তিত্ব অস্বীকারের যুক্তি নয়। তবে ২ নম্বর উদাহরণের কিছু বিশ্লেষণ প্রয়োজন। যদি উকিলের একথা বলা

www.pathagar.com

সঠিক হয় যে, তার প্রতিপক্ষ সন্দেহভাজনকে অভিযুক্ত করার জন্য সবল প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যর্থ, তখন জুরির জন্য এটা যথেষ্ট হবে। সন্দেহভাজনকে ছেড়ে দেওয়া এই নিয়মকানুনের ভিত্তিতে যে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক সন্দেহভাজনই নির্দোষ। আপনি বলতে পারেন যে, অজ্ঞতার আবেদনভিত্তিক অনুপপত্তির ভিত্তিতে তাকে ছেড়ে দেওয়া ভুল সিদ্ধান্ত হবে, কারণ কাউকে দোষী প্রমাণে ব্যর্থতা এটা বোঝায় না যে সে নির্দোষ। প্রকৃতপক্ষে, আপনি যা বলছেন তা সত্য, তা সত্ত্বেও আমরা তার পক্ষে রায় দিতে বাধ্য। কারণ এই যে, যখন আমরা কোনো সন্দেহভাজনকে প্রমাণের অভাবে ছেড়ে দিই, এর দ্বারা এটা বোঝায় না যে আমরা বিশ্বাস করি সে প্রকৃতই নির্দোষ এবং প্রকৃতই সে এ অপরাধ করেনি। রায়ের দ্বারা আমরা যেটা প্রকাশ করি তা আমাদের এ সিদ্ধান্ত/প্রত্যয় ছাড়া বেশি কিছু নয় যে সন্দেহভাজনের বিপক্ষে উপস্থাপিত প্রমাণ তার বিরুদ্ধে মামলা লড়ার জন্য কিংবা তাকে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়। এমনকি কারো পক্ষে বা বিপক্ষে রায় দিতে গিয়ে বিচারকের জন্য সম্ভাবনার জানালা এমন উন্মুক্ত থাকেই যে রায়ের চেয়ে বাস্তবতা ভিন্ন হতে পারে।

নবি মুহাম্মদ সা. এটাকে স্পষ্ট করেছেন বিচারক হিসেবে যখন তিনি একটি হাদিসে ব্যক্ত করেন উম্মু সালমার (আল্লাহ তায়ালা তাঁর ওপর প্রসন্ন হোন) বাচনিক। তিনি বলেন : আল্লাহর নবি (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলেন : তোমরা আমার নিকট তোমাদের বিবাদ (নিস্পত্তির জন্য) এনে থাকো, তোমাদের কেউ অন্যের চেয়ে তার নিজ পক্ষ সমর্থনে অধিকতর বাক্‌পটু, সুতরাং আমি তাদের নিকট থেকে যা শুনি তার ভিত্তিতে রায় দিয়ে থাকি। (মনে রেখ আমার রায়ে) আমি যদি তার ভাইয়ের অধিকার হতে তার জন্য কোনো কিছু কর্তন করে দিই, তার উচিত হবে না সেটা গ্রহণ করা, কারণ তাহলে আমি তার জন্য জাহান্নামের একটি অংশ কর্তন করে দিয়েছি।

আল-নববি সহীহ মুসলিমের ভাষ্যে এই হাদিসটির চেয়ে ভিন্ন একটি বর্ণনা পেশ করেছেন যা আমাদের আলোচনার জন্য অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। নবি সা.-এর বাচনিক বলা হয় : আমি সাধারণ একজন মানুষ ছাড়া কিছুই নই। আমার সামনে পেশকৃত কোনো বিবাদে, দুটির মধ্যে যে কোনো একটি পক্ষ তার যুক্তি উপস্থাপনে অন্যের চেয়ে বেশি বাক্‌পটু হতে পারে যাতে আমার বিশ্বাস হয় যে সে সত্য বলছে, সুতরাং আমি তার পক্ষে রায় দিই। এভাবে, যখন আমি কাউকে তার ভাই (প্রতিপক্ষ)-এর

www.pathagar.com

অংশের কিছু দিয়ে দিই, তা প্রকৃতপক্ষে এক টুকরো আগুন যা আমি তাকে দিই। তখন তার সুযোগ থাকে তা নেওয়ার কিংবা পরিত্যাগ করার।

নবি সা. স্বীকার করেন যে, কারো কারো যুক্তি উপস্থাপনের দক্ষতা থাকে বিচারককে তার নির্দোষিতা বোঝাবার জন্য, যদিও প্রকৃতপক্ষে সেই দোষী এবং বিচারক—যিনি স্বয়ং নবিও হতে পারেন—তার পক্ষে রায় দেন উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে। নবি সা. জানেন যে, রায় সর্বদা বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না। এ কারণেই তিনি সা. উদ্দিষ্ট করেন ধর্মীয়ভাবে সচেতন ঐসব ব্যক্তিকে যারা অন্যের অধিকার গ্রহণ করা থেকে কোনো মুসলিমকে বিরত রাখে।

মিথ্যা কারণ

এ ধরনের অনুপপত্তি তখন ঘটে যখন আমরা ভাবি যে, A B-এর কারণ, যেহেতু A B-এর পূর্বের স্থানে বসে কিংবা B এর অগ্রবর্তী। বাস্তবে, যে দুটো জিনিস একটি অন্যটির পরে ঘটে তার অর্থ সর্বদা এ নয় যে অগ্রবর্তী পরবর্তীর কারণ।

নিম্নের উদাহরণ বিবেচনা করুন :

মাদকাসক্তির ওপর পরিচালিত কিছু জরিপে দেখা যায় যে, মাদক ব্যবহারকারীরা ধূমপান দিয়ে শুরু করেছে; অতএব, ধূমপান হচ্ছে মাদক ব্যবহারের কারণ।

সিদ্ধান্ত সঠিক হবে কেবল এজন্য নয় যে, মাদক ব্যবহারকারীদের মাদক নেওয়ার পূর্বে ধূমপায়ী হতে হয়, কিন্তু বিশেষ এ কারণে যে, ধূমপান প্রকৃতপক্ষে মাদকাসক্তির কারণ বা কমপক্ষে কারণগুলোর একটি। সিদ্ধান্ত দুটো ক্ষেত্রে বাতিল হবে :

১. যদি আমাদের এমন মাদক ব্যবহারকারী থাকে যারা পূর্বে কখনো ধূমপায়ী ছিল না।

২. যদি আমাদের এমন ধূমপায়ী অথবা এমনকি বিশাল ধূমপায়ী থাকে যারা মাদকের দিকে গড়ায়নি।

পিচ্ছিল ঢালু স্থান

একটি কার্যকারণ সূত্রের অমান্যতা। এ রকম ক্ষেত্রে, এ ধরনের অনুপপত্তিকে মিথ্যা কারণের অনুপপত্তির ব্যতিক্রম বলা হয়। এটা ঘটে যখন কোনো ব্যক্তি কোনো

www.pathagar.com

ভাবধারার বা অভিমতের মিথ্যা হওয়া দাবি করে ঐ ভাবধারা বা অভিমত কর্তৃক বাস্তবায়িত অনাকাঙ্ক্ষিত ফলাফলের পূর্ব অনুমিত দৃশ্যকে ভিত্তি করে। এ অনুপপত্তির যুক্তি এমন যে, অনাকাঙ্ক্ষিত পরিণামের কারণে যুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। তবে এমন বিষয় রয়েছে যেখান ঐ পরিণাম বাতিলকৃত ভাবধারা অনুসরণ করে না। এগুলোর ওপর জোর দেওয়া হয় ভাবধারাকে বাতিল করার জন্য।

উদাহরণ : আমরা A কে অনুমতি দিতে পারি না, কারণ A B এর দিকে নিয়ে যাবে এবং B C এর দিকে নিয়ে যাবে, এবং আমরা নিশ্চিত C কে চাই না!

দ্ব্যর্থপূর্ণকরণ (Equivocation)

এই অনুপপত্তি তখন ঘটে যখন কোনো প্রদত্ত বক্তব্যে শব্দ বা বাক্যাংশের দ্ব্যর্থপূর্ণ ব্যবহার ঘটে। এটা দুটি ভিন্ন অর্থযুক্ত শব্দে একটা একক অর্থ প্রকাশের উদ্দেশে গঠিত হয়। অন্যদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য ভাষার অপব্যবহার ছিল গ্রিক দার্শনিকদের একটি গোষ্ঠী সোফিস্ট দার্শনিকদের দক্ষতা যারা জনগণের চিন্তনের যুক্তিকে শব্দের যথাযথ অর্থকে প্রশ্নবিদ্ধ করার খেলা হিসেবে উপভোগ করতেন। এমন একটি বিস্ময়কর উদাহরণ হচ্ছে নিম্নের সংলাপটি যা প্লেটোর সংলাপে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটা এমন :

তুমি বলো যে তোমার একটি কুকুর আছে?

হ্যাঁ, একজনের একটি পাঁজী (কুকুর)।

এবং তার রয়েছে কুকুরছানা।

হ্যাঁ এবং তারা তার মতোই।

এবং কুকুরটি তাদের বাপ?

হ্যাঁ

এবং সে কি তোমার নয়?

নিশ্চিত হতে সে (বাবা)

www.pathagar.com

তাহলে সে একজন বাবা এবং যে তোমারও, অতএব, সে তোমার বাপ এবং কুকুরছানাগুলো তোমার ভাই[২৪৬]।

ভাষার এই দ্ব্যর্থপূর্ণ ব্যবহার সর্বদাই শব্দ নিয়ে খেলায় দর্শকদের বিভ্রান্ত করে।

উদাহরণ ১

১. গণিত একটি বিজ্ঞান

২. বিজ্ঞান হচ্ছে পদার্থবিদদের অধ্যয়ন ক্ষেত্র

৩. অতএব, গণিত হচ্ছে পদার্থবিদদের অধ্যয়ন ক্ষেত্র

এই যুক্তিটি দৃশ্যত বৈধতার সব শর্তই পূরণ করেছে, সূত্র ১ ও ২ উভয়ই সঠিক। সুতরাং তদনুযায়ী সিদ্ধান্তও সঠিক হতে হবে। তবে এখানে বিজ্ঞান শব্দটি এর সাধারণ ব্যঞ্জনা নির্দেশ করে। অর্থাৎ বলতে হয় যে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়াসসমন্বিত অধ্যয়নই বিজ্ঞান নামে অভিহিত। যেখানে এর দ্বিতীয় ঘটনায় শব্দটি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে নির্দেশ করে। এই শব্দটির দ্বৈত ব্যবহারের কারণেই সিদ্ধান্তটি অশুদ্ধ, কারণ গণিত পদার্থবিদগণের অধ্যয়ন ক্ষেত্র নয় এমনকি যদিও এর সাধারণ অর্থের দিক থেকে এটা বাস্তবিকই বিজ্ঞান। এই অনুপপত্তি এর আনুষ্ঠানিক কাঠামোতে ভালোভাবে বিস্তার করা হয়েছে :

আমরা যখন একই জিনিসের নামকরণে দ্ব্যর্থবোধক শব্দ গ্রহণ করি, আমরা নিম্নবর্ণিত কাঠামো পাই :

P হচ্ছে Q

Q হচ্ছে S

অতএব, P হচ্ছে S

এখানে যুক্তিটি বৈধ।

তবে, যখন আমরা জানতে পারি যে এই যুক্তিটিতে একটি শব্দের দুটো ভিন্ন অর্থ রয়েছে, যুক্তিটির কাঠামো তখন এমন হয়ে যায়;

P হচ্ছে Q

---

[২৪৬] Fundamentals of Logic, Daniel J. Sulivan. MacGraw-Hill Book Company, 1963, পৃষ্ঠা ৪।

www.pathagar.com

Q হচ্ছে S

অতএব, P হচ্ছে S

এখানে যুক্তিটি অবৈধ, কারণ এখানে P এবং S এর মধ্যে আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই।

উদাহরণ (২)

সুখের চেয়ে উত্তম কিছুই নেই

কোনো কিছু না থাকার চেয়ে কলম উত্তম

অতএব, কলমটি সুখের চেয়ে উত্তম।

তড়িঘড়ি বিবৃতি বা সাধারণীকরণ

আমাদের চিরন্তন অভ্যাস এমনভাবে রূপলাভ করেছে যে আমরা বস্তু সম্পর্কে রায় দিয়ে দিই। মানুষের মন সাধারণভাবে তাদের কিছু প্রকারের মূল্যায়নভিত্তিক তথ্যের দ্বারা শ্রেণিকরণে ঝোঁক প্রবণ। ইবনে তাইমিয়াহ ঐ ধরনের যুক্তিবিচারের সমালোচনা করেছেন যা বিশেষ সত্তাকে সার্বজনীন ধারণার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের মধ্যে ভুলভাবে অনুমিত সাদৃশ্য এবং উভয়কে একই বাক্সে রাখার মাধ্যমে। এডওয়ার্ড ডি বোনো ভুল বাক্সের যুক্তির প্রতিবাদ করার ক্ষেত্রে ইবনে তাইমিইয়ার চেয়ে কম নিবেদিত নন। একইভাবে জিনিস দেখা অনুপমতার গুণ সম্বন্ধে অবিচার করাতে পারে যা প্রাচুর্য ও সৌন্দর্যের চিহ্ন। কল্পনা করুন যে আপনার সাথে কিছু লোকের সাক্ষাৎকার হয়েছে, কোনো প্রদত্ত X দেশের তিন বা চারজন, এবং তারা যেহেতু ভালো লোক নয় তাই তাদের সাথে আপনার একটি খারাপ অভিজ্ঞতা হয়েছে। এর দ্বারা কি X দেশের সব লোককেই খারাপ বলে রায় দেওয়া যায়? অবশ্যই আপনার জবাব হবে একটি বড় না। কেন? কারণ, কিছু লোক খারাপ। কিছু লোক ভালো এবং আমরা বিবৃতি বা সাধারণীকরণ করতে পারি না। এ ধরনের বিবৃতি বা সাধারণীকরণ হচ্ছে তাড়াহুড়োর মধ্যে একটি। এর অর্থ এই যে, এটা বৈধ সূত্র নয়। এটাকে আমরা সূত্র বলি কারণ এটা আরোহভিত্তিক যেখানে সাধারণ সূত্র বিশেষ নমুনা হতে উদ্ভূত হয়। তড়িঘড়ি বিবৃতি বা সাধারণীকরণ করতে হয় যখন নির্ভরযোগ্য বিবৃতি বা সাধারণীকরণ করতে নমুনা যথেষ্ট না হয়। অন্য কথায়, তড়িঘড়ি বিবৃতি বা সাধারণীকরণ ঘটে যখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এমন নমুনার ভিত্তিতে যা খুবই ছোট অথবা কোনোভাবেই নমুনাসদৃশ নয়। উদাহরণ স্বরূপ,

www.pathagar.com

কোনো মহিলার সাথে যে ব্যক্তির একটি খারাপ অভিজ্ঞতা রয়েছে, সে সিদ্ধান্তে আসতে পারে যে স্ত্রীলোক ব্যবহারকারী ও ক্ষতিগ্রস্তকারী ছাড়া কিছুই নয় কিংবা যে ছাত্রী তার প্রথম কলেজ কোর্স গ্রহণ করেছে এবং মুখোমুখি হয়েছে একজন অহংকারী শিক্ষকের সে একথা বলতে পারে যে সব কলেজ শিক্ষকই অহংকারী। কিভাবে এই তড়িঘড়ি বিবৃতি বা সাধারণীকরণ নতুনত্বহীন ইন্ধন জোগায়[২৪৭]।

পবিত্র কুরআন আমাদেরকে শিক্ষা দেয় স্বল্প সংখ্যক দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করা উক্তির মাধ্যমে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে দূরে থাকায়। এমনকি যখন পবিত্র গ্রন্থ ইসলামের শত্রুদের সম্পর্কে বলে। ইহা কখনো বিবৃতি বা সাধারণীকরণ করে না। উদাহরণ স্বরূপ, ইহুদি ও খ্রিষ্টানদেরকে ভিন্ন পর্যায়ে রাখা হয়েছে, যেমন :

وَدَّت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

কিতাবীদের একদল (ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের) তোমাদের বিপথদগামী করতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা তাদের নিজেদের ছাড়া কাউকে বিপথগামী করবে না, কিন্তু তারা সেটা উপলব্ধি করে না (সুরা আলে ইমরান ৩ : ৬৯)।

وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

এবং কিতাবীদের একদল বলে : যারা ইমান এনেছে (মুসলিম) তাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস করো দিনের প্রারম্ভে এবং প্রত্যাখ্যান কর দিবা অবসানে; যাতে তারা ফিরতে পারে (সুরা আলে ইমরান ৩ : ৭২)।

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

---

[২৪৭] Thinking Kirby, পৃষ্ঠা ১৮৩।

www.pathagar.com

কিতাবীদের (ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের) মধ্যে এমন লোক রয়েছে যে, তার নিকট এর কিন্তার পরিমাণ (বিপুল পরিমাণ) সম্পদ আমানত রাখলেও ফেরত দেবে, আবার তাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যার নিকট একটি রৌপ্য মুদ্রা (দীনার) রাখলেও তার পেছনে না লেগে থাকলে সে তা ফেরত দেবে না, কারণ তারা বলে; আমাদের কোনো দোষ নেই নিরক্ষরদের (আরবদের) বিশ্বাসঘাতকতা করাতে এবং তাদের সম্পত্তি গ্রহণ করাতে। কিন্তু তারা জেনেশুনেই আল্লাহ তায়ালার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলে) (সুরা আলে ইমরান ৩ : ৭৫)।

لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ

তারা সবাই এক রকম নয়; কিতাবীদের মধ্যে একদল আছে সত্যের পক্ষে দাঁড়ায়, রাত্রিকালে আল্লাহ তায়ালার আয়াত তিলাওয়াত করে, নিজেদেরকে সালাতে রত রেখে (সুরা আলে ইমরান ৩ : ১১৩)।

বিবৃতি বা সাধারণীকরণ সাধারণত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অভাবকেই তুলে ধরে। এটা এ কারণে যে আমি বিশেষ বিষয়ে সঠিক তথ্য পাইনি আমার দায়িত্ব তাড়াতাড়ি শেষ করতে সেগুলোকে একই বাক্সে রেখে। কারবি এবং গুডপাস্টার এর মতে, আমরা কিসের ওপর ভিত্তি করে একটি তড়িঘড়ি বিবৃতি বা সাধারণীকরণ ও একটি পরিপক্ক বা যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তের মধ্যে পার্থক্য করতে পারি তার কোনো ধরাবাঁধা নিয়মকানুন নেই[২৪৮]। এটা ততক্ষণ পর্যন্ত সঠিক যতক্ষণ আমরা বিষয়টির বাস্তবতা নিয়ে কথা বলি। প্রকৃতপক্ষে, ঐ উদ্দেশ্য সাধনে কোন নিয়মরীতি তৈরি করা অসম্ভব। কারণ যৌক্তিক সাধারণীকরণের কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না। মনে করুন কোনো বিদেশি স্থানে আপনি একজন পর্যটক। আপনার প্রথম দিন কাটলো কারো দ্বারা লুণ্ঠিত হয়ে যে প্রথমে সুন্দরভাবে আপনাকে পথ দেখিয়ে দিল। তারপর থেকে যেকোনো ব্যক্তিই উপস্থাপন করুক না কেন আপনার জন্য সন্দেহ করা কি যথেষ্ট হবে না? সন্দেহ হচ্ছে সম্ভাব্যতার একটি সিদ্ধান্ত। আমি মনে করি যে, যদি এটা একই সন্দেহের কারণ না হতো, আপনি প্রাত্যহিক ভিত্তিতে লুণ্ঠিত হতেন। এর অর্থ এই যে, যখন আমরা ঢালাও সিদ্ধান্ত নিই, আমরা নিশ্চয়তার দিকে দাবি স্থাপন করি না। সব সময়ই বিরোধী উদাহরণের স্থান থাকবে যা সাধারণীকরণের উপযোগী

[২৪৮] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৮৩।

www.pathagar.com

হতে অস্বীকৃতি জানাবে। যে কোনো বিবৃতি বা সাধারণীকরণ দ্বারা আমরা যা উদ্দিষ্ট করি, তা হচ্ছে, অধিকতর শক্তিশালী সম্ভাবনায় পৌঁছানো কিন্তু নিশ্চয়তায় নয়।

উপসংহার

সৃজনশীলতা একটি নিরপেক্ষ পরিভাষা। সংস্কৃতি ও ধর্মের সীমাবদ্ধতাকে ছাপিয়ে যাওয়ার দক্ষতা হিসেবে, কোনো কিছুর উন্নতিসাধন, নবায়ন এবং এমনকি উদ্ভাবনে সৃজনশীলতা হচ্ছে একটি চালিকাশক্তি। অর্থাৎ বলতে হয় যে, যে কোনো ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক পটভূমিসম্পন্ন ব্যক্তিই সৃজনশীলতায় উপনীত হতে পারে। তবে, অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় উপাদানই কারো ব্যক্তিত্ব গঠনে তাদের ভূমিকা পালন করে এবং ফলস্বরূপ সৃজনশীলতার সীমা নির্ধারণ করে।

মুসলিমদের জন্য সৃজনশীলতা যে কোনোভাবেই হোক ইতিহাস। সে কারণেই আমরা প্রায়ই অতীতকে স্মরণ করি এটা প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে যে, আমরা পাশ্চাত্যের লোকদের মতই সৃজনশীল। এখানে মূল সমস্যা হলো যে আমরা প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির দৃষ্টিকোণ হতে সৃজনশীলতাকে বিবেচনা করতে চাই। যদিও এ দৃষ্টিভঙ্গি সত্যতা ধারণ করে, এটা কোনো প্রকার সংকীর্ণতা ছাড়াই, একটি অধিকতর ব্যাপক এবং যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহে অপর্যাপ্ত, আমরা সৃজনশীলতা বলতে প্রকৃতই কি বোঝাই সে সম্পর্কে। গ্রিক ও ভারতীয়দের নিকট হতে নেওয়া মহৎ ধ্যানধারণাকে মুসলিমগণ উন্নত করেছে। যারা প্রতিদানে প্রাচীন মিসরীয়দের অবদানের সুযোগমত সদ্ব্যবহার করেছে।

এক হাজার বছরেরও অধিককালব্যাপী এসব ধ্যান-ধারণার অনেকগুলোই পশ্চিমা চিন্তাবিদগণের দ্বারা উন্নয়ন, সংশোধন অথবা সময়ে বাস্তবের সাথে উপযোগী করার জন্য সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতির মাধ্যমে সঠিকভাবে কাজে লাগানো হয়েছিল।

তাই বলতে হয় যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আজকের পাশ্চাত্য অগ্রগতি মানবিয় অর্জনের সর্বোচ্চ সীমা ব্যতীত কিছু নয় যা সার্বজনীন ও প্রকৃতিগতভাবে বিশ্বজনীন এবং প্রত্যেক সভ্যতাই আজকের এ অগ্রগতির পর্যায়ে পৌঁছানোর জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান পুঞ্জীভূতকরণে ভূমিকা পালন করেছে। এই প্রেক্ষিতে, ইসলামি ধ্যানধারণা এবং সৃজনশীলতা বিষয়ে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রতি সংহতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি অনুজ্ঞামূলক। আমাদের উদ্যোগ এটা প্রদর্শন করা নয় যে ইসলাম পাশ্চাত্যের সাথে

www.pathagar.com

অসমঞ্জস কিছুই ধারণ করে না, কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে, এ দুটি বিশ্বদর্শনের মধ্যে বিপুল পার্থক্য রয়েছে। আমাদের দৃষ্টিকোণ ঐসব বিষয়গুলোর প্রতি উভয়েই যেখানে একই বিন্দুতে মিলিত হয় সেখানেই পরিমার্জন দ্বারা গঠিত হয়েছে।

পাশ্চাত্য ভাষায়, সৃজনশীলতা বিষয়ক সাহিত্য, এই সত্যতা প্রদর্শন করে যে, সৃজনশীলতা বিষয়ে ইসলামি প্রেক্ষিত পাশ্চাত্য ধ্যানধারণা দ্বারা সমৃদ্ধ হতে পারে এবং পাশ্চাত্য ধ্যানধারণাও তদ্বিপরীত ভাবে।

যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সৃজনশীল চিন্তার পরিমণ্ডলে অনেক অগ্রপথিকই সৃজনশীলতাকে একটি দক্ষতা হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এবং এটা শেখা, শেখান ও অন্যদের সাথে ভাগাভাগি করা যায় শিক্ষা ও পরিকল্পিত প্রয়াসের প্রক্রিয়ায়। সৃজনশীল হতে হলে ব্যক্তির পরিশ্রমের সাথে প্রয়াসের ধারণাও প্রয়োজনীয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি নির্দেশ করে যে, সৃজনশীলতা পুরাপুরিভাবে কোনো দান নয় বা গভীর অন্তর্দৃষ্টি নয় যা হৃদয়ের তলাবিহীন কোণ হতে উৎসারিত হয়। সৃজনশীলতার এই গুপ্তরহস্যময় দর্শন কিছু সংখ্যক অসাধারণ লোকের অন্তরে লুকায়িত প্রেরণা হিসেবে প্রতি-উৎপাদনশীল প্রমাণিত হয়েছে। ইসলাম চিন্তনকে ধর্মীয় দলাদলি এবং জাতিগত বিভাজন সত্ত্বেও সকলের জন্য ঐশী আশীর্বাদ হিসেবে দেখে। এ মতে ইসলাম অসাধারণ সামর্থ্যসম্পন্ন কিছু মানুষের মধ্যে চিন্তনকার্য সীমাবদ্ধ থাকার ধারণা বাতিল করে দেয়।

ফলে, ইসলাম চিন্তনকে এমন এক কাজ হিসেবে দেখে যা নির্দিষ্ট অবস্থায় প্রদত্ত প্রেক্ষাপটে যেকোনো ধরনের সাড়া বলে বিবেচিত। এভাবে, চিন্তন একটি দক্ষতা, যার সাথে প্রচেষ্টাকে যুক্ত করতে হয়। ইজতিহাদ সম্পর্কে মু'আয রা. এর হাদিসটি প্রচেষ্টা কেমন হবে তা প্রকাশ করে, বাস্তবিকপক্ষে, এটা হচ্ছে সৃজনশীলতার দিকে চালনাকারী শক্তি।

পরিকল্পিত কৌশল হিসেবে এডওয়ার্ড ডি. বোনো'র সৃজনশীলতা সম্পর্কিত ধারণা, প্রকৃতপক্ষে, ইসলামি প্রেক্ষিতের সারিতেই রয়েছে। ইসলাম যেকোনো কাজের কেন্দ্রিকতার ওপর জোর দেয়। কারণ কোনো কাজ আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক গৃহীত হতে হলে, এর পেছনে সত্যিকার উদ্দেশ্য থাকতেই হবে।

যেহেতু, চিন্তন একটি পরিকল্পিত প্রয়াস তাই এর জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক প্রস্তুতি প্রয়োজন যা সৃজনশীলতার পূর্ণতাসাধনের পথে চালক অভিপ্রায় হিসেবে কাজ করবে।

www.pathagar.com

যেকোনো প্রক্রিয়ার মতো, সৃজনশীলতাও অনেক অন্তরায় দ্বারা বাধাগ্রস্ত হতে পারে। ইন্দ্রিয়জ উপলব্ধি হচ্ছে সৃজনশীলতাকে বন্ধনমুক্ত বা একে বাধাগ্রস্ত করার অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান। নবচিন্তন পদ্ধতির বিকাশের সাথে ইন্দ্রিয়জ উপলব্ধি সৃজনশীলতার মূল ধারণায় পর্যবসিত হয়েছে। সাধারণ মানুষ যা ধারণা করে তার বিপরীতে, ঐটা মস্তিষ্ক নয় বরং উপলব্ধি যা সৃজনশীলতায় চালিত করে বা একে বাধাগ্রস্ত করে। সৃজনশীলতায় উপনীত হতে পবিত্র কুরআন ও রসুলের সা. সুন্নাহ প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে আমাদের উপলব্ধিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনে। ইসলামে জীবন, অর্থ, সময়, আনন্দ, বস্তু, যোগাযোগ এবং আরো কিছু, তাদের প্রতিষ্ঠিত ব্যঞ্জনা হতে বিভিন্ন অর্থের অধিকারী। ঐটা মুসলিমকে কোনো কিছু সম্বন্ধে তার (পুরুষ/মহিলা) প্রেক্ষিত পরিবর্তনের প্রস্তুতিতে সাহায্য করে।

যেমনটা ইজতিহাদ অধ্যায়ে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, ইসলামি ও পাশ্চাত্য প্রেক্ষাপটে সৃজনশীলতা সংজ্ঞায়নে একটি সাদৃশ্য রয়েছে। তবে, পাশ্চাত্য প্রেক্ষিত অনুযায়ী সৃজনশীলতা মূল্যবোধ-হীনতার ওপর প্রতিষ্ঠিত, যেখানে ইসলামি প্রেক্ষাপটে এটা আবশ্যিকভাবে মূল্যবোধের সাথে সংযুক্ত, অর্থাৎ মূল্যবোধবিহীন প্রতিশ্রুতির মধ্যে কোনো সৃজনশীলতা নেই। এখানে আমাদের দুটো সাবধানী অভিমত রয়েছে। একটি হলো, মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ দাবি করেন যে, পাশ্চাত্যবিদদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত সৃজনশীল চিন্তনের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং একে উন্নত করা যাবে না কিংবা মুসলিম বিশ্বের সাথে পরিচিত করা যাবে না এই আশংকায় যে এতে করে মুসলিমদের দমনে পাশ্চাত্যের উন্মুক্ত মূল্যবোধের দরজা খুলে যাবে। তাদের শিক্ষা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গ্রন্থকারদ্বয়ের অভিমত হচ্ছে- যে, এটা প্রয়োজনমতো সত্য নয়। এটার জন্য অযথা উদ্বিগ্ন হওয়ার বা সৃজনশীল চিন্তন শিক্ষা না দেওয়ার কোনো কারণ নেই। দ্বিতীয়, সতর্ক অবস্থান এই যে, যেহেতু সৃজনশীলতা ইসলামি মূল্যবোধের সাথে সংহত, এটা সৃজনশীলতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করবে। এই সন্দেহের জবাব হচ্ছে বিষয়টিকে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করা। সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত ও উন্নীত করার পর ইসলাম কখনো এপথে কোনো বাধা সৃষ্টি করবে না। যেমন প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, সৃজনশীলতাকে দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়, ইতিবাচক ও নেতিবাচক। নেতিবাচক হচ্ছে তাই যা বৃহত্তর ক্ষেত্রে সম্প্রদায় বা মানবজাতির ক্ষতির কারণ বা এমন কিছু যা প্রধান প্রয়োজন সংরক্ষণে সংঘর্ষের অবতারণা করে। এটা কেবল নেতিবাচক ধরনের সৃষ্টিশীলতা যাকে অস্বীকার করা হবে ইসলামি মূল্যবোধ সংহত করার মাধ্যমে এবং এটা অবশ্যই হতে হবে।

www.pathagar.com

এটা উল্লেখের দাবি করে যে এমনকি সাম্প্রতিকালের কিছু পাশ্চাত্য গ্রন্থকার সৃজনশীলতার মূল্যবোধহীন ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন এবং এটাকে সৃজনশীলতার অন্ধকার দিক বলে অভিহিত করেন।

চিন্তনক্ষেত্রে অন্তরায়ের ব্যাপারে, আমরা দুটো প্রেক্ষিতের মধ্যে সমঝোতার স্থান দেখতে পাই যদিও এর উপস্থাপনা ভিন্ন। ইসলামি অভিমতে জ্ঞানের উচ্চতর পর্যায়ের ওপর জোর দেওয়া হয়, অর্থাৎ এটা হচ্ছে ওহিলব্ধ জ্ঞান এবং এর ব্যবহার, যেক্ষেত্রে পাশ্চাত্য প্রেক্ষিত কেবল জাগতিক বিষয়ই বিবেচনা করে। এটা দেখতে পাওয়া দুর্ভাগ্যজনক যে, মুসলিম বুদ্ধিজীবীগণ কদাচিৎ ঐ ক্ষেত্রে বাইরে প্রাপ্ত ওহিলব্ধ জ্ঞান দ্বারা উপকৃত হয়েছেন এবং এমন একটি অনুপম ও মূল্যবান উৎসকে পার্থিব পরিমণ্ডলের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগে অসমর্থ হয়েছেন।

এ দুটি প্রেক্ষিতের ঐকমত্যের আরেকটি ক্ষেত্র হচ্ছে চিন্তনশৈলী। এ ক্ষেত্রে, আমরা অনেক পাশ্চাত্য জরিপ ও গবেষণা কর্ম পাই, যা করা হয়েছে এমন সময়ে যখন এ ক্ষেত্র ইসলামি চিন্তায় ভাষাতত্ত্ব ও প্রকাশভঙ্গির অধীন আলোচিত হতো এবং আমরা আশা করি যে এটা এ বিষয়ে আরো অধিক গবেষণার রাজপথ খুলে দেবে। যেমনটা তুলে ধরা হয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে, কিছু সংখ্যক চমৎকার চিন্তনশৈলী রয়েছে যা কুরআন নিজেই ব্যবহার করেছে। এই গবেষণা পনেরটি চিন্তনশৈলীর সন্ধান দিয়ে তা উন্মোচন করেছে। এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা হয় যে, আরো, অনেক চিন্তনশৈলী গবেষকদের দ্বারা চয়িত ও উপস্থাপিত হওয়ার জন্য অপেক্ষমান।

একটি বুদ্ধিবৃত্তিক মনোবৈজ্ঞানিক পটভূমিসমৃদ্ধ মুসলিম গবেষকগণ সহজেই অনেক চিন্তনশৈলী নির্মাণ করতে পারেন যা ইসলামি ব্যবহার শাস্ত্রবিদদের দ্বারা ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হ- এর ক্ষেত্রে অসংখ্যভাবে সরবরাহ করা হয়েছে।

এটা স্বয়ং প্রমাণিত ও স্ফটিকের ন্যায় স্পষ্ট যে হাজারো সৃজনশীল ভাবধারা ও অনেক সমস্যার সমাধান চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় মুসলিম ব্যবহারশাস্ত্রবিদগণ অবচেতনভাবে অনেক চিন্তনশৈলী ব্যবহার করেছেন। এই প্রসঙ্গে এটা দাবি করা যায় যে, ইসলামি ব্যবহারশাস্ত্র প্রকৃতই একটি সমস্যা সমাধানকারী শাস্ত্র। ওহিলব্ধ জ্ঞান ও মানবিয় বিজ্ঞানের মধ্যে সংহতি সাধন করে তাদের শিক্ষণ ও শিখন উন্নয়নের বিপ্লবে নেতৃত্ব দিতে পারে।

www.pathagar.com

সহায়ক গ্রন্থাবলী

- 'আবদ আল-রায্যাক আবু বকর, মুসান্নাফ 'আবদ আল-রায্যাক, ২য় সংস্করণ, সম্পাদনা : হাবীব আল-রাহমান, আল- আযামী (বৈরুত, আল-মাকতাব আল-ইসলামি, ১৪০৩ হি.)।
- 'আবু আল- হুসাইন আল-বাসরী, আল-মু'তামাদ ফী উসূল আল- ফিক্হ, ১ম সংস্করণ, সম্পাদক : খলিল আল-মিস (বৈরুত : দারুল কুতুব আল ইলমিয়াহ, ১৪০৩ হি.)।
- আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনে আল-আশ'আব, আল-সুনান, সম্পাদনা : মুহাম্মদ মুহ্য়ী আল-দীন 'আবদ আল-হামীদ, (বৈরুত : দার আল- ফিকর, n. a)।
- আবু হাইয়্যান, আলমোকাবাসাত, সম্পাদনা : মোহাম্মদ তাওফীক হুসেইন, দার আল-আদাব- ১৯৮২।
- Acikgence, Alparslan, Islamic Science, towards a Definition, ISTAC Publications : K.L. 1996.
- এডামস্ জে, Conceptual Blockbusting (USA : Addison Wesby Publishing Company) আহমাদ ফুয়াদ, বাশা, আল-উলূম আল- কাউনিইয়াহ ফী আল-তুরায আল-ইসলামি, মাজমা আল বুহুত আল- ইসলামিইয়াহ আল-আযহার।
- আল-রাযী, আহমদ ইবন, আলী আল- জাসাস, উসূল আল-ফিকহ- আল-ফুসুল ফিয়াল উসূল নামে পরিচিত, ২য় সংস্করণ, সম্পাদনা : 'আজীল জসীম আল-নাশমী কুয়েত
- উইযারাহ আল-আওকাফ ওয়া আল-কু'উন আল-ইসলামিইয়াহ, ১৯৯৪)।
- আল-আলওয়ানী, তা-হা জাবির, ইজতিহাদ IIIT Herndon, 1993.
- আল-আকবারী আবু বকর রিসালাহ ফী 'ইলম উসূল আল-ফিক্হ সম্পাদনা : মুওয়াফফিক ইবনে 'আবদুল্লাহ, (রিয়াদ, আল- মাকতাবাহ আল-মাক্কীইয়্যাহ ওয়া আল-মাকতাবাহ আল-বাগদাদিইয়াহ);
- আল- হাকীম, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ আল- মুস্তাদরাক 'আলা আল-সহীহাইন, সম্পাদনা : মুস্তাফা 'আবদ আল- কাদির আতা, ১ম সংস্করণ (বৈরুত : দার আল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১৯৯০)।
- আল-হামাভী, ইয়াকুত, মু'জাম, আল-উদাবা, সম্পাদনা : ইহসান আব্বাস, (বৈরুত : ১৯৯৩)।
- আল-আকাদ, আব্বাস, আল-তাফকির ফারিযাতুন ইসলামিইয়্যাহ, (বৈরুত : আল-মাকতাবাহ আল- আসরিইয়্যাহ)।
- আল-বাইহাকী, আবু বকর, আল-সুনান আল- কুবরা, সম্পাদনা : আবদ আল- কাদীর মুহাম্মদ 'আতা, (মক্কা, মাকতাবাহ দার আল-বায্, ১৯৯৪)।
- আল-বুখারি মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল, আল-সহীহ, ৩য় সংস্করণ, সম্পাদনা : মুস্তফা দীব আল-বাগা, (বৈরুত : দার ইবনে কাসীর এবং দার আল- ইয়ামামাহ, ১৯৮৭)।

www.pathagar.com

- আল-দারিমী, 'আবদুল্লাহ ইবনে আবদ আল- রাহমান, সূনান আল দারিমী, সম্পাদনা : ফাওয়ায্ আহমাদ যামরালী এবং খালিদ আল- সাব'উ আল-আলামী, ১ম সংস্করণ (বৈরুত : দার আল-কিতাব আল- আরাবী, ১৪০৭ হি.)।
- আল-দূজানী, এফ, আবু আল-আসওয়াদ আল-দুওয়ালী, ওয়া নাশ'আত আল-নাহ্ আল-'আরাবী ১৯৭৪ কুয়েত, ওয়াকালাত আল- মুখা'আত,।
- আল-ফারূযাবদী : আল-কামুস আল- মুহীত, (বৈরুত : মু'আস্সালাত আল- রিসালা-১৯৯৬)।
- আল-গাজ্জালী আবু হামীদ আল-মুস্তাসফা মিন 'ইলম আল- উসূল, ১ম সংস্করণ, সম্পাদনা : মুহাম্মদ আবদ আল- সালাম, আবদ আল শাফী, (বৈরুত : দার আল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, ১৪১৩ হি.)।
- আল-জাস্সাস, আবু বকর, আল- রাযী, আহকাম আল-কুরআন সম্পাদনা : মুহাম্মদ আস-সাদিক কামহাভী, (বৈরুত : দার ইহ্য়া আল-তুরাস্-আরাবী ১৪০৫ হি.)।
- আল-জুওয়াইনী ইমাম আল- হারামাঈন, আল- ওয়ারাকাত ফী উসূল আল- ফিক্হ সম্পাদনা :আবদ আল- লাতীফ, মুহাম্মদ আল-আবদ্ (দার আল-নাশ্র)।
- আল-নাহ্লাভী, আবদ আল-রাহমান, আল- তারাবিইয়াহ্ বী-আল- ইবারাহ, দার আল-ফিকর আল- মু'আসির, বৈরুত-১৯৯৪।
- আল-সাহিব ইসমাইল ইবনে আল-ইবাদ, আল-মুহীত, ফী আল-লুগাহ, ৩য় খণ্ড, সম্পাদনা : মুহাম্মদ হাসান ইয়াসীন, ১ম সংস্করণ (বৈরুত : আলম আল-কুতুব-১৯৯৪)।
- আল-শাতিবী : আল-মুওয়াফাকাত ফী উসূল আল-শরীয়াহ, সম্পাদনা : আবদুল্লাহ দারায, (বৈরুত- দার আল-মারিফাহ, অপ্রকাশিত)।
- আল-কারাফী, শারহ তানকীহ আল- ফুসূল ফী ইখতিসার আল-মাহসূল, ১ম সংস্করণ (মিসর : আল- মাতবা'আহ, আল- খাইরিইআহ, ১৩০৬ হি)।
- আল- কুরআন আল-আযীম হিদাইআতুহু ওয়া আইআযুহু, দার আল- কালাম দামেশ্ক-১৯৮৯)।
- আল- রাগিব আল-ইস্পাহানী, মুফরাদা : খার্তব আল- কুরআন আল-কারীম আল- শাফী মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস কিতাব আল উম্ম, (বৈরুত : দার আল- মা'রিফা-১৩৯৩ হি.)।
- আল- শাওকানী, মুহাম্মদ ইবনে আলী, ইরশাদ আল- ফুহুল (বৈরুত : দার আল-ফিকর n. a)।
- আল- শাওকানী, মুহাম্মদ ইবনে আলী, ফাতহ আল- কাদীর (বৈরুত : দার আল ফিকর n. a)।

www.pathagar.com

- আল- শাইবানী মুহাম্মদ ইবনে আল-হাসান, কিতাব আল হুজ্জাহ, ৩য় সংস্করণ সম্পাদনা : মাহদী হাসান আল- কাইলানী (বৈরুত : আলম আল কুতুব ১৪০৩ হি.)।
- আল- তাফাককুর মিনা আল- মুশাহাদা ইলা আল- শুহুদ, (হার্নডন : IIIT : প্রকাশনা, ১৯৯৩)।
- আল-তাহির ইবনে 'আশূর, আল-তাহরীর ওয়া আল-তানভীর (তিউনিস : আল-আল-তিউনিসিইয়াহ লী আল-নাশর)।
- আগাসী, জে., এবং আয়ানর্স চার্লস জার্ভিয়া : যৌক্তিকতা : তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ, মার্টিনিস নিজহফ প্রকাশনা, ডারড্রেক্ট, নেদারল্যাণ্ড, ১৯৮৭।
- অমিত গোস্বামী, কোয়ান্টাম থিওরি অভ্ ক্রিয়েটিভিটি এনসাইক্লোপেডিয়া অভ্ ক্রিয়েটিভিটি, (১৯৯৯)।
- বায়ার, জে., ডোমেনস্ অভ্ ক্রিয়েটিভিটি, এনসাইক্লোপেডিয়া অভ ক্রিয়েটিভিটি, (ইউ এস এ : ১৯৯৯)।
- বস্ওয়ার্থ, সি. ই., দি এনসাইক্লোপেডিয়া অভ্ ইসলাম, ভন ডোনজেল, ডব্লিউ. পি. হেইনরিকস এবং জি. এল ইকোতে, লেইডেন ই. জে. ব্রিল ১৯৯৫।
- ব্রাইফল্ট, আর., ইসলাম এন্ড দি সায়েন্টিফিক স্পিরিট, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন (ঢাকা: বাংলাদেশ) ১৯৭৭।
- ক্রুপলি, আর্থার জে., সৃজনশীলতার সংজ্ঞা, এনসাইক্লোপেডিয়া অভ্ ক্রিয়েটিভিটি।
- ডেসী, জে., কনসেপ্টস্ অব ক্রিয়েটিভিটি (১৯৯৯), এনসাইক্লোপেডিয়া অভ্ ক্রিয়েটিভিটি।
- ডেভিস, জি. এ., ক্রিয়েটিভিটি ইজ ফরএভার, (আইওয়া : কেনডাল/হান্ট পাবলিশিং কো ১৯৯৮)।
- ডি বোনো, এডওয়ার্ড, আই এ্যাম রাইট ইউ আর রং, পেঙ্গুইন বুকস, ১৯৯১।
- ডি বোনো, সিরিয়াস ক্রিয়েটিভিটি, হারপার কলিন্স বিজনেস, ১৯৯৬।
- ফাওকিইয়াহ হুসেইন মাহমুদ, আল-কাফিইয়া ফী-আল-জাদাল (কায়রো : মাতবা'আহ আল-বাবী আল-হালাবী ওয়া শুকরা'উহ্, ১৯৭৯)।
- ফযলুর রহমান, হেলথ এন্ড মেডিসিন ইন ইসলামিক ট্রাডিশন (কুয়ালালামপুর : আবদুলমাজীদ এন্ড কোং, ১৯৯৩)।
- ফেল্ডম্যান, ডি. এইচ, দি ডেভেলপমেন্ট অভ ক্রিয়েটিভিটি দি হ্যাণ্ডবুক অভ ক্রিয়েটিভিটি, হাফিজুর রহমান সিদ্দিকী, দি ডেভেলপমেন্ট অভ সায়েন্টিফিক মেথডলজি বাই দ্য মুসলিম সায়েন্টিন্টস, মাস জার্নাল অব ইসলামিক সায়েন্স, জানুয়ারি, ১৯৮৫।

www.pathagar.com

এ বই প্রসংগে

সৃজনশীলতা অভ্যন্তরীণ গুণাবলী নয় বরং দক্ষতা সংশ্লিষ্ট। সৃজনশীলতা হচ্ছে একটি অবিভাজ্য সত্তা যা মানুষের মনকে সুনির্দিষ্ট উদ্ভাবন ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু-বহির্ভূত উদ্ভাবনে সমর্থ করে থাকে। ইসলামি পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে সৃজনশীলতার ইস্যুকে প্রাসঙ্গিক করে তোলায় এ পরিচিতিমূলক গ্রন্থটির লক্ষ্য। এই বইটি সৃজনশীল চিন্তা বিষয়ে ভূমিকাস্বরূপ হলেও এর বিষয়সূচির একটি বড় অংশ সমালোচনামূলক চিন্তার বিষয়াদি নিয়ে গড়ে উঠেছে। এটা এজন্যই যে, রচয়িতাগণ এমত পোষণ করেন যে, চিন্তার সৃষ্টিধর্মী ও সমালোচনাধর্মী প্রক্রিয়া অবিচ্ছিন্ন ধারণা এবং এর একটি অন্যটির পরিপূরক। এটা এজন্যই বলা যে, সমালোচনামূলক ও সৃজনী চিন্তা উভয়েই একটি সংহত পদ্ধতিতে উপস্থাপিত হওয়া উচিত।

লেখক পরিচিতি

ড. জামাল আহমেদ বশির বাদি লিবিয়ার নাগরিক এবং ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া (IIUM)'র জেনারেল স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। তিনি ১৯৯৪ সালে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মদিনা থেকে উসূল আদ-দ্বীন এর উপর পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ১৯৯৬ সাল থেকে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়ায় Creative Thinking বিষয়ে শিক্ষাদান করে আসছেন। ২০০৩ সালে লেবাননের রাজধানী বৈরুতে তিনি এ বিষয়ে একটি কোর্স পরিচালনা করতেন। ইসলামি দা'ওয়াত ও চিন্তাধারার উপর তাঁর অনেকগুলো গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

ড. মুস্তাফা তাজদিন মরক্কোর নাগরিক এবং ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়ায় (IIUM) সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। তিনি মরক্কোর আল কারাউইন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভাষাতত্ত্ব ও ইসলামিক স্টাডিজে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে আরবি ও ইংরেজি ভাষায় তাঁর অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

ISBN : 978-984-8471-32-6

9 789848 471326

www.pathagar.com